উদ্যতখড়্গ

(প্রথম খণ্ড)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

উদ্যতখড়্গ

শ্রীঅরবিন্দের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
এ গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত

এক

উনিশ শো উনিশ সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর। কলকাতার তক্তাঘাটে বিশালকায় জাহাজ, সিটি অফ ক্যালকাটা, নোঙর তুলছে। জাহাজের রেলিং ধরে ও কে দাঁড়িয়ে? সে কী, চেন না তাকে? ওই তো বাংলার নবজাগ্রত তারুণ্যের প্রতীক, সুভাষচন্দ্র।

চলেছে কোথায়?

বিলেতে। আই. সি. এস. হতে। ছাত্র যেমন ভালো ঠিক উঁচু স্থান নিয়ে বেরিয়ে যাবে দেখো।

সে তো খুব ভাগ্যের কথা। কিন্তু এমন সুখের দিনে ওর মুখখানা ম্লান কেন?

মোটে তো বাইশ বছর বয়েস, বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে যাচ্ছে কোন দূর-দূরান্তরে, একটু মন কেমন করবে না?

একজন সহযাত্রী সুভাষকে জিজ্ঞেস করলে, 'মুখ এত ভার কেন? কী ভাবছ? মা-বাবা?'

'না।'

'ভাইপো-ভাইঝি?'

'না।'

'তবে কী?'

'জালিয়ানওয়ালাবাগ।'

উনিশ শো উনিশ সালের তেরোই এপ্রিল রবিবার বিকেলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। সুভাষের বিলেত যাবার প্রায় পাঁচ মাস আগে। আই.সি.এস. পাশ করে ব্রিটিশের গোলামি করার উপযুক্ত পটভূমিই বটে।

নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর প্রায় দশমিনিট অবিচ্ছিন্ন গুলি চলাল ডায়ার। কম করে সরকারী ভাষ্যে তিনশো উনআশি জন নিহত হল আর আহতের সংখ্যা প্রায় বারো শ।

ডায়ার কোনো হুঁশিয়ারি দিলে না, জনতাকে বললে না চলে যেতে, আভাসেও জানতে দিল না তার কী নৃশংস মতলব, তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করে নিল তার করণীয় কী।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা করছিল, হংসরাজ, জনতাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ভয় পেয়ো না। নির্দোষের উপর ওরা গুলি চালাবে না। তোমরা যে যার জায়গায় চুপ করে বসে থাকো।'

ব্রিটিশের সাধুতায় তার বুঝি তখনো বিশ্বাস ছিল। তাই যখন সত্যি-সত্যি গুলিছোঁড়া শুরু হল তখনো একবার বলেছিল হংসরাজ : 'ও সব ফাঁকা আওয়াজ। তোমরা উঠো না। নিরস্ত্রদের ওরা মারবে না।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শোনা গেল ডায়ারের গর্জন : 'গুলি উঁচুতে ছুঁড়ছ কেন, নিচের দিকে ছোঁড়ো। নইলে তোমাদের কেন এনেছি ?'

যারা গুলি ছুঁড়ছিল তাদের মধ্যে কিছু ভারতীয় সৈন্যও ছিল বোধহয়।

হংসরাজ একটা শাদা রুমালও নেড়েছিল। আমরা নিরস্ত্র। আমরা নিরুপদ্রব।

গুলি ছোঁড়ো। নিচের দিকে, সিধে, মুখোমুখি ছোঁড়ো। মানুষ লক্ষ্য করে ছোঁড়ো। যেন একটা লোকও না পালাতে পারে।

তুমি গিয়ে কী দেখলে ? জিজ্ঞেস করা হল ডায়ারকে।

গিয়ে দেখলাম মার্শাল ল অমান্য করা হয়েছে। আমার আদেশ লঙ্ঘন করে সভা করা হয়েছে। দেখেই আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তা জলের মত তরল, আলোর মত পরিষ্কার।

কী কর্তব্য ?

গুলি করা। গুলি করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া।

হান্টার কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়েছে ডায়ার। স্বয়ং লর্ড হান্টার প্রশ্ন করলে : 'তা হলে গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা ভেঙে যেতে শুরু করল ?'

'সঙ্গে-সঙ্গেই।'

'তবুও, তার পরেও গুলি চালালে ?'

'চালালাম।'

'জনতা যখন ছত্রখানই হয়ে গেল, তখন গুলি চালানো বন্ধ করলে না কেন ?'

'আমি মনে করলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না জনতা একেবারে সরে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গুলি চালিয়ে যাওয়াই আমার কর্তব্য। অল্প চালানো অর্থহীন। অল্প চালালে আশানুরূপ ফল হত না।'

'কতক্ষণ চালিয়েছিলে ?'

'প্রায় দশ মিনিট।'

'কত রাউণ্ড ?'

'ষোল শো পঞ্চাশ রাউণ্ড।'

'জনতা নিরস্ত্র ছিল ?'

'সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।' ডায়ার একটা ঢোঁকও গিলল না।

'সামান্য একটা লাঠিও কারু হাতে ছিল না ?'

'বোধহয় ছিল না।'

'বেশিক্ষণ গুলি না চালালে জনতা সরে যাবে না এ ধারণা তোমার হল কিসে ? অল্পক্ষণ চালাবার পরই যখন জনতা সরে যাচ্ছিল—'

'প্রশ্নটা শুধু জনতার সরে যাওয়াই নয়।' ডায়ার এবার বুঝি তার স্বরূপের আচ্ছাদন তুলল : 'শুধু সরে যাওয়াই যদি প্রশ্ন হত তা হলে আমি মুখেই আদেশ দিতে পারতাম। সভা ভেঙে দেওয়ার

পক্ষে আমার একটা মৌখিক আদেশই তো যথেষ্ট ছিল। প্রশ্নটা তার চেয়ে বেশি।'

'সেটা কী? প্রতিশোধ নেওয়া? আইন অমান্যের প্রতিশোধ? না কি শিক্ষা দেওয়া?'

ডায়ার একবার ভুরু কুঁচকোলো। বললে, 'শিক্ষা দেওয়া বলতে পারেন। যদি শুধু আদেশে জনতা সরে যেত, অল্পক্ষণের জন্যে সরে যেত। আবার আরেক সময় একত্র হত, আমার আদেশকে উপহাস করত। আমি বোকা বনেছি এ দৃশ্য আমার কাছে উপভোগ্য হত না। তাই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম যাতে মাঠে সভা করতে একটা লোকও না থাকে।'

'সেটা কী ব্যবস্থা?'

'যতক্ষণ লোক ততক্ষণ গুলি। একটা লোক একটা গুলি।'

কলকাতায় ভাসা-ভাসা খবর আসছে। সমস্ত পাঞ্জাবে মার্শাল ল, জঙ্গী আইন জারি হয়েছে, তাই এত চাপাচুপি। কিন্তু মেজদা শরৎচন্দ্রের ঘরে বসে কিছু কিছু শুনেছে সুভাষ। শুনেছে আর স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হয়েছে।

শুনেছে, ঘেরা একটা মাঠের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ আইন না মেনে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়েছে। তিন দিকেই তার পার্শ্ববর্তী বাড়ির দেয়ালের বাধা, শুধু উত্তর দিকে ফাঁকা। আর সেইটেই মাঠে ঢোকবার একমাত্র পথ। সেই পথ জুড়েই দাঁড়িয়েছে খুনের দল। খাঁচার মধ্যে আটকা-পড়া অবোলা পশুর মত লোক-গুলো ছুটোছুটি করছে। প্রতিবেশী বাড়িগুলির মধ্যে ঢোকবার মত তিন-চারটে গলিঘুঁজি আছে, দু-তিন হাত করে চওড়া, তারই মুখে লোক গাদি মারছে আর সে গাদিতেই গুলির শিলাবৃষ্টি। লোক বেরুতে পাচ্ছে না, সামনে মৃতদেহের স্তূপ আবার আরেক বাধা। তুমি কোথায় বেরুবে, তুমি শুধু স্তূপকে উচ্চতর করো। অনেকে দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু দেয়াল যে অনেক উঁচু,

নাগালে আসবে কী করে, কী ধরে উঠবে? কত লোক যে পায়ের তলায় দলিত-মর্দিত হয়ে মরেছে তার লেখাজোখা নেই। যারা মাটিতে শুয়ে পড়ে নিস্তার চেয়েছে তারা দূরের মার থেকে বাঁচলেও কাছের মার থেকে বাঁচে নি। শোয়া লোকটা মৃত না জীবিত খোঁজ করতে কাছে এসেছে সৈন্যরা। যদি বুঝেছে বেঁচে আছে তাহলে রাইফেল নিচু করে তাদের মেরেছে, গুলি চলে গিয়েছে মাটির নিচে। কখনো বা হাঁটু গেড়ে বসে তাক করেছে। সব গুলিই পিঠের উপর।

পিঠের উপর! সুভাষ একবার তার নিগূঢ় মর্মের মাঝখানে চমকে উঠল। পলায়নপর জনতা! একবার সবাই মিলে রুখে দাঁড়াতে পারল না? পারল না ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়তে? ওদের কত সৈন্য ছিল, কত বন্দুক? সকলে মিলে একটা বিরাট পিণ্ডে সংহত হয়ে ওদের দিকে তুমুল শক্তিতে নিক্ষিপ্ত হতে পারত না? হলই বা না নিরস্ত্র, তবু একবার দানা বাঁধতে পারলে মরতে-মরতেও শেষ পর্যন্ত পারত ওদের অভিভূত করতে। পায়ের ধুলো করে ফেলতে। গঙ্গা শিবের জটায় বন্দিনী হয়েই রইল। পারল না প্রবাহিনী হতে।

ডায়ারেরও সেই ভয় ছিল। বলছে: 'জনতা এত নিবিড় ছিল যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটে আসতে পারত আমাদের দিকে, ওদের অস্ত্র থাক বা নাই থাক, আমরা শেষ হয়ে যেতাম। কজন সৈন্য ছিল বা আমার সঙ্গে, কীই বা অস্ত্রের পরিমাণ! জনসমুদ্র একবার ছুটে আসতে পারলে আমরা মুছে যেতাম। তাই আমার সর্বক্ষণ দৃষ্টি ছিল জনতার কোনো অংশই যেন এক স্থির লক্ষ্যে সংহত হতে না পারে। তাই যেখানে-যেখানে ভিড় বেশি হয়ে উঠছিল সেখানে-সেখানেই গুলি চালিয়েছি।'

'তার মানেই একটা গুলিও ফসকায় নি।'

'না, তার সুযোগ ছিল না। একটা গুলি ফসকানো মানেই তো একটা গুলির অপচয়।'

মেজদা শরৎ বুঝতে পারছে সুভাষ বাইরে গম্ভীর থাকলেও ভিতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তাই তাকে শরৎ ছোট্ট একটা হুঁশিয়ারি দিল। বললে, থাক তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি ছাত্র, আর ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা।

হ্যাঁ, তপস্যা, নিয়মস্থিতির আরেক নামই তপস্যা।

তা ছাড়া বাবার ইচ্ছে সে আই.সি.এস. হয়। আই.সি এস. হয়ে আসতে পারলে সব-চেয়ে তিনিই বেশি খুশি হবেন। তাঁকে সুখী করার মত আনন্দ আর কিসে।

কিন্তু এই তো শাসক ইংরেজের চেহারা। এই শাদা সাহেবদের আমিও একজন হয়ে যাব। আমিও হুকুম দেব, গুলি ছোঁড়ো। কালো আদমিদের প্রাণের আবার দাম কী! বড় জোর একটা গুলির দাম।

সাক্ষ্যে প্রতাপ সিং বলছে : '১৩ই এপ্রিল আমরা এমন কোনো ঘোষণা শুনি নি যে জঙ্গী আইন জারি হয়েছে বা সভা নিষিদ্ধ হয়েছে। আমাদের বাজারে কোনো ঘোষণাই এসে পৌঁছয় নি। আমি আমার ছেলে কিরপা সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল চারটের সময় জালিয়ানওয়ালাবাগে এলাম। ইচ্ছে ছিল বাবু কানহিয়ালালের বক্তৃতা শুনব। তাঁর বক্তৃতা হবে এমনি প্রচার হয়েছিল বাজারে। কিরপারও সাধ কানহিয়ালালকে দেখবে। কিরপার বয়েস আর কত! ন-দশ বছরের বেশি নয়। কিন্তু আমার স্বপ্ন সেও দেশকে ভালবাসতে শিখুক। মিটিংএ পৌঁছবার কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম একটা এরোপ্লেনের শব্দ। মাথার উপর দিয়ে একটা শাদা এরোপ্লেন চক্কর মারল বার কতক। সেটা বুঝি শাদা সাহেবের শক্তি আর দম্ভের প্রতীক। দেখলাম হংসরাজ বক্তৃতা দিতে উঠেছে। একটা উঁচু আসনে সে ডক্টর কিচলুর একটা ফোটো রাখলে, বললে, এই প্রতিকৃতিই আজকের সভার সভাপতি। আর রাউলাট য়্যাক্ট বরবাদ করা হোক এটাই এ সভার প্রধান সিদ্ধান্ত। তারপরে,

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, যেমন ধুলোর ঝড় ওঠে তেমনি গুলির ঝড় ছুটল। আর বাপুজি, আমার ছেলে, আমার কিরপা—আমার কিরপা সিং—দেশপ্রেমই যার শৈশবস্বপ্ন—' কান্নায় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল প্রতাপ সিং।

ধ্বংসলীলার অন্তে, রাত্রে, ডায়ার অমৃতসরের রাস্তায় বেরুল, তার আদেশ কেমন পালিত হয়েছে তা দেখবার জন্যে।

রাস্তায় কোথাও একটা মানুষ নেই। এক ফোঁটা আলো নেই। গাছের একটা পাতাও বুঝি নড়ছে না।

সমস্ত বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। দোকান-বাজার পরিত্যক্ত। গৃহহীন যারা পথে শুত তারাও আজ পথহীন।

একটা কান্নার শব্দও শুনতে পাচ্ছি না কেন? ডায়ার কান পাতল। অন্তত একটা আহতের গোঙানি? পুত্রহারা পতিহারাদের বিলাপস্বর?

শুনতে পেল আদিগন্ত বিশাল স্তব্ধতা। শাদা এরোপ্লেনটার চলে যাবার পর আকাশের নৈঃশব্দ্য।

মৃতের শহর অমৃতসর।

না, না, অমৃতের শহর অমৃতসর। রক্তের পথ, রক্তের শপথ—রক্তই অক্ষয় অমৃত।

'সরকারী হিসেব যাই বলুক, অন্তত দু হাজার লোক মরেছে, কিংবা তারও বেশি, আর আহতের সংখ্যার কোনো লেখাজোখা নেই।'

'কিন্তু জমায়েত তো হয়েছিল বিশ-পঁচিশ হাজার!'

মনে মনে বুঝি হিসেব করল সুভাষ। শুধু শূন্য? হাজার শূন্য, লক্ষ শূন্য যোগ করলেও শূন্য? না, কোথাও এক আছে। একজন আছে।

যাই বিলেত যাই। আই.সি.এসটা আগে পাস করি। বাবার ভারি ইচ্ছে আই.সি.এস. হই। তাই তো কবে, শৈশবে, মিশনারি স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

দুই

কী হল ? কী হল ? কে পড়ল ? কী করে পড়ল ?

তুমুল কোলাহল উঠল।

জল, জল, ডাক্তার—ডাক্তার ডাকো।

প্রভাবতী ছুটে এলেন। দেখলেন গেটের সামনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে, সেখানে ছোটখাটো একটা ভিড়।

সারদা ঝি কেঁদে উঠল : 'সুবি পড়ে গিয়েছে।'

'ছেলে প্রথম স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছে, এই তো তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলুম—তুই কী করছিলি ?'

'আমি তো সঙ্গে-সঙ্গেই আসছিলাম,' ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীর মত মুখ করল সারদা : 'কিন্তু গাড়ি দেখেই ছেলে ছুট দিল—'

'জানিস দুরন্ত ছেলে, হাতে ধরে এনে গাড়িতে তুলে দিলিনে কেন ?'

'হাত তো ধরেই রেখেছিলাম কিন্তু গাড়ি দেখেই জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে—'

'পাঁচ বছরের ছেলেকে তুই ধরে রাখতে পারলিনে ?'

'তর সয় না, ছুটেই গাড়িতে উঠতে গেল। পা পিছলে গেল হঠাৎ—'

ততক্ষণে ঘরে আনা হয়েছে সুভাষকে। কাছেই ডাক্তার, চলে এসেছে তড়িঘড়ি। মাথা কেটে গিয়েছে। তা এমন কিছু নয়। ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।

বৈঠকখানায় জানকীনাথ তাঁর আদালতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা, এবার তাঁকে উঠে পড়তে হয়।

হাতে একটা লাল-নীল পেন্সিল, ব্রিফ-নোটটা আবার একবার তলিয়ে দেখছেন এমন সময় ভিতর থেকে সরকার এসে দাঁড়াল। বললে, 'সুবিবাবু পড়ে গিয়েছেন!'

নথি থেকে মাথা তুললেন না জানকীনাথ। বললেন, 'পড়ে গিয়েছেন! ওর না আজ স্কুলে ভর্তি হবার দিন?'

'হ্যাঁ, তাই তো যাচ্ছিলেন। গাড়ি দেখে এমন ছুট দিলেন যে পা হড়কে গেল—'

'পাঁচ বছর বয়েস,' নিজের মনেই বলে উঠলেন জানকীনাথ: 'কিন্তু উৎসাহে টগবগ করছে। স্কুলে যেতে অন্য ছেলে কাঁদে আর এ ছেলের দারুণ স্ফূর্তি। তা সারদা কী করছিল? ও হাতে ধরে সুবিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে পারে নি?'

'সারদা তো ওর হাত ধরেই রেখেছিল কিন্তু গাড়ি দেখেই হাত ছিনিয়ে নিয়ে ছুট দিলে—'

জানকীনাথ আবার আত্মস্থের মত বললেন, 'দুরন্ত ছেলে! কারুর হাত ধরে চলতে রাজি নয়।' ঘড়ির দিকে তাকাতে গিয়েই বুঝি মুখ তুললেন: 'তা, চোট কি খুব বেশি?'

'হ্যাঁ—না—ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন। ব্যাণ্ডেজ করছেন।'

'তা ঠিকই করছেন। কিন্তু আমি ভাবছি,' জানকীনাথ উঠি-উঠি করতে লাগলেন: 'স্কুলে যাবার প্রথম দিনেই ছেলেটার বাধা পড়ল। লেখাপড়া কিছু হবে না আর কী।'

'তা কী করে বলা যায়?'

'মানে মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে যার জন্যে লেখাপড়া করে তা হবে না।' মুখ গম্ভীর করলেন জানকীনাথ: 'সূচনাটা ভালো নয়। আচ্ছা,' হঠাৎ উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠলেন: 'চোটটা লেগেছে কোথায়?'

'মাথায়।'

'মাথায়? তা হলে তো কর্মসিদ্ধি। মাথায় বাধা কর্মসিদ্ধির

লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দও ছেলেবেলায় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন। ফেটে রক্তারক্তি।'

'সুবিবাবুরও তাই।'

'তাই ঠিক বলা যায় না কী হয়!' প্রদীপ্ত মুখে উঠে পড়লেন জানকীনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন বিবেকানন্দ সম্পর্কেঃ ঐ আঘাতে ওর শক্তি বাধা পেয়েছে, নইলে ও জগৎসংসারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারত।

ঘোড়ার গাড়িটা চলে গেল স্কুলের দিকে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, বিছানায় শুয়ে সুভাষ শুনতে পেল সেই মিলিয়ে যাওয়া চাকার শব্দ।

কিন্তু তার কান্নার শব্দ কোনো সান্ত্বনায় কোনো আশ্বাসেই শান্ত হতে চাইল না।

সারদা-ঝি পাশে বসে হাওয়া করছে সুভাষকে। কতকটা বা অনুতাপের সুরে বলতে লাগলঃ 'সবতাতে এমনি দস্যিপনা করতে যাস কেন? ইস্কুল তো তোর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না, আর গাড়ি তো বাড়ির, উড়ে পালাবার নয়। দু চার দশ মিনিট পরে গেলেই বা কী হত!'

'বা, ইস্কুল যে ঠিক দশটার সময় বসে।' ফুঁপিয়ে উঠল সুভাষ।

'তা বসুক না। তোর এক-আধটুকু দেরি হলে ইস্কুল উঠে যেত না।'

'আমি কিন্তু কাল যাব।'

'কিন্তু গাড়িতে নয়।' সারদা-ঝি গম্ভীর হল।

'গাড়িতে নয় তো কিসে?'

'আমি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাব। দিন-দিন তুমি যা দুরন্ত হচ্ছ—'

এত কষ্টেও সুভাষের হাসি পেল। বললে, 'কোলে চড়ে বুঝি

কেউ ইস্কুল যায় ? এটা সাহেবদের ইস্কুল। তোমাকে ঢুকতেই দেবে না।'

'সে আমি ঠিক ঢুকে পড়ব।'

'তা হলে তোমাকেও ভর্তি করে নেবে।'

স্কুলের নাম প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপিয়ান স্কুল, সংক্ষেপে পি.ই.স্কুল. পরিচালক ব্যাপটিস্ট মিশন। ইংরেজ আর য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে-মেয়েদের জন্যেই এই স্কুল, যদিও কিছু ভারতীয়কে নেবার জন্যে উদারতার দ্বার খোলা আছে। এই স্কুলের প্রতিই জানকীনাথের পক্ষপাত। সব ছেলেমেয়েকেই তিনি এই স্কুল থেকে ঘুরিয়ে এনেছেন। সুভাষও এই পরিবেশের স্পর্শ পেয়ে আসবে তাতে আর বিচিত্র কী।

'ছেলেমেয়েদের ঐ পাদ্রী স্কুলে পড়িয়ে লাভ কী হচ্ছে?' কোনো হিতৈষী আত্মীয় আপত্তি করেছিল একসময়ঃ 'কী শিখছে তারা ?'

'ইংরিজি শিখছে।' সরাসরি বলেছিলেন জানকীনাথ।

'দিশি স্কুলে কি ইংরিজি শেখানো হয় না ?'

'মিশনারি স্কুলে ভালো শেখানো হয়।'

'ইংরিজি শিখে কী হবে ?'

'জগতের সঙ্গে জীবনের তাল রেখে চলে বড় হতে পারবে।'

'ছাই পারবে!' আত্মীয় চটে গিয়েছিলেন, ব্যঙ্গরুক্ষ স্বরে বলে-ছিলেন, 'ইংরেজের শুধু গোলাম হতে পারবে।'

একটু বোধ হয় হেসেছিলেন জানকীনাথ। বলেছিলেন, 'পরাধীনতার বেদনা বোঝবার জন্যেও ইংরিজি দরকার।'

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আত্মীয়। কিন্তু তার যুক্তির বাণ তখনো নিঃশেষিত হয় নি। আরো একটা সে নিক্ষেপ করলে। বললে, 'ঐ স্কুলে তো বাইবেল পড়ায়।'

'ভালোই করে।'

'বাঙালি ছেলে তার নিজের ধর্মগ্রন্থ গীতা-উপনিষৎ না পড়ে বিদেশী বাইবেল পড়বে ?'

'তোমার দিশি স্কুলে গীতা-উপনিষৎ চালু করতে বলো না। সে তো ভালোই হবে। জ্ঞানের আলো যত পথ দিয়ে আসতে চায় আসতে দাও। জানলা বন্ধ করে দিও না।'

আত্মীয় বুঝল তর্ক করা বৃথা। রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু, কটকের সরকারী উকিল, একাধারে গভর্নমেণ্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, সরকারি খেতাবে অলঙ্কৃত, তার কাছে বুঝি স্বদেশী মনোভাব আশা করাই বিড়ম্বনা। সে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলে, পাদ্রীর স্কুলে, পাঠাবে এটাই স্বাভাবিক।

আত্মীয় চলে যাচ্ছিল জানকীনাথ ডাকলেন। বললেন, 'ঐ স্কুলে আরো কটা জিনিস বেশি শিখবে।'

'বেশি শিখবে ?'

'হ্যাঁ, বেশি শিখবে, যে সমস্ত বিষয় তোমাদের দিশি স্কুলে স্পষ্টাস্পষ্টি শেখানো হয় না। কিংবা যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তোমাদের দিশি স্কুল শিথিল, অমনোযোগী।'

'যথা ?'

'যথা সময়নিষ্ঠা, পাঙচ্যুয়ালিটি। শৃঙ্খলানিষ্ঠা, ডিসিপ্লিন। আচরণ, কণ্ডাক্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিটনেস। কী বলো এ সব বস্তু শিক্ষণীয় নয় ?'

আত্মীয় চুপ করে গেল। এবার তার আর নিষ্ক্রান্ত হওয়া ছাড়া পথ নেই।

সাত-সাত বৎসর, ১৯০২ থেকে ১৯০৮, এই পাদ্রী স্কুলে অতিবাহিত করল সুভাষ।

প্রথম-প্রথম তার স্ফূর্তি দেখে কে। প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষায়ই সে প্রথম হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসমান দৃষ্টির সে অধিকারী—নতুন একটা প্রাণের জগতে আলোর জগতে সঙ্গীতের জগতে সে এসে পড়েছে—

আনন্দে-সুগন্ধে সে ভরপুর। কিন্তু দিনে-দিনে ক্রমে-ক্রমে তার মনের মধ্যে জ্বালা জমতে লাগল, ভারতীয়ের প্রতি ইংরেজের অবজ্ঞার জ্বালা। কেন এমন হয়? যে শুধু শিক্ষক সেও শুধু ইংরেজ বলে নিজেকে কেন উচ্চবর্ণের বলে মনে করে? একটা হেডমাস্টারের মধ্যেও এই বর্ণকৌলীন্যের মোহ?

হেডমাস্টার মিস্টার ইয়ং। কুড়ি বছর ধরে উড়িষ্যায় আছেন অথচ একটাও ওড়িয়া কথা শেখেন নি। ঘৃণায় শেখেন নি। ভাবখানা এমনি, দেশী ভাষা একটা ভাষা! একমাত্র আমার ভাষা, যেহেতু সেটা শাসকের ভাষা, সেটাই উচ্চ আর তোমার ভাষা, যেহেতু সেটা শাসিতের ভাষা, সেটা উচ্চারণেরও অযোগ্য।

আতরের ঘরে থাকলে আতরের গন্ধ একটু-আধটু গায়ে লেগে যায়, কিন্তু এ কেমনতরো পাষাণ যে এতটুকু একটু ভাষার সৌরভও সে কুড়িয়ে নেবে না? ঔদাসীন্যের পাষাণ নয়, ঘৃণার পাষাণ। ঔদাসীন্যও বুঝি অলক্ষ্যে কিছু নিয়ে নেয়, শুধু ঘৃণাই সজ্ঞানে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

চাপরাশি পেপারওয়েটটা ইয়ংএর টেবলের উপর না রেখে ভুলে তাকের উপর রেখেছে। দেখেই তো ইয়ংএর রক্ত মাথায় চড়ল। কোনো কাজের এতটুকু বিশৃঙ্খলা সে সহ্য করতে পারে না। জোরে বেল বাজাতে লাগল।

বেলের তর্জনেই প্রকট হল সাহেব দুর্দান্ত চটেছে।

ত্বরিত পায়ে ঘরে ঢুকল চাপরাশি।

ওটা ওখানে রাখো নি কেন? তাকের উপর পেপারওয়েটের দিকে আঙুল দেখাল ইয়ং। ওটার জায়গা ওইখানে? পাজী হতচ্ছাড়া নচ্ছার—

কিন্তু দেশী ভাষায়, চাপরাশির বোধগম্য ভাষায়, গালাগাল দেয় ইয়ংএর এমন সাধ্য নেই। ভাষা শেখে নি বলে প্রাণভরে গালাগাল দেবার সুখভোগ তার অদৃষ্টে জুটল না।

শুধু কটমট করে তাকাল চাপরাশির দিকে। পেপারওয়েটটা কুড়িয়ে নিয়ে গায়ের উপর ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করল।

চাপরাশি মুখ টিপে হাসে।

ইয়ং তখন ইংরেজিতে বিসুবিয়স ছোটাল। একটা ফুলকিও চাপরাশির গায়ে লাগল না।

তবে তার স্ত্রী মিসেস ইয়ং ওরকম নিরেট নয়। মোটামুটি গুটিকয়েক কথা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে।

পত্রবাহক ইয়ংএর কাছে কোন এক ভদ্রলোকের চিঠি নিয়ে এসেছে। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলা দরকার। চিঠির জবাব ইয়ং ওরই হাত দিয়ে পাঠাতে চায়।

দাঁড়াও! বোসো। একটু অপেক্ষা করো। এ সব কথার দেশী প্রতিশব্দ কী! কী বললে পত্রবাহক সহজে ও সম্পূর্ণ করে বুঝবে তার মনের কথা?

মহা ফাঁপরে পড়ল ইয়ং। ছুটল স্ত্রীর কাছে। বললে তার বিপদের কথা। শিগগির, শিগগির বলো শব্দটা কী।

স্ত্রী শব্দ জুগিয়ে দিলে। তাই বারকতক আবৃত্তি করে মুখস্থ করলে ইয়ং। তারপর পত্রবাহকের কাছে কোনোরকমে কথাটা উগরে দিয়ে রেহাই পেল।

কেন এমন হয়? কেন, প্রতিবেশীর ভাষাটা শ্রদ্ধা ও স্নেহের সঙ্গে শেখা যায় না?

উড়িষ্যায় এত দর্শনীয় জিনিস, পাছে ভাষার সংস্পর্শে আসতে হয়, ভাষা না জানাটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই বাইরে কোথাও বেরোয় না ইয়ং। বাড়িতে, স্কুলে, নিজের উচ্চ দাঁড়ে বসেই পুচ্ছ নাচায়।

কিন্তু, যাই বলো, একটা হেডমাস্টারের মত হেডমাস্টার। লোকে যেমন বলে রাজাই রাজ্য, তেমনি হেডমাস্টারই স্কুল। রাজ্য দেখে রাজাকে বোঝো তেমনি স্কুল দেখে বোঝো কে হেডমাস্টার।

সবাই ভয় করে কিন্তু শ্রদ্ধাও করে। স্কুলের বাইরে মনোভাব যাই হোক, স্কুলের মধ্যে তা আন্তরিক। ছাত্রকে শুধু একটি সুগোল ছাত্র বানানো নয়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে উজ্জ্বল একটা মানুষ করে তোলা। দরকার হয় তো ইয়ং বেত মারতে প্রস্তুত।

ছাত্র হিসেবে অগ্রণী, ইয়ংএর সুনজরে পড়তে সুভাষের বেগ পেতে হল না। সন্দেহ নেই, ইয়ংএর প্রত্যক্ষ প্রভাবে তার চরিত্র সুগঠিত হচ্ছে, তার বিকাশে-প্রকাশে বাবা-দাদারা আনন্দিতই হচ্ছেন, কিন্তু সুভাষের গভীর অন্তরে একটি বিমর্ষতার ছায়া ঘন থেকে ঘনতর হতে লাগল। প্রথম দিকে এসব কিছুই সে বোঝে নি, শুধু একটা নতুনের উত্তেজনায় বিভোর হয়ে ছিল। ক্রমশ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সে টের পেল এ গ্লানির পঙ্কিলতা। ইংরেজরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে। সমান আসনের অধিকারী বলে মনে করে না।

ইংরেজি রূপকথা শেখায়। দিশি রূপকথার কথা ভাবতেও পারে না। রাজপুত রাজকন্যা রাক্ষস-খোক্কস সব বাজে কথা। তেপান্তরের মাঠ গাঁজাখুরি। আর ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী আষাঢ়ে গল্প।

রূপকথা মানেই তো আজব কথা। ইয়ংএর ঘৃণা আজগুবির জন্যে নয়, আজগুবিটা ভারতীয় বলে।

সেই নিরুচ্চার ঘৃণাটা ক্রমশ আরো স্পষ্ট হল। লাগল প্রায় আঘাতের মত।

ভারতীয়রা স্কলারশিপের পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এমনিতে ক্লাশে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হলেই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে না, স্কলারশিপের পরীক্ষা আলাদা। আর সে পরীক্ষা শুধু য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যে, ভারতীয়র জন্যে নয়। তার সোজা মানে ভারতীয়রা কোনো স্কলারশিপ পাবে না। ওদের স্কলারশিপের পরীক্ষা দিতে দিলে য়্যালো-ইণ্ডিয়ানরা তো নির্ঘাত তলিয়ে যাবে, তাই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের দাবি নিরঙ্কুশ নির্বিঘ্ন করবার জন্যে

স্কলারশিপ পরীক্ষার দরজা ভারতীয়দের মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে।

অথচ এ নিয়ে কারুর কোনো দাহ-দুঃখ নেই। এটাই যেন স্বাভাবিক। সাহেবি স্কুল, বৃত্তিও শুধু সাহেবরাই পাবে।

কিন্তু ছাত্রে-ছাত্রে ভেদ। মানুষে-মানুষে ভেদ! একই স্কুলে দুই দেশ, দুই নিয়ম। সুভাষের রক্তের গভীরে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আরো এক ধাক্কা খেল সুভাষ।

দেখল ভলান্টিয়র কোরে শুধু য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাই যোগ দিতে পারছে, ভারতীয়রা নয়। কেন নয়? কাকে জিজ্ঞেস করবে, কে উত্তর দেবে?

অভিভাবকদের কাউকে বুঝি একদিন দুঃখের কথাটা বলে ফেলেছিল সুভাষ।

'সাহেব ছেলেরা কেমন সুন্দর বন্দুক কাঁধে করে প্যারেড করছে। আচ্ছা, ঐ প্যারেডে আমাদের কেন নেয় না?'

'থাক। তোমাদের আর বন্দুক কাঁধে নিতে হবে না।' অভিভাবক টিটকিরি দিয়ে উঠেছিল।

'কেন, পারি না নাকি?'

'সাহেবদের তল্পি বইছ, তাই বও, বন্দুক কেন?'

'কিন্তু একই স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য কেন? যদি সাহেব ছেলেরা বন্দুক পায়, আমরা কেন পাব না?'

'ওরে বাবা, তোমাদের হাতে বন্দুক দিয়ে ওদের ভরসা কোথায়? তোমরা যদি ওদের তাড়াবার জন্যে ওদের উপর গুলি ছোঁড়ো?'

সে সব কথা কে বলছে! আমি বলছি এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ছি, ছাত্রদের মধ্যে সমান-অধিকার থাকবে না কেন?

মাঠেও তেমনি দুই দল—ইউরোপিয়ান আর ইণ্ডিয়ান। যেন

ইউরোপীয়ানরাই কৃতকর্মা আর আমরা ভারতীয়েরা অকর্মণ্য। যেন ওরাই ইন্দ্রপ্রতিম আর আমরা ভগ্নদর্প হৃতপ্রভ।

কিন্তু কিছু বলবার নেই, করবার নেই। এই যেন নিয়তিনির্দিষ্ট। বিধাতৃবিহিত।

সাত-সাত বছর পড়ল সেই স্কুলে, সংস্কৃত দূরের কথা, বাংলাও শিখল না। শিখল ইংরিজি, শিখল ল্যাটিন শব্দরূপ। বাংলা সা-রে-গা-মা-র বদলে শিখল ইংরিজি ডো-রে-মি-ফা।

উপায়নিপুণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রক্ষা করলেন। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা, নিয়ম করে দিলেন এবার থেকে ম্যাট্রি-কুলেশানে বাংলা অবশ্যপাঠ্য।

বাঙালির ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আপন আলো, আরতির আলো। বাঙালি তার জীবন্ত-মাত্র দেহে আত্মাকে খুঁজে পেল। ধুলোর আসন ছেড়ে মানের আসনে উঠে বসল।

বাংলা অবশ্যপাঠ্য। এ পর্যন্ত, শুধু ম্যাট্রিক কেন বি-এ পর্যন্ত পাশ করা যেত বাংলা ছাড়া। আর যাবে না। মাতৃভাষার সইবে না আর অনাদর।

যেহেতু কটক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এ নিয়ম সুভাষের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তাকেও শিখতে হবে সংস্কৃত। শিখতে হবে বাংলা। সুতরাং পাদ্রীর স্কুল ছাড়তে হবে, ঢুকতে হবে অন্য স্কুলে, দিশি স্কুলে। তা নইলে প্রবেশিকাই রুদ্ধ।

সুভাষ যেন পিঞ্জরের বাইরে দেখতে পেল আকাশ। অনন্ত-জীবনপ্রবেশের নির্মুক্তি।

ইয়ংএর সঙ্গে করমর্দন করল সুভাষ। বললে, 'র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছি।'

না, সুভাষের মনে কোনো গ্লানি নেই, দুঃখও নেই, সে চলেছে আরেক নতুনের দেশে, দুই চোখে তার শুধু এই অতন্দ্র স্বপ্ন।

নতুন, নতুন, চিরন্তন নতুন। স্বাধীনতাই নতুনের সম্রাট।

তিন

কাঠজুড়ি নদীর ধারে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল।

হেডমাস্টার বেণীমাধব দাস তাঁর অফিস ঘরে বসে আছেন। পরনে প্যান্ট-কোট নয়, ধুতি-পাঞ্জাবি।

দিশি স্কুলের ছাত্ররা ধুতি-শার্ট ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বয়ং হেডমাস্টারও ঐ পোষাকে প্রকাশিত হবে, সুভাষের কাছে এ কেমন অদ্ভুত লাগল।

কারা ঘরে ঢুকল দেখে বেণীমাধব চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন বারো-তেরো বছরের একটি জ্যোতিষ্মান ছেলে, পরনে কোট-প্যান্ট, চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা, সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

'বাবু পাঠিয়ে দিলেন।' বললে সেই প্রৌঢ়।

'কে বাবু?'

'জানকীবাবু। রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু।'

একবাক্যে চেনবার মত লোক। বেণীমাধব একটু বুঝি চঞ্চল হলেন: 'কেন বলুন তো?'

'এটি ওঁর ছেলে। ষষ্ঠ ছেলে। একে পরীক্ষা করে আপনার স্কুলে ভর্তি করে নিন।'

'বাঃ, ভালো কথা।' বেণীমাধব আরো একটু তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন সুভাষকে। তেজস্বী, শুভ্রভাস্বর মূর্তি, চোখে শুধু পড়বার মত নয়, চোখে লেগে থাকবার মত।

'তোমার নাম কী?' সুভাষকে জিজ্ঞেস করলেন বেণীমাধব।

'শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু।'

'আগে কোন স্কুলে পড়তে ?'

'প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে।'

বেণীমাধব চমৎকৃত হলেন। সংক্ষেপে পি.ই. স্কুল বললে না, স্পষ্ট করে সমস্ত নামটা উচ্চারণ করলে। আর উচ্চারণ কী স্পষ্ট, তেজোযুক্ত।

'কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাও ?'

'ক্লাস সেভেনএ।'

'পারবে ?' বেণীমাধব চোখ তুললেন।

'পরীক্ষা করে দেখুন।'

'বা, বেশ ভালো কথা।' বেণীমাধব উৎফুল্ল হলেন: 'বীরপুরুষের কথা। পরীক্ষা করে দেখুন। সারা জীবনই পরীক্ষা। তা হলে বোসো। তোমাকে কাগজ-পেন্সিল দিই—'

সুভাষ বসল পরীক্ষা দিতে। বেণীমাধব একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন তার বসবার ভঙ্গি তার লেখবার ভঙ্গি। কেমন ঋজু, ভয়শূন্য।

ক্লাস সেভেন বা ফোর্থ ক্লাসের ঘর। ঘর-ভরতি ছেলে, কোলাহল-মুখর। সংস্কৃতের মাস্টার বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ পড়াচ্ছেন।

বারান্দায় বেণীমাধবকে দেখা গেল। একটা কুটো পড়ারও শব্দ শোনা যায় চকিতে এমনি স্তব্ধ হয়ে গেল ক্লাস। কথা নয় শব্দ নয়, শুধু উপস্থিতিটাই মন্ত্র। কে জানে শুধু নামটাই একটা দীপ্ত উপস্থিতি।

ঐ হেডমাস্টার আসছে—এটুকু বললেই সমস্ত অসৌজন্য মুহূর্তে সংশোধিত হয়ে যাবে, সমস্ত অন্যায় পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবে না।

হেডমাস্টারের সঙ্গে সাহেবী পোশাক পরা কে একটা ছেলে।

কে রে ছেলেটা ?

দোরগোড়ায় বেণীমাধবকে দেখেই কাব্যতীর্থ এগিয়ে গেলেন।

'এই ছেলেটি এই ক্লাসে, ক্লাস সেভেনএ আজ ভর্তি হল।' আর বাড়তি কথা নয়, সুভাষকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেলেন বেণীমাধব।

সমস্ত ক্লাস মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুভাষের দিকে।

কে রে ছোঁড়াটা? চিনিস? দেখেছিস কেমন সাহেবি পোশাক ফুটিয়েছে।

প্রথম বেঞ্চির ছেলেরা সরে সরে বসে সুভাষকে জায়গা দিল। সুভাষ বসল স্থির হয়ে।

কাব্যতীর্থ চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন। শুধোলেন, 'তোমার নাম কী হে?'

সুভাষ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।'

'এর আগে কোন স্কুলে পড়তে?'

'প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে।'

'ওড়িয়া বাজারে সেই মিশনারিদের স্কুলে? তাই বলো না—পি.ই. স্কুল—'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'হেডমাস্টার কে ছিলেন?' কাব্যতীর্থ চশমার ফাঁক দিয়ে আবার চোখ ফেললেন।

'রেভারেণ্ড ইয়ং।'

শুধু ইয়ং নয়, একেবারে রেভারেণ্ড ইয়ং। কাব্যতীর্থ মুখ বাঁকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কী পড়তে সেখানে?'

'ল্যাটিন, ইংলিশ, ইংল্যাণ্ডস হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি আর এরিথমেটিক।'

সুভাষের ইংরিজি উচ্চারণে ক্লাসশুদ্ধু ছেলে হকচকিয়ে গেল। এ ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখ বেঁকাল। এ আবার কোন ছিরি!

কাব্যতীর্থও কম রুষ্ট হন নি। একটু রোখা গলায় প্রশ্ন করলেন: 'সংস্কৃত জানো? শব্দরূপ? নরঃ নরৌ নরাঃ? হাঁ করে আছ কী! গৌ গাবৌ গাবঃ—জানো?'

নম্র চোখ নত করল সুভাষ। বললে, 'জানি না।'

'ধাতুরূপ? গচ্ছতি গচ্ছতঃ গচ্ছন্তি—জানো?'

'জানি না।'

'সংস্কৃত কতদূর জানো?' কাব্যতীর্থ মুখিয়ে উঠলেন।

সত্যের মত আরাম নেই। সাহসের মত সুখ নেই। সুভাষ তাই নিষ্কুণ্ঠস্বরে বললে, 'কিছুই জানি না। অক্ষরপরিচয়ও হয় নি।'

ছাত্রের দল শব্দ করে হেসে উঠল। যারা হাসল না তারা পরস্পরের গা টিপল। আর যারা একাকী তারা লম্বা মুখে হতাশার ছবি আঁকলে।

'আর বাংলা?' কাব্যতীর্থ প্রায় ফেটে পড়লেন।

সুভাষ এতটুকুও ঘাবড়াল না। বললে, 'বাংলাও ঐ স্কুলে পড়ানো হত না।'

'বলো কী! তোমার মাতৃভাষাও তোমাকে পড়ানো হত না?' কপাল চাপড়াবার মতন করে বললেন কাব্যতীর্থ।

'না। তারই জন্যে তো ঐ স্কুল ছেড়ে এই স্কুলে ভর্তি হলাম।' সুভাষ নির্দ্বিধায় বললে, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশানে বাংলাকে অবশ্যপাঠ্য করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সংস্কৃতও। অবশ্যপাঠ্য। অবশ্যপাঠ্য কথাটার মানে জানো তো?' কাব্যতীর্থ কণ্ঠস্বরে বুঝি একটু বিদ্রূপ মেশালেন।

'বানান জানে কিনা জিজ্ঞেস করুন।' কোণ থেকে কে একটা ছেলে টিটকিরি দিয়ে উঠল। তার কথায় কান দিলেন না কাব্যতীর্থ। সুভাষের দিকেই তেড়ে এলেন: 'অবশ্যপাঠ্য তো বলছ, তা তোমার কী দশা হবে!'

সুভাষ শান্ত মুখে বললে, 'দু একদিনে শিখে নেব।'

হো-হো করে আবার হেসে উঠল ছেলেরা। এর চেয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করব এ বলা সহজ। কিংবা উৎপাটন করব গন্ধমাদন। যার অক্ষর জ্ঞান নেই সে কিনা দু একদিনেই দিগগজ হবে।

'ছু একদিনে শিখে নেব!' কাব্যতীর্থ দস্তুরমত মুখ ভেঙচালেন : 'কী দরকার ছিল এই স্কুলে ভর্তি হবার! সাহেবি স্কুলে গিয়ে সাহেব হয়েছ, সাহেব থাকলেই তো পারতে। মিছিমিছি এই যন্ত্রণা কেন?'

প্রদীপ্ত মুখে সুভাষ বললে, 'বিশ্বাস করুন স্যার, ছু একদিনে শিখে নেব।'

এ বিশ্বাস করা মানে পাথরে শস্য বিশ্বাস করার মত কিংবা দিনের বেলা চন্দ্রগ্রহণ। আর যাই হোক, কুশাগ্রের জলে দাবানল নেভানো যায় না।

প্রায় বুড়ো আঙুল দেখালেন কাব্যতীর্থ : 'ছাই শিখবে? কিচ্ছু হবে না তোমার। তোমার লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না।'

বোধ হয় তাই! তার কিচ্ছু হবে না। ম্লান বিমর্ষ হয়ে গেল সুভাষ।

মনে পড়ে মিশনারি স্কুলে সুভাষদের ক্লাসে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিল : বড় হয়ে কী হবে? সুভাষ লিখেছিল বড় হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হব। দাদাদের কাছে সে শুনেছিল ম্যাজিস্ট্রেট একটা কিছু হওয়ার মত বস্তু। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে কমিশনারও তো কিছু কম নয়। তাই সে লিখেছিল, আগে কিছু দিন কমিশনার থেকে পরে ম্যাজিস্ট্রেট হব। পরীক্ষক শুধু মারতে বাকি রেখেছিলেন। আগে কমিশনার থেকে পরে যদি ম্যাজিস্ট্রেট হয় সেটা তো একটা পতন, অবনতি। সেটা আবার হওয়া কী! সেটা তো পতিত হওয়া! পতিত হওয়া কি হওয়া?

না, বাড়ির আলোচনায় আরো সে শুনেছিল। শুনেছিল সব চেয়ে বড় হওয়া হচ্ছে আই.সি.এস. হওয়া। আবার যে কিনা আই.সি.এস. সে সব কিছু হতে পারে। জজ হতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে, কমিশনার হতে পারে, বসতে পারে হাইকোর্টের বিচারাসনে। সে সর্বগ, সর্বজ্ঞ, সর্বভক্ষ, সর্বকর্তা। সেই সর্বরত্নময়

মেরু, সর্বাশ্চর্যময় আকাশ, সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা। সেই সকলের বুকের মণি মাথার মুকুট। সকলজনবল্লভ।

বৃক্ষের সেরা অশ্বত্থ, বৃত্তির সেরা ব্রহ্মোত্তর, তীর্থের সেরা কাশী, তেমনি চাকরির সেরা আই সি এস।

তার কিচ্ছু হবে না। তার সঙ্গী নেই সাথী নেই কেউ তাকে আপনার বলে মনে করে না। আর এমন সে ভাগ্যহত, খেলাতেও তার রুচি নেই। খেলতে পারলেও সে একটা দাঁড়াবার জায়গা পেত। দলের একজন বলে গণ্য হতে পারত। সেটাও তো একজন হয়ে ওঠা!

সে একজন নয়, সে একা জন। বিমর্ষ, অপ্রতিষ্ঠ। সন্দেহ কী, তার কিচ্ছু হবে না। সে কাঠজুরি নদীর ধার ধরে একা একা ঘুরে বেড়াক।

চার

সুভাষ স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু এ তার কী পোশাক! পরনে ধুতি গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে য়্যালবার্ট। হাতে বই-খাতা।

বিশুদ্ধ ব্রতধারী। সর্বাঙ্গে মুক্তচ্ছন্দ আনন্দ।

বারান্দায় বাবা জানকীনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জানকীনাথ এগিয়ে এলেন ; জিজ্ঞেস করলেন, 'নতুন স্কুলে যাচ্ছ ?'

সুভাষ সলজ্জমুখে বিনম্র একটু হাসল।

'কিন্তু এই পোশাক ?'

সুভাষ ভয়ে-ভয়ে তাকাল বাবার দিকে। বললে, 'এই পোশাকেই তো ভালো।'

'এতদিন তো প্যান্ট-কোট পরেই স্কুলে যেতে।'

'তখন যে সাহেবদের স্কুলে পড়তাম।'

'আর এখন ?'

'এখন আমাদের দিশি স্কুলে পড়ছি, র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে।'

'কিন্তু,' জানকীনাথ দু পা এগিয়ে এলেন : 'সাহেবি পোশাকটা কি ভালো নয় ?'

'কিন্তু এ আমাদের জাতীয় পোশাক।' কথায় গর্বের একটু টান দিল সুভাষ।

'আর সব ছেলেরা কী পরে স্কুলে আসে ?'

'সবাই এমনিতরো পোশাকে।' সুভাষ সস্নেহে বললে, 'আমি তো ওদেরই একজন। আমি কেন সাহেবি পোশাক পরে সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকব ?'

জানকীনাথ সগর্বে বললেন, 'বেশ, ভালো কথা।'

স্কুলের বারান্দায় হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখা হতেই সুভাষ দু হাত একত্র করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে নমস্কার করল।

স্নিগ্ধ সৌজন্যে বেণীমাধব নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'কাল তোমাকে অন্য পোশাকে দেখেছিলাম না?'

'মিশনারি স্কুলে সাহেবি পোশাক পরে যেতাম বলে কাল প্রথম দিন সেই সাহেবি পোশাক পরেই এসেছিলাম।'

'আজ?'

'দেখলাম সব ছাত্রই জাতীয় পোষাক পরে আসে।' সুভাষ স্বচ্ছ-মুখে বললে, 'ভাবলাম আমি যখন ওদেরই একজন তখন আমারও ওদের মত জাতীয় পোশাক পরে আসা উচিত।'

'উচিত—তোমাকে কে বলে দিল?'

'কেউ বলে দেয় নি। আমি নিজেই অনুভব করেছি।'

'ঠিক অনুভব করেছ।' গরিমা-ভরা প্রসন্ন চোখে তাকালেন বেণীমাধব: 'আমাদের দেশের সংস্কৃতি, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কিছুতে তাকে অপদস্থ হতে দেওয়া নয়। আমাদের দেশ আমরা ছাড়া আর কার মুখের দিকে চাইবে? যাও, ক্লাসে যাও।'

কথাগুলি কী সুন্দর! সুভাষের প্রাণে যেন নতুন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহের স্পর্শ লাগল। উনি কবে আমাদের ক্লাস নেবেন? ওঁর কাছে পড়তে পেলে যেন প্রাণের মধ্যে এমনি অনেক উৎসাহের উত্তাপ নেওয়া যেত। আমার হৃদয় এখন এমনি উত্তাপের কাঙাল। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠবার আগে হেডমাস্টারের সান্নিধ্য পাবার সম্ভাবনা নেই। সেকেণ্ড আর ফার্স্ট ক্লাসেই উনি পড়ান, নিচু ক্লাসে নয়। শুভাষের মনে হয় দিন যেমন দ্রুত কাটছে ক্লাসগুলি তত সহজে এগোচ্ছে না।

তোমাদের দেশে তোমাদের পোশাক ভালো হোক, আমাদের

দেশে আমাদের পোশাকও সমান ভালো। দরকার হয় তোমাদের পোশাক আমরা পরব কিন্তু তাই বলে আমাদের জাতীয় পোশাককে আমরা বর্জন করব না, হেনস্তা করব না। আর তোমাকেও দেব না আমাদের পোশাক দেখে নাক সিঁটকাতে। তুমি তোমার পোশাকে বোসো আমিও তোমার পাশে আমার পোশাকে বসব—সমান পঙক্তিতে। তুমি তোমার চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে চাও, উঠে যেয়ো, আমি আমার চেয়ার ছাড়ব না।

তুমি করমর্দন করতে চাও, হাত বাড়িয়ে দেব, কিন্তু আমি যখন দু হাত তুলে নমস্কার করব তুমিও সে নমস্কার ফিরিয়ে দিও।

আর আমাদের মধ্যে যারা পরানুকরণে অন্ধ হয়ে আছি তারা প্রথম চোখ মেলেই যেন নিজেদের নির্লজ্জতাকে ধিক্কার দিই। ধিক্কার দিই আমাদের দাসমনোভাবকে।

'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ॥'

এ তো রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি!

আর প্রভুদের কী কূটকৌশল! পাঠ্য তালিকা এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে মনে-প্রাণে ভারতীয়রা ইংরেজের স্তাবক হয়ে উঠতে পারে। শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাস আর ভূগোল পড়, নিজেদেরটা চুলোয় যাক। ভাবখানা এমন, তোমাদের পড়বার মত আছেই বা কী। দিশি নাম ও পদবী বিদেশীভাবে বিকৃত করে দিয়েছে আর সেই বিকৃত উচ্চারণ করতে পেরেই আমরা কৃতার্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায় বাংলায় 'হস্তিমূর্খ' হতে আমাদের আপত্তি নেই, ইংরিজিতে 'ইগ্নোরেন্ট' হলেই লজ্জা।

না, নিজের দেশকে জানো, নিজের দেশকে ভালোবাসো—বেণীমাধব যেন তারই নীরব ও নির্ভীক ঘোষণা। আর, ভালো বাসতে হলে সর্বপ্রথমে যাকে ভালো বাসবে তাকে জানা দরকার। দেশকে না জানলে তাকে ভালোবাসবে কী করে।

স্কুলের বারান্দা দিয়ে যখন হেঁটে যান তখন সমস্ত পরিপার্শ্ব সতর্ক হয়ে ওঠে। কোথাও যেন সামান্য ছন্দচ্যুতি না ঘটে। শ্রী ও শৃঙ্খলার এতটুকু না বিঘ্ন হয়। সর্বত্র একটি মনোযোগ যেন জাগ্রত হয়ে থাকে।

একটি চারুদর্শন ছেলেকে হঠাৎ সেদিন ডাক দিয়ে উঠলেন ঃ 'ওহে চারু, শোনো।'

ছেলেটির নাম চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরিজির প্রধান অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে।

চারু কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোমাদের ক্লাসে নতুন একটি ছাত্র এসেছে—'

'হ্যাঁ স্যার, সুভাষ—সুভাষচন্দ্র বসু।'

'খাঁটি ছেলে।'

'হ্যাঁ স্যার, ইংরেজিতে বেশ স্ট্রং।'

'তুমি তো ক্লাসে ফার্স্ট হও।' হেডমাস্টার সস্মিত স্নেহে তাকালেন ঃ 'তোমার এবার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল।'

'কিন্তু স্যার, সংস্কৃত কিছু জানে না—' চারু এতটুকু ভড়কাল না ঃ 'আর বাংলাতেও কাঁচা।'

বেণীমাধব বললেন, 'শিখে ফেলবে, দেখতে-দেখতে শিখে ফেলবে। যেমন বুদ্ধি তেমনি মেধা। ভেতরে স্থির শিখার সঙ্কল্পের আলো জ্বলছে।'

নিজের ইচ্ছেয়ই পোশাক বদলেছে। কেউ কোনো শাসন-ত্রাসন করে নি। না অভিভাবক, না বা শিক্ষক। নিজের থেকেই বুঝেছে অসাম্য। সকলের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে। সকলের মধ্যে হতে চেয়েছে একজন।

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করো। কত ছেলে-বয়সে বিলেতে গিয়েছিলেন কিন্তু বিদেশী পোশাক পরেন নি কখনো, ইংরেজদের বিদ্রূপ সত্ত্বেও। বরং মাত্র ষোল বছর বয়সে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন :

'মা এবার মলে সাহেব হবো,
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাবো।
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা বাগানে বেড়াতে যাবো,
আবার কালো বদন দেখলে পরে ব্লাকি বলে মুখ ফেরাবো॥'

আবার কী বলছেন পরবেশধারী ছদ্মবেশীদের?

'কে তুমি ফিরিছো পরি প্রভুদের সাজ,
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমাকেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না, ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান
পৃষ্ঠে তব কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?...
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কি অহঙ্কার
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার॥'

তার পরে স্মরণ করো দ্বিজেন্দ্রলালকে :

'আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি
কিন্তু বিপদেতে দিই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি॥'

কিন্তু এ ছেলে কি চম্পট দেবে বলে মনে হয়? বিপদের সম্মুখীন

হতে ভয় পাবে ? না কি বাহুবীর্যোপজীবী ক্ষত্রিয়ের মত সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করে যাবে ? ছ দিনে শিখে নেব। এ কি শুধু একটা কথার কথা, মৌখিক আস্ফালন ? না কি বজ্রগর্ভ আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণ ?

স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে, বেজেছে শেষ ঘণ্টা। ছেলেরা বেরুচ্ছে হুড়মুড় করে।

বারান্দায় বেণীমাধব। চারুকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন।

'এবার তোমাদের ক্লাসে বার্ষিক পরীক্ষায় কে ফার্স্ট হল ?'

'সুভাষ, স্যার।'

'বলো কী ? সংস্কৃতে কত পেয়েছে ?'

'একশোর মধ্যে একশো।'

'বলো কী,' বেণীমাধব যত না বিস্মিত তার চেয়ে বেশি গর্বিত হলেন : 'একশোর মধ্যে একশো ! আর তুমি ?'

সুন্দর মুখে চারু হাসল। বললে, 'নিরানব্বুই।'

দেখা গেল পণ্ডিতমশাই যাচ্ছেন ওদিক দিয়ে। ওঁকে একবার ডাকো তো।

ডাকতেই বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ হেডমাস্টারের কাছে এলেন। বেণীমাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষকে সংস্কৃতে একশোর মধ্যে একশো দিলেন ?'

বিশ্বনাথ বললে, 'কী আর করব বলুন, একশোর মধ্যে একশো দশ তো আর দেওয়া যায় না।'

চার

উনিশশো এগারো সালের এগারোই অগাস্ট।

দশুই অগাস্ট সুভাষ ক্লাসের ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছে : 'উনিশ শো আট সালের এগারোই অগাস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। এটি আমাদের গভীর শোকের দিন। এটি আমরা পালন করব। কী করে পালন করব? আমি বলি উপবাস করে। আমরা কাল ছাত্ররা পুরো দিন অনাহারে থাকব। কি, তোমরা রাজি?'

ছাত্রদল একবাক্যে রাজি।

'এই বাঙলার প্রথম তরুণ যে দেশ-মায়ের মুক্তির জন্যে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছিল। দেখিয়েছিল বাঙালি মরে না, বাঙালি প্রাণ দেয়। পথটাই বড় কথা নয়, প্রাণটাই বড় কথা। ফল বড় কথা নয়, স্বপ্নই বড় কথা, সঙ্কল্পই বড় কথা।' যেন নেতার ব্যক্তিত্ব নিয়ে বলছে সুভাষ, বলছে সেনাপতির সাহস নিয়ে।

'রাজি আমরা রাজি।' সরবে সমর্থন করল ছেলেরা : 'কাল উনুন জ্বলবে না, হাঁড়ি চড়বে না, আমরা সবাই উপোস করে থাকব।'

ইংরেজের কারসাজিটা একবার দেখ। তার সমস্ত অশান্তির উৎস বাংলাদেশ, বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করো। দু টুকরো হয়ে গেলেই বাঙালির সংহতি শিথিল হয়ে যাবে, নির্বিষ হয়ে যাবে তার ব্রিটিশ-বিরোধিতা। ঢাকায় যদি আরেকটা রাজধানী করা যায়, কলকাতা ম্লান হয়ে যাবে। আর কলকাতা যদি খর্ব হয় সমস্ত বাঙালিই দুর্বল হয়ে পড়বে। বাঙালি যদি দুর্বল হয় তা হলে ব্রিটিশকে কে হটায়। বাঙালি গেলে ব্রিটিশের অসপত্ন রাজত্ব।

শুধু হিন্দুতে-মুসলমানে ভেদ করে ইংরেজের সুখ নেই, এবার বাংলাদেশটাকেই ভাগ করো। পূর্ববঙ্গ যাক আসামের সঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গ বিহারের গলগ্রহ হয়ে থাকুক।

বাঙালির ক্ষোভ এবার ক্রোধে ফেটে পড়ল। দেখা দিল সক্রিয় বিপ্লববাদ। উচ্চারিত হল সেই মহামন্ত্র, মাতৃমন্ত্র—বন্দেমাতরম।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, বাংলা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হল।

কে আমাদের ভাঙে, কে আমাদের পৃথক করে। বাংলাকে শান্ত করুন, কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাঁড়িয়ে বড়লাটকে বলেছিল গোখেল। বড়লাটও বিলেতে গিয়েছিল তদবির করতে। কিন্তু ভারতসচিব মর্লে শুনলে না। বললে, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, প্রস্তাবটা বাঙালির মনঃপূত নয়, কিন্তু কী করা যাবে, যা একবার স্থিরীকৃত হয়েছে তার আর খণ্ডন সম্ভব নয়।

সুরেন্দ্রনাথ হুঙ্কার ছাড়লেন: 'উই শ্যাল আনসেটল দি সেটেলড ফ্যাক্ট। অটলকে আমরা টলিয়ে দেব, ঔদ্ধত্যকে থাকতে দেব না খাড়া হয়ে।'

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে লিখলেন: ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নি তাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করবার জন্যে সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করে পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুত্র বেঁধে দেব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই, ভাই ভাই এক ঠাঁই।

কবি সেই মহামন্ত্র গানে বেঁধে দিলেন:

'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক হে ভগবান॥'

তারপর নিজেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে গান ধরলেন ঃ সঙ্গে সহস্র কণ্ঠের সহযোগ।

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥'

এ গান শেষ হল তো আরো এক গান শুরু হল :

'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমনি অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান॥
চিরদিন টানবে পিছে চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাই রে তোমার, রবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘের' আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান॥
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান॥'

বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। ঠিক হল পুর্ববঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর বমফিল্ড ফুলারকে হত্যা করতে হবে। হেমচন্দ্র কানুনগো আর বারীন ঘোষ ছুটল বোমা নিয়ে। বোমা ছোঁড়া হল না, ফুলার প্রাণের ভয়ে চম্পট দিয়েছে।

ফুলার পালাক, ফ্রেজার আছে, এণ্ড্রু ফ্রেজার, পশ্চিম বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর। বড়লাট কার্জনের কুকীর্তির মন্ত্রী। তিন-তিনবার

তাকে হত্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল, তিন-তিনবারই চেষ্টা বিফল হল। তারপর ফ্রেজার যখন ট্রেনে করে মেদিনীপুরে সফরে যাচ্ছে ট্রেনের লাইনে বোমা রাখা হল। নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে বোমা ফাটল। বিস্ফোরণে ট্রেনের কয়েকটা কামরা ছিটকে বেরিয়ে গেল লাইন থেকে, প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গেল লাইনের নিচে, কিন্তু ছোটলাট ফ্রেজারের গায়ে আঁচড়ও লাগল না। ভাগ্য এখনো ইংরেজের বুক-পকেটে।

এবারের লক্ষ্য কিংসফোর্ড। কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। গর্বিত, উদ্ধত, হঠকারী। তেরো বছরের ছেলে সুশীল সেনকে পনেরো ঘা বেত মারবার হুকুম দিলে। সেই তেরো বছরের ছেলের অপরাধ সে এক আস্ত-মস্ত সাহেবকে ঘুষি মেরেছে। সেই সাহেবটা কী করেছিল? বালকের সামনে বালকের মাতৃভূমিকে অপমান করেছিল। সাহেব উলটে এল সাহেবের আদালতে নালিশ করতে।

নৃশংস আদেশ। পনেরো ঘা বেত। আর সে-বেত মারা হল প্রকাশ্য আদালতে। কচি ছেলে, সুশীল, বেত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

এ ঘটনা দেখে বা এ ব্যাপার শুনে বাংলাদেশের কোন মানুষ সুশীল হয়ে থাকবে? কার গায়ে এমন মাছের রক্ত যে তপ্ত হবে না? কার হাতের মুষ্টি এমন শিথিল যে সেখানে প্রতিশোধের অস্ত্র উঠবে না উদ্যত হয়ে?

বিপ্লবীদের গুপ্ত আদালত বসল। তিন জজের ট্রাইবুন্যাল। বিচারক শ্রীঅরবিন্দ, চারুচন্দ্র দত্ত আর রাজা সুবোধ মল্লিক। বিচারে সম্মিলিত রায় বেরুল—কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড। তার বেতের বেতন।

কে এই হুকুমজারির ভার নেবে? ডাকো বারীন ঘোষ আর হেম কানুনগোকে। ফুলার পালিয়েছে কিন্তু কিংসফোর্ড মজুত আছে।

ওদিকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আলেন গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছে। আসছিল কলকাতায়, সিরাজগঞ্জ রেল স্টেশনে বিপ্লবীর গুলি তার পিঠে বিঁধল। আলেন পড়েও মরল না। কিন্তু এবার কিংসফোর্ডের মাথাটা যেন না ফসকায়।

হাতে যার এমন দুর্দান্ত বেত, ইংরেজ সরকার তাকে তো প্রমোশন দেবেই। লজ্জায় তো মুখ কালো হবার নয়, অহঙ্কারে আরো লাল হয়ে উঠল। কিংসফোর্ডকে জেলা-জজ করে মজঃফরপুরে বদলি করে দিল। সরিয়ে দিল কলকাতার খপ্পর থেকে।

কিন্তু 'বেত দিয়ে কি মা ভোলাবি?' না কি দূরে গিয়েই বেত ভোলাবি?

মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের নামে একটা বই পাঠানো হল পার্শেল করে, বইয়ের মধ্যে বোমা। কী না কী বই, পার্শেল খুলল না কিংসফোর্ড। এত চাপরাশি আর্দালি থাকতে জজসাহেব নিজে কি পার্শেল খোলে? খুলতে গেল চাপরাশি। সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বনাশ। কিংসফোর্ড দূরেই থেকে গেল।

না, কত দিন দূরে থাকবে? এবার পাঠানো হল দুটি তরুণকে, ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকীকে, সামনাসামনিই তারা মোকাবিলা করবে। দুটি তরুণ, দুটি মৃত্যু-না-মানা মাতৃপূজারী। দুটি নির্বাণ-না-জানা বহ্নিশিখা।

ওদিকে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভ্যাল জনসভা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে। কথাও বলতে দেবে না ওরা? গানও গাইতে দেবে না? শুধু কাঁদতে দেবে? আর সেই কান্না শুনে আহ্লাদ করবে নিজেরা?

'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি
এবার কঠিন হয়ে থাক না ওরে বক্ষদুয়ার আঁটি॥'

তার্দিভ্যালের ঘরে বোমা পড়ল। বোমা ফাটল বটে কিন্তু তার্দিভ্যালকে স্পর্শ করল না। ভাগ্য বর্ম হয়ে ঘিরে রইল তাকে।

এখনো কাল পরিপক্ক হয় নি। দুর্যোগের রাত্রি এখনো আসে নি শেষ যামে।

দেখো তোমাদের যেন ভুল না হয়। তোমরা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না।

উনিশশো আট সালের তিরিশে এপ্রিল। স্টেশন ক্লাবের রাস্তার কাছাকাছি দু বন্ধু, ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল, ঘোরাফেরা করছিল। এই রাস্তা দিয়েই গাড়ি করে কিংসফোর্ড বাড়ি ফিরবে। কিংসফোর্ডের গাড়ি তারা চিনে রেখেছে।

রাত সাড়ে আটটা। কতক্ষণের মধ্যেই ক্লাব ভাঙবে।

ঐ, ঐ কিংসফোর্ডের গাড়ি। আর কথা নেই। নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই দু বন্ধু গাড়ির মধ্যে বোমা ছুঁড়ল।

বোমার বিস্ফোরণে শুনতে পেল না গাড়ির ভিতরে দুটি মহিলার আর্তনাদ।

বোমা ছুঁড়েই দু বন্ধু পালাল। রেল-লাইন ধরে হাঁটতে লাগল। কোথায় আহার কোথায় আশ্রয়, এক রাতে দু বন্ধু প্রায় চব্বিশ মাইল হাঁটল। যতক্ষণ না অন্ধকার অতিক্রান্ত হয় ততক্ষণ হাঁটব। যতক্ষণ না সূর্যোদয়ের দেশে গিয়ে পৌঁছুই ততক্ষণ হাঁটব। ভাগ্য কঠিন হয় হোক, প্রতিজ্ঞাও কঠিন।

দুপুরের কাছাকাছি উইনি স্টেশনের কাছে একটা মুড়ির দোকান চোখে পড়ল। ক্ষুদিরাম গেল মুড়ি কিনতে। প্রফুল্ল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকটা শুকনো মুড়ি চিবিয়ে এক কণ্ঠ জল খাওয়া না জানি কত বড় সুখ!

কিন্তু নিয়তি এক মুঠ শুকনো মুড়িও তাদের অদৃষ্টে রাখে নি।

খুন করে আসামী পালিয়েছে দিকবিদিকে পৌঁছে গিয়েছে এত্তেলা। সমস্ত থানা আর পুলিস ফাঁড়ি সজাগ হয়ে উঠেছে। কোণ-কানাচ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে কনস্টেবলরা। আর কী

কুক্ষণে দুজনে এসে গিয়েছে উইনি স্টেশনের সেই মুড়ির দোকানের কাছাকাছি। শিওপ্রসাদ সিং আর ফতে সিং।

ছেলেটাকে দেখে কেমন সন্দেহ হল। কী রকম উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা! চুল উসকোখুসকো, বেশবাস ম্লান, দু পায়ে ধুলো, যেন কতদূর পথ হেঁটে এসেছে। দুপুরবেলা, আর কিছু জোটে নি, মুড়ি কিনছে। যে মুড়ি কেনে সেই তো সন্দেহভাজন।

হায়, কনস্টেবলরাও দুই বন্ধু। ধরে ফেলল ক্ষুদিরামকে।

ক্ষুদিরামের সঙ্গে রিভালভার ছিল, গুলি চালাবার জন্যে উঁচিয়েও ছিল অস্ত্রটা কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই দুই সিং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রফুল্ল পালাল।

ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। চলল তার উপরে খরনখর অত্যাচার। কিন্তু মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত বালক নির্মল, নিশ্চল, নির্বিকার। এক ইঞ্চি টলল না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না, একটা শব্দ পর্যন্ত বেরুল না মুখের থেকে।

'তোমার সঙ্গে যে ছেলেটা ছিল তার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল ইনস্পেকটর।

'দীনেশচন্দ্র রায়।'

'গেল কোথায়?'

'ভগবান জানেন।'

'এবার বলো কে তোমাদের এই কাজের ভার দিয়েছে?'

'কে আবার দেবে? আমরা নিজেরাই কাজে নেমেছি।'

'বোমা পেলে কোত্থেকে?'

'নিজেরাই তৈরি করেছি।'

'রিভলভার?'

'জানি না।'

চলল ফের অত্যাচারের ঝড়। কিন্তু সমস্ত ঝড়ের মধ্যেও সেই

বালক একটি প্রশান্ত প্রদীপ। নিষ্পাপ মুখে অমিয়ময় লাবণ্য। নির্ভয়-নিষ্কম্প।

প্রফুল্ল সমস্তিপুরে পৌঁছে কলকাতার গাড়ি নিল। আর সেই ট্রেনে প্রফুল্লর কামরাতেই কিনা সাব-ইনস্পেকটর নন্দলাল ব্যানার্জি চলেছে।

ভাগ্য তো ইচ্ছে করলে দুজনকে দু কামরায় তুলতে পারত। কেন তুলল না কে বলবে?

ধূর্ত নন্দলাল প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে মজঃফরপুরের গল্প পাড়লে। কানাঘুষো শুনেছে অনেকে কিন্তু এবার বুঝি খাঁটি খবর শোনা যাবে।

'খুন হয়েছে মশাই, জোড়া খুন—'

'জোড়া খুন—সে কী, কী করে?' কে একজন প্যাসেঞ্জার কৌতূহলী হল।

'ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বোমা ছুঁড়ে মেরেছে।'

'কে-কে মরল?'

'দুটি ইংরেজ মহিলা, মশাই। ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের স্ত্রী আর মেয়ে—'

কোণ ঘেঁষে বসে ছিল প্রফুল্ল। সেও শুনছিল। হঠাৎ অজানতে সে চমকে উঠল। মুখ দিয়ে অস্ফুট বিস্ময়ে কথা বেরিয়ে এল: 'সে কী? কিংসফোর্ড নয়?'

খুব সূক্ষ্ম কানে নন্দলাল ধরে নিয়েছে কথাটা। কিন্তু ধরে যে নিয়েছে তা প্রফুল্লকে বুঝতে দিল না। দেখল অবসাদে ডুবে গেল ছেলেটা।

আরোহীদের মধ্যে কে আরেকজন বললে, 'নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের কাণ্ড।'

'তা ছাড়া আবার কী। যত সব বাউণ্ডুলে কাণ্ড!' নন্দলাল তাচ্ছিল্যে সব উড়িয়ে দিতে চাইল: 'বোমা ফাটিয়ে ইংরেজ তাড়াতে

পারবে ? দু-চারটে ইংরেজ কমলেই কি তাদের রাজত্ব লুপ্ত হবে ? কত তাদের সৈন্যসামন্ত, গোলাবারুদ—'

মোকামাঘাট স্টেশন আসতেই নন্দলাল টুক করে নেমে গেল। নামবার আগে কোণের ছেলেটাকে আরেকবার দেখে নিল। কেমন যেন স্বাভাবিক নয়, বিষাদে ও ব্যর্থতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। দেখা যাক না ফসল কিছু মেলে কি না। পুরস্কার বিঘোষিত হয়ে গেছে। যদি ছেলেটা সত্যি মাল হয় তা হলে কে জানে ধরতে পারলে নন্দলাল হয়তো রাতারাতিই আনন্দলাল হয়ে উঠবে।

নন্দলাল রেলওয়ে পুলিসের শরণ নিল। দুজন সশস্ত্র কনেস্টবল নিয়ে এগুলো কামরার দিকে।

বিপদ শুঁকতে পেরেছে প্রফুল্ল। বুঝেছে এখান থেকে পালানো অকল্পনীয়। তবু শেষ চেষ্টা দেখা যাক। পকেট থেকে মুক্ত করল সে রিভলভার। তাতে তিনটে মাত্র গুলি আছে। নন্দলালের মাথা লক্ষ্য করে প্রফুল্ল ফায়ার করলে। ঐ মাথার কত বুদ্ধি, চট করে মাথা নুইয়ে দিল নন্দ, গুলি লাগল না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

কিন্তু না, আর গুলি খরচ করা যায় না। প্রফুল্ল শুধু একবার বললে, 'আপনি বাঙালি হয়ে আমাকে ধরবেন ? কিন্তু কে আমাকে ধরে ?' বলে বাকি দুটো গুলি প্রফুল্ল নিজের বুকের মধ্যে গ্রহণ করলে।

এই নিয়তির নির্দেশ, ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষর, প্রফুল্ল চাকী বিংশ শতাব্দীর প্রথম শহিদ বলে চিহ্নিত হল। বীতরাগ ও বীতশোক, জননী জন্মভূমির জন্যে প্রসন্ন আত্মোৎসর্গ। এই আত্মোৎসর্গই অব্যয়, অবিনাশী। আর এই জননী জন্মভূমিই সমস্ত প্রাণ মন শরীর, সমস্ত কর্ম, সমস্ত কামনা, সমস্ত গন্ধ, সমস্ত রস, প্রতিমুহূর্তের নিশ্বাস। জননী জন্মভূমিই বৃহত্তম আদর্শ, অমৃত ও অনাময়। এর জন্যে প্রাণ দেব না তো কার জন্যে দেব ?

প্রফুল্লের মাথা শরীর থেকে আলাদা করা হল। কর্তিত মাথাটা নিয়ে যাওয়া হল মজঃফরপুরে।

এ সব কার কীর্তি ?

আর কার! নন্দলালের। যেন সম্মুখযুদ্ধে সে-ই প্রফুল্লকে নিধন করেছে।

নন্দলালের কী হল ? পদোন্নতি হল ?

পদোন্নতি হবার সময় পেল না। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে বাংলার বিপ্লবীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হল। গোপনচরণে কেবল তুমিই আস না, তোমার মৃত্যুও আসে।

কিন্তু ক্ষুদিরামের কী হল ? তার কথা বলো।

মজঃফরপুরের স্পেশ্যাল জজ কার্নডাফ তার ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্ট সে রায় বহাল রাখলে। ক্ষুদিরাম মায়ের স্নেহাঞ্চল ভেবে ফাঁসির রজ্জুকে গলায় জড়াল। উচ্চারণ করলে সেই জ্যোতির্বাক্য, জীবনের প্রথম গায়ত্রী: বন্দেমাতরম।

এতটুকুও চোখ ছলছল করল না, মুখে ফুটল না বিষাদের বিন্দু-বিসর্গ, মুখখানি যেমন কৈশোর স্নেহে কমনীয় তেমনি কমনীয় রইল। ইংরেজ জানল পেলবমেদুর মেঘের নিচে কী বজ্রবিদ্যুৎ, কী মৃত্যুহীন বৈশ্বানর।

কিন্তু দেশের লোক শোকে ভেঙে পড়ল। চারণ-বাউলের কণ্ঠে গান হয়ে ফেটে পড়ল:

বিদায় দে মা একবার ঘুরে আসি
হাসি-হাসি গলায় ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।
মেটে বোমা তৈয়ার করে
ফেলেছিলাম গাড়ির পরে
বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ইংলণ্ডবাসী॥
অভিরাম যায় দ্বীপচালানে
ক্ষুদিরামের ফাঁসি॥

দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস মা
দেখবি গলায় ফাঁসি ॥
ষোল হাজার তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর বেটা-বেটি
বেটা-বেটি কোরো খাঁটি
বউদের কোরো দাসী।
অভিরাম যায় দ্বীপ চালানে
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥

র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের হস্টেল। রান্নার উনুন ধরে নি আজ, সামান্য জল গরমও হয় নি। ছাত্রেরা অভুক্ত থেকে ক্লাস করেছে। কোনো বিরক্তি-বিক্ষোভ জানায় নি, আচরণে কোনো আস্ফালন নেই, শুধু নির্বিচলে ব্রত-উদযাপন করেছে।

এখন ক্লাসের শেষে দলে-দলে ঘরে বসে গুলতানি লাগিয়েছে। কেউ আজ খেলতে যায় নি। দলে-দলে বসে ক্ষুদিরামের গল্প করছে। গল্প করছে আলিপুর বোমার মামলার কথা। যতটুকু তারা শুনেছে লোকমুখে।

'এই স্যার আসছেন—স্যার।' ছেলের দল সচকিত হয়ে উঠল। যেখানে যেটুকু ন্যূনতা ছিল, শ্রদ্ধা দিয়ে স্তব্ধতা দিয়ে শৃঙ্খলা দিয়ে পূরণ করল ছেলেরা।

বেণীমাধব বারান্দা দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেলেন। চলায় গর্বের ভাব, মুখে আনন্দের আভা। ছেলেরা যেন বুঝেছে, লেখাপড়ার বাইরে, শুধু জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হবার বাইরে জীবনের আরো কোনো বৃহত্তর আদর্শ আছে। যার জন্যে মুহূর্তে সমস্ত কিছু ত্যাগ করা যায়, কৃপণ স্বার্থকে নিঃশেষে দেওয়া যায় জলাঞ্জলি। শুধু এক দিনের অন্ন নয়, ইহকাল-পরকাল।

কিন্তু এরা নিঃশব্দ কেন ?

একটা ঘরে, যে-ঘরে বেশি ছেলের ভিড় দেখলেন, তার দরজায় এসে দাঁড়ালেন বেণীমাধব। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা স্বদেশী গান জানো না ?'

ছেলেরা বলে উঠল, 'জানি স্যার।'

'তবে তাই গাও না।'

জানি বলা যেমন সহজ গান গাওয়া তত সহজ নয়। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, কোন গানটা ধরে, আর কেবা প্রথমে ধরে!

বেণীমাধব ভাবল তার জন্যেই বুঝি ছেলেরা আড়ষ্টতা অনুভব করছে। সরে যাবেন ভাবছেন হঠাৎ দলের মধ্যে একজনের উপর নজর পড়ল। মুহূর্তে উথলে উঠলেন বেণীমাধব: 'এ কী, সুভাষ, তুমি এখানে ?'

সুভাষ নীরবে একটু হাসল।

'বাড়ি যাও নি ?'

'যাব। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে যাব।'

বেণীমাধব ইঙ্গিতটুকু বুঝল। তার মানে, যারা তার ডাকে আজ উপবাস করেছে তাদের সে ছাড়তে, ছেড়ে দিতে, পারে না। তাদের থেকে পারে না সে আলাদা হয়ে থাকতে। দলের একজন হয়েই সে দলপতি, দলের বাইরে থেকে সে নিজেকে আরোপ করে না, ছলে-বলে চায় না করতে। যে পরের দাস হতে জানে না সে পরের প্রভু হবে কী করে ?

কেমন সুন্দর ধীর শক্ত প্রশান্তমূর্তি! যেন নেতা হবার মত। যেন মুহূর্তে সমস্ত সংসারসমুদ্র ছিন্ন করে নিতে পারে। কিন্তু আমি কি ঠিক দেখছি ? আমি কি দূরদৃক ?

বেণীমাধব ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। বারান্দায় আসতেই ঘরের ভিতর থেকে ছেলের দল সমস্বরে গান গেয়ে উঠল:

'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন॥
বন্দেমাতরম॥

বেণীমাধব শুনতে শুনতে হেঁটে চলে গেলেন ধীরে ধীরে।

পাঁচ

নিজের ঘরে এসে বসলেন বেণীমাধব। দেখলেন সামনেই দেয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র।

দেশ কী?

দেশ কি শুধু একটা পটে আঁকা ছবি? শুধু একটা ভূগোল-ভাগবিশেষ? শুধু সজল নির্জল জনপদ? মাটি পাহাড় নদী অরণ্য? না কি রত্ন খনি পণ্য শস্য, দ্রব্যের ভাণ্ডার? না কি শুধু মানুষ? সে সব মানুষই বা কারা?

দেশই মানুষের বৃহত্তম প্রাণচেতনা। তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণ বিস্তার। তার জীবনে সার্থকতম এক দৈবত আবির্ভাব। যা কিছু নিয়ে সে বাঁচবার আয়োজন করেছে, [illegible] তার ভাব, তার ভালোবাসা, তার ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—তা[illegible]ন যা কিছু অর্থবহ তারই এক উদাত্ত উচ্চারণ। পার্থিব হয়েও এক অপার্থিব উত্তেজনা।

রবীন্দ্রনাথ ধরিত্রীকে বলছেন তীর্থদেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণ আর স্বদেশকে বলেছেন ভারততীর্থ, মহামানবের সাগরতীর। তাঁর বিশ্বদেবতার প্রতিমূর্তি।

'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে?
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে॥'

'আসতে পারি?' বাইরে থেকে কে একজন কথা কয়ে উঠল।

'আসুন।'

একটি বাঙালি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। 'নমস্কার।'

বেণীমাধব নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন।

'আমাকে চিনতে পারছেন বোধহয়। আমি এখানকার কলেজের প্রফেসর।'

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি বসুন।'

প্রফেসর বসল। বললে, 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট?' বেণীমাধব ভ্রূকুঞ্চন করলেন: 'কেন বলুন তো?'

'তিনি আপনার স্কুল সম্বন্ধে কটা খবর চান।'

'স্কুল সম্বন্ধে? তা, তিনি নিজে না এসে আপনাকে পাঠিয়েছেন কেন?'

'না, না, তেমন কিছু নয়।' প্রফেসর গম্ভীর হল: 'সে খবর তো শহরের সকলেই জানে।'

বেণীমাধব একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। বললেন, 'যা সকলেই জানে তা আবার জানবার জন্যে লোক পাঠাবার দরকার কী? তবু জিজ্ঞেস করি সেটা এমন কোন খবর?'

'কেন, আপনার স্কুলের ছেলেরা এগারোই অগাস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন পালন করে নি?' প্রফেসর তম্বি করে উঠল: 'সারা দিন রাত উপোস করে থাকে নি?'

বেণীমাধব শান্ত ও দৃঢ়স্বরে বললে, 'ছেলেরা উপোস করেছে কি না করেছে তা ছেলেরা জানে। ছেলেদের জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনি জানেন না?'

'এগারোই অগাস্ট যে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন এ কে না জানে?' বেণীমাধব সুন্দর করে হাসলেন: 'আপনি জানেন না?'

প্রফেসর বিরক্ত হল। তার ভাবখানা এই যেহেতু সে কলেজের শিক্ষক সে স্কুলের যে কোনো শিক্ষকের চেয়েই উঁচু। তাই এবার

তার স্বরে ঝাঁজ এল। 'সে কথা হচ্ছে না। কিন্তু সেই ফাঁসি উপলক্ষ্য করে ছেলেরা হস্টেলে রান্না হতে দেয় নি আর আপনি হেডমাস্টার, জেনে-শুনেও কিছু বলেন নি।'

বেণীমাধবও একটু রূঢ় হলেন: 'ছেলেরা নিজের ইচ্ছেয় খাবে না, রান্না হতে দেবে না, তাতে আমার বলবার কী আছে?'

'না, আপনি হেডমাস্টার, আপনি বারণ করতে পারতেন।'

'একটা ভালো কাজ আমি বারণ করতে যাব কেন?'

'ভালো কাজ?' প্রায় একটা ঘা খেল প্রফেসর: 'একজন বিপ্লবীর হত্যাকাণ্ডকে ছেলেরা সমর্থন করবে?'

'আসল কথাটা তা নয়।' বেণীমাধব শান্ত মুখে বললেন, 'আসল কথা দেশকে ভালোবাসা, দেশের জন্যে সর্বস্ব—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করা—এমনি একটা আদর্শের প্রতি প্রণাম জানানো। একে আপনি ভালো কাজ বলবেন না? নিজের দেশ হলে আপনার ঐ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটও এটাকে ভালো কাজ বলতেন।'

'হ্যাঁ, সেই কথাটাই জানতে এসেছিলাম।'

দেশকে ভালোবাসা—সে কি শুধু ঘরে বসে স্তুতি-বন্দনা করা, না, মাঠে দাঁড়িয়ে গলাবাজি করা? কিছু একটা কাজ তো করতে হবে যাতে দেশের কিছু কল্যাণ হয়। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাটাই কি দেশের বৃহত্তম কল্যাণ নয়? সে মুক্তিসাধনের চেষ্টাতেই তো ক্ষুদিরামের আত্মদান। আদর্শটা দেখ, দেখ সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্য।

দেশ আমাদের মা। 'জনক-জননী-জননী'। কী বলছেন রবীন্দ্রনাথ? বলছেন, 'এমন মায়ের মত দেশ আছে? এত কোলভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথী-প্রাণা কোমলহৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়?

'তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক গর্ব, ভরি করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি!
পুণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে ॥'

কদিন পরে বেণীমাধবের নামে লম্বা খামে চিঠি এল। তার ঘরে আরো কয়েকজন শিক্ষক বসে আছে, বেণীমাধব খামের মুখটা সরল রেখায় ছুরি দিয়ে কাটলেন। খামটা খুলতে পর্যন্ত তিনি সৌন্দর্যের প্রতি সজাগ। ব্যস্ত হাতে বিশ্রী করে খামের একটা দিক ঝপ করে ছিঁড়ে ফেলে চিঠি বার করার তিনি পক্ষপাতী নন। যত বড় কঠিন চিঠিই হোক, খামটা সুশ্রী ভাবেই খুলতে হবে।

চিঠিটা খুলে পড়লেন বেণীমাধব। পড়তে-পড়তে মুখটা একটু কঠিন হয়ে উঠল। তারপর চিঠিটা আবার ধীরে ধীরে পুরলেন খামের মধ্যে।

কী না কী চিঠি! সবাই বেণীমাধবের মুখের দিকে তাকাল।

'আমাকে বদলি করে দিল।'

'বদলি করে দিল! হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, এই তো অর্ডার।'

'কোথায়?'

'কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল।' বেণীমাধব নির্লিপ্ত মুখে বললেন।

'একেবারে কৃষ্ণনগর? এ তো শাস্তি!' শিক্ষকদের একজন বললে।

আরেকজন সত্য কথাটা বললে। 'এ আর কিছুই নয়, সেদিনের সেই ক্ষুদিরামের জের।'

বেণীমাধব ম্লান মৃদুরেখায় হাসলেন, বললেন, 'যে কারণেই হোক সরকারি চাকরিতে বদলি আছেই, তা নিয়ে মন খারাপ করলে চলে না।'

'এ তো সে রকম নয়। এখানে কারণটা যে রাজনৈতিক।' বললে আরেকজন।

'সে আমার দেখবার কথা নয়।' বেণীমাধব দ্রব অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমার উপর আদেশ হয়েছে, আমি তা মানব। আদেশ পালন করব, আমার চাকরির এই সর্ত লঙ্ঘন করব কী করে?'

'আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করব।' কয়েকজন মাস্টার তপ্ত হয়ে উঠল।

চারদিকে হঠাৎ একটা চাপা কোলাহল শোনা গেল: 'বদলি! বদলি! কৃষ্ণনগর! স্যার বদলি হয়ে যাচ্ছেন—'

কোলাহলটা বাড়তে-বাড়তে একেবারে সুভাষচন্দ্রের একক কণ্ঠে স্পষ্টোচ্চারিত হল। 'আমরা এ হতে দেব না। আমরা বদলির অর্ডার রদ করাব। আমরা ধর্মঘট করব।'

সম্মিলিত ছাত্রজনতা সায় দিল: ধর্মঘট করব।

উনিশশো এগারো সালে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেই সুভাষ বেণীমাধবের সংস্পর্শে এসেছে। দৃঢ় অথচ স্নেহল, সুনীতিপরায়ণ অথচ উদারবুদ্ধি, নিরাসক্ত অথচ আত্মীয়তম, বেণীমাধব যেন সুভাষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বেণীমাধব যেন দূর দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় এক সমতল শস্যক্ষেত্র। কী সুন্দর করে যে পড়ান আর পড়ার বিষয়েরও বাইরে কত কী যে জানেন, সমস্ত ব্যক্তিত্বটাই বিনয় দিয়ে বিদ্যা দিয়ে তেজ দিয়ে মাধুর্য দিয়ে আলোকিত। সত্যবোধের দৃঢ়তা দিয়ে তাঁর মেরুদণ্ড ঋজু, অথচ চিত্ত মমতায় ভরা।

'সুভাষকে ডাকো।'

ছেলের দলকে পিছনে রেখে সুভাষ হেডমাস্টারের ঘরে প্রবেশ করল।

'তোমরা এসব কী আওয়াজ তুলেছ ?' বেণীমাধব অন্তরঙ্গ অথচ একটু বা কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেন।

সুভাষ চুপ করে রইল।

বেণীমাধব বললেন, 'আমার বদলির চাকরি, যেখানে বদলি করবে সেখানেই হাসিমুখে কাজ করব। এতে আবার বিক্ষোভ কিসের ?'

'কিন্তু যে কারণে বদলি করা হচ্ছে সেটা অন্যায়।' সুভাষ বললে দৃপ্তস্বরে।

'কারণটা তো তোমরা অনুমান করছ।' বেণীমাধবের মুখ শান্ত ও নির্লিপ্ত: 'অন্য কারণও হতে পারে। কারণ যাই হোক বদলি বদলি, কর্তব্য কর্তব্য। তোমাদের কাজ হচ্ছে লেখাপড়া শিখে বড় হওয়া আর আমার কাজ হচ্ছে ঘুরে ঘুরে হেডমাস্টারি করা—শুধু পড়ানো নয়, তোমাদের প্রাণে বড় হবার মন্ত্র দেওয়া। এর মধ্যে বিক্ষোভ কোথায় ?'

'ধর্মঘট না হয়, অন্য কোনো পথে কি প্রতিকার খোঁজা যায় না?'

'অন্য আবার কী পথ ? আবেদন-নিবেদন ?'

কথাটা ভাবতেই সুভাষের মুখে দৈন্যের ছায়া পড়ল।

সুভাষ দলবল নিয়ে চলে গেল।

কাঠজুড়ি নদীর ধার ধরে দু বন্ধুতে বেড়ায়, সুভাষ আর চারু। আর, আশ্চর্য, তারা দেশের কথা নিয়ে আলোচনা করে।

তারা দুজনেই শুনেছে তখন রুশ-জাপান যুদ্ধের কথা। জাপানের য়্যাডমিরাল টোগো কেমন রাশিয়ার বিশাল বাল্টিক বাহিনীকে উড়িয়ে দিয়েছে। জাপান তো কত ছোট দেশ, দুর্বল দেশ, সে যদি রাশিয়ার মতন বিরাট দেশকে ঘায়েল করতে পারে, ভারতবর্ষ কেন এঁটে উঠবে না ইংরেজের সঙ্গে ? চাই গঠনশক্তি, চাই বলসাধনা, চাই একত্ববোধ। ইংরেজ তো শঠতা করে সেই একত্ববোধের মূলেই কুঠার হানছে। আগে মানুষে-মানুষে ভেদ করো

পরে প্রদেশে-প্রদেশে ছেদ করব। জাপানের মত জাগ্রত দেশ প্রাচ্যে আর কোথায়? জাপানের জয়ে সমগ্র এশিয়ার অভ্যুত্থান। জাপানের দেখাদেখি ভারতবর্ষও এবার জাগুক। তার মরা গাঙে বান আসুক।

তার আগে ব্যুয়র যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় হল। যেহেতু ইংরেজ হেরেছে তাইতেই ভারতবর্ষের আনন্দ। শত্রুকে নির্জিত দেখার মত সুখ কোথায়?

নদীর ধারে কখনো বা হেডমাস্টারের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। সাধারণত এ অবস্থায় ছাত্ররা দূর থেকেই পলায়ন করে কিংবা দৈবাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে পাশ কাটায়।

কিন্তু সুভাষ পালাতে জানে না। নম্র হয়ে বেণীমাধবকে অভিবাদন করে। যদি মাস্টারমশাই নতুন কিছু শোনান।

'তুমি কি ইংরেজের উপর রাগ করে স্বদেশী হবে?' বেণীমাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'না কি স্বদেশের জন্যেই স্বদেশী হবে?'

সুভাষ বললে, 'স্বদেশের জন্যেই স্বদেশী হব।'

'সেইটেই বড় কথা। দেশকে ভালোবাসি ইংরেজের উপর রাগ করে নয়, দেশকে ভালোবাসি একান্ত করে সে আমারই দেশ বলে। আর সেবা না করে আমাদের উপায় কী। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ভগবান আমাদের কত ভাবে সেবা করছেন, আলো হয়ে জল হয়ে বাতাস হয়ে আগুন হয়ে, আর ক্রমাগত ডাকছেন, আমার মতন এমনি সেবাপরায়ণ হও। চোখের উপর তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন তবু আমরা দেখেও দেখি না, আলস্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি দেখতে চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, এমনি একটি আদর্শকে চোখের সামনে নিরন্তর দাঁড় করিয়ে রাখবে। এই আদর্শদর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন।'

আরো কত সময় কত কথা। অনুপ্রাণনার কথা।

কিন্তু তাঁকে তো এবার বিদায় দিতে হবে। তিনি চলে গেলে আদর্শদর্শন হবে কী করে?

হবে, তাহলেও হবে। কে যেন মনের গভীর থেকে বললে। আত্মদর্শনই আদর্শদর্শন।

কটক স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

প্ল্যাটফর্মে ছাত্রদের ভিড়। মাঝখানে বেণীমাধব। গলায় ফুলের মালা। যে ছেলে আসছে সেই তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে।

কোন একখানি পরিচিত প্রদীপ্ত মুখের জন্য বেণীমাধব যেন ভিতরে-ভিতরে চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। সুভাষ কোথায়? সে তার গুরুর কাছ থেকে শেষ আশীর্বাদ নিয়ে যাবে না?

ভাবতে-ভাবতেই সুভাষ এসে হাজির। হাতে সুন্দর একটা মালা। উদার শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে সে মালা বেণীমাধবের গলায় পরিয়ে দিয়ে আভূমি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে।

বেণীমাধব সুভাষকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি একটা মানুষের মত মানুষ হও।'

আমাদের প্রার্থনা। আশীর্বাদ ভগবানের।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

বেণীমাধব দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এ কী, তাঁর চোখে জল কেন?

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ। ট্রেনের দিকে সে তাকাতে পারছে না, তারও চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে।

এই চোখের জলেরই আরেক নাম আগুনের ফুলকি।

পাঁচ

উনিশশো এগারো সালেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল। ধূর্ত ইংরেজ দেখল এ ছাড়া বাংলাকে শান্ত করা যাবে না। না গ্রেপ্তার, না কারাদণ্ড, না জরিমানা। শত দমনে-পীড়নেও সে অবশীভূত। যাকে ভেবেছিল কুসুমসুকুমার সে যে আসলে কুলিশের চেয়েও কঠোর তারই পরিচয় পেল ইংরেজ। মনে মনে বলল, এখন তো পার্টিশন বাতিল করে দিই, তারপর আবার সময়মত পার্টিশন করিয়ে নেব। শোধ তুলব সুদে-আসলে।

এর মধ্যে অনেক জল বয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে। আলিপুর বোমার মামলা শেষ হয়ে গিয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া পেয়েছে। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশই তাকে ছাড়িয়ে এনেছে।

অরবিন্দ ধরা পড়ে ৪৮ নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে। গ্রেপ্তার করতে পুলিসের সঙ্গে গিয়েছে এক ইংরেজ অফিসর। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে সে তো হতভম্ব। আর ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে যে লোকটা সেই অরবিন্দ?

'হ্যাঁ, আমিই অরবিন্দ ঘোষ।'

ইংরেজ অফিসর তাকাল পুলিসের দিকে। অবিশ্বাস্য, এই অরবিন্দ ঘোষ, যে নয় দীর্ঘ বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছে। যে চাল-চলনে খানা-পিনায় পুরোদস্তুর সাহেব? যে নাকি ভালো করে বাংলা পর্যন্ত বলতে পারে না, তার এই দৈন্যদশা? তার একটা শোবার তক্তপোশও জোটে না? না বিছানা-বালিশ? এ যে একেবারে ইংরেজি ভোগবিলাসের প্রতি পরম তিরস্কার।

অরবিন্দের দিকে চেয়ে ইংরেজ অফিসর ধিক্কার দিয়ে উঠল। বললে, 'আই য়্যাম য়্যাশেমড অব ইউ।'

অরবিন্দ হাসল। তুমি হতভাগ্য তোমাকে কী করে বোঝাব এই ভোগবিরতি জীবনের কত বড় বিভূতি।

সার্চ করে পাওয়া গেল এক কৌটো মাটি। কী ওটা? বোমার মশলা?

'তার চেয়েও মারাত্মক।' বললে অরবিন্দ।

'কী?' অফিসর আঁতকে উঠল।

'দক্ষিণেশ্বরের মাটি।'

'তার মানে?'

'তার মানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের চরণ-ছোঁয়া তীর্থরেণু।'

'বোমার চেয়েও মারাত্মক কেন?'

'তার প্রতি ধূলিকণায়ই একেকটা বোমা। আর তার সবচেয়ে বড় বোমাটার নাম শোনেন নি? সে বোমাটার নামই স্বামী বিবেকানন্দ।'

ফ্রেজারকে আবার মারবার চেষ্টা হয়েছিল ওভারটুন হলে। এবারও গুলি ফসকাল। ধরা পড়ল জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিচারে দশ বছর জেল হয়ে গেল।

আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। তাকে খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের চারু বসু আলিপুর কোর্টেই গুলি করে মারলে। চারু ধরা পড়ল। প্রাথমিক তদন্ত করে তাকে দায়রায় সোপর্দ করা হল। চারু চেঁচিয়ে বললে, 'নো সেসনস ট্রায়াল, হ্যাং মি টুমরো।' সেসনস ট্রায়ালে দরকার নেই, আমাকে কালই ফাঁসি দাও।

আরো একটা কথা বললে চারু। আর সেটাই চরম কথা।

বললে, 'ইট ওয়জ অল প্রিঅর্ডেনড—এ সবই আগে থেকে

নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে আছে যে আশুবাবু আমার হাতে মারা যাবেন আর আমি ফাঁসির দড়িতে মারা যাব।'

এ যেন গীতার কথা। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিস পুলিন দাস সহ চুয়াল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করলে। যার বাড়িতেই সার্চ করে তার বাক্সেই গীতা-চণ্ডী পায়। পুলিস এক গাদা গীতা-চণ্ডী ধরে আলামত বানালে। সার্চ-লিস্টে রাখলে তার বিস্তৃত ফিরিস্তি।

আপিলে মামলা হাইকোর্টে এসেছে। সরকারী কৌঁসুলি সার্চ লিস্টটা পড়ছে সাড়ম্বরে, কোন কোন আসামীর বাড়িতে গীতা-চণ্ডী পাওয়া গিয়েছে। যেন গীতা-চণ্ডী বোমা-রিভলভারের চেয়েও ভয়ানক।

বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'ও দুটো বইয়ের অমন সবিস্তার উল্লেখের কারণ কী?'

'গীতা সাংঘাতিক বই।' বললে কৌঁসুলি।

'তার মানে?'

'গীতা রাজদ্রোহে প্রেরণা দেয়।'

'আর চণ্ডী?'

'ও আরো ভয়াবহ। ও একেবারে প্রত্যক্ষ খুনখারাপিতে উৎসাহ যোগায়।'

'আপনাকে এসব কে বাতলাল?' বিচারপতি রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন কৌঁসুলির দিকে: 'গীতা-চণ্ডী বহু হিন্দু বাড়িতে নিত্য পাঠ হয়। আমার বাড়িতেও হয়।'

'আপনার বাড়িতে!' সরকারী কৌঁসুলি তখন পালাবার পথ পায় না।

টেগার্টের আমলে যে বিপ্লবীকেই ধরা যায় তারই বাক্সে মেলে স্বামী বিবেকানন্দ। হয় রাজযোগ, নয় জ্ঞানযোগ, নয় অন্য কোনো গ্রন্থ।

'বিপ্লবের এত বীজ ছড়াচ্ছে এ স্বামীটা কে?' জিজ্ঞেস করে টেগার্ট: 'এটাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?'

'কী করে ধরবেন? বেঁচে নেই যে। মানে দেহে নেই।'

'বেঁচে নেই তো, লোকটার লেখা বইগুলো প্রস্ক্রাইব করা হচ্ছে না কেন?'

'ওগুলো সব ধর্মের বই। ইংরেজ যে আবার এদিকে খুব উদার-পন্থী, কারু ধর্মে হাত দেয় না।'

আশু বিশ্বাস খুন হল বটে কিন্তু মিস্টার হিউম খুন হল না। হিউমও আলিপুর বোমার মামলায় সহকারী সরকারী উকিল ছিল।

প্রথম চেষ্টা হয় গ্রে স্ট্রিটে, হিউম যখন যাচ্ছে গাড়ি করে। ছোঁড়া বোমা গাড়ি ছুঁতে পারল না, পড়ল গিয়ে চারজন পথচারীর উপর। দ্বিতীয় চেষ্টা হল হাওড়া স্টেশনে। হিউম ট্রেনে করে যাচ্ছে, চার-চারটে নারকেল বোমা ছোঁড়া হল তার কামরা লক্ষ্য করে। তিনটে তো কামরার মধ্যেই ঢুকল না আর একটা যদি বা ঢুকল, ফাটল না।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে। আরো দুবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু হিউম অক্ষত রইল।

সি.আই.ডি. পুলিসের বড় কর্তা ডেনহাম। তাকে খুন করবার উদ্দেশ্যে কলকাতার রাস্তায় তার গাড়িতে ছোঁড়া হল বোমা। এবারও সেই ভুল। গাড়িতে ডেনহাম নয়, কাউলি নামে আরেক ইংরেজ। লাভের মধ্যে চুঁচুড়ার ননীগোপাল মুখুজ্জের দ্বীপান্তর।

বোমা বিদীর্ণ হোক বা স্তব্ধ থাকুক, লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক বা বাঞ্ছিত ফল এনে দিক, সবই হচ্ছে পরাধীনতার আর্তনাদ। এ সন্ত্রাস নয় এ বিপ্লব। সাফল্য বা বৈফল্য, সমস্ত সেই বিপ্লবের ঢেউ। মোট কথা, বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ চাই। আর অস্ত্রের উত্তরে অস্ত্র, অত্যাচারের উত্তরে হত্যাচার। কৃষ্ণ শুধু মুরলীই ধরে নি, চক্রও ধরেছে। তাই সুদর্শনধারী কৃষ্ণের উদ্বোধন। 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি।'

রুশ যুদ্ধে জয়ী হবার পর জাপানীরা কী বলছে? বলছে, 'অন্তরে-অন্তরে আমরা যা ছিলাম তাই আছি। কিন্তু যেদিন দলে-দলে রাশিয়ান হত্যায় কৃতকার্য হলাম সেদিনই ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের জাতে তুলে নিল। আমরা আর অসভ্য থাকলাম না। আমরা পুরোদস্তুর সভ্য বনে গেলাম।'

তা হলে সভ্যতার মানদণ্ড কী? মানদণ্ড অস্ত্রশক্তি। যে যত বেশি হিংস্র সে তত বেশি সভ্য। যার যত বেশি ধ্বংস করার ক্ষমতা তারই তত বেশি মর্যাদা।

শামসুল আলম খুন হল কলকাতার হাইকোর্টের সিঁড়িতে। কলকাতা-পুলিসের ডি.এস.পি গোয়েন্দা-দলের সর্দার এই শামসুল। আলিপুরের বোমার মামলার প্রধান তদবিরকার। সে মামলার আপিল চলছে তখন হাইকোর্টে, সেই সূত্রে শামসুলের রোজ আনাগোনা। সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছে, বীরেন দত্তগুপ্ত তার পিছন থেকে গুলি মারে। এক গুলিতেই খতম শামসুল।

বীরেনের সঙ্গে ছিল রাজসাহীর সতীশ সরকার। গুলির পর সতীশ আগের থেকে ভাড়া করে রাখা গাড়ি চড়ে চলে যায় কিন্তু বীরেন শুধু উত্তেজনায় গুলিই ছুঁড়তে থাকে। তাকে যে পালাতে হবে, সতীশ যে তার জন্যে গাড়িতে অপেক্ষা করছে, এসব কথা তার মনেই থাকে না। তার অরাতিঘাতন মন্ত্র যে সফল হয়েছে এই আনন্দেই সে পরিপূর্ণ, বদান্য ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ।

গুলি ফুরিয়ে যেতেই ধরা পড়ল বীরেন। পুলিসি পীড়নের উত্তরে তার শুধু এক কথা: কিছু বলব না।

কিছুই বলবে না?

না, বিন্দু-বিসর্গও না। যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।

আদালতেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আঠারো বছরের ছেলে, অভী-র প্রতিমূর্তি। না, উকিল নেই আমার। আমার শুধু এক

বন্ধু আছে। সে ফাঁসি। শত উকিল লাগালেও সে ফাঁসি খসিয়ে নিতে পারবে না।

আদালতে সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য হচ্ছে, আসামীর পক্ষ থেকে কোনো জেরা নেই। ওরা যা খুশি বলুক, যেমন ইচ্ছে মিথ্যের পর মিথ্যের ইট সাজিয়ে অতিরঞ্জনের পেলেস্তারা দিক, কিছুই চঞ্চল করতে পারল না। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে বীরেন আর অনেক সময় সে-হাসি এমন উচ্চনাদ হয়ে উঠছে যে সাক্ষীর প্রাণে ভয় ধরে যাচ্ছে। কে জানে বাইরে বেরুলে কী গতি হয়! হাইকোর্টের যে চাপরাশিটা বীরেনকে ধরেছিল সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে তার কী দশা! বীরেন এবার হাসল না, শুধু চোখ পাকিয়ে চাপরাশির দিকে তাকিয়ে রইল। তাতেই, বিরাট ব্যাপার, চাপরাশি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

যথারীতি মামলা দায়রায় গেল। বিচারপতি ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে বললেন আসামীর পক্ষে দাঁড়াতে। কিন্তু কে নিশীথ সেন, বীরেন তার সঙ্গে একটা কথাও বললে না। নিশীথ সেন ভাবল, লোকটা বুঝি পাগল, নইলে আমার সাহায্যও প্রত্যাখ্যান করে। জজ-সাহেবকেও তাই জানাল, লোকটা পাগল, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় না।

পাগল? 'আমায় দে মা পাগল করে!' 'যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু। আজকে তোরে কেমন ভেবে, অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে, কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু পিছু।'

বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল। এই সূত্র ধরে কী করে কে জানে পুলিস ঠিক করল অরবিন্দ ঘোষকে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়াতে হবে। এত বড় একটা মনীষা ও অধ্যাত্মশক্তিকে জেলের বাইরে রাখা ঠিক হবে না।

ভগিনী নিবেদিতা এ খবর পেল। আর পেয়েই তা পৌঁছে দিল অরবিন্দের কাছে। পালাও। দেরি কোরো না।

অরবিন্দ চলে গেল চন্দননগর।

ভগিনী নিবেদিতা! হ্যাঁ, লোকমাতা নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা।

হ্যাঁ, সে ভারতবর্ষের পূজারিনী। সুতরাং সে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূজারিনী। আর যারা সর্বস্ব তুচ্ছ করে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে ছুটেছে সেই সব মরণপণ যুবকদের গুপ্ত সমিতির সে সমর্থক। সমর্থক বললে কম বলা হয়, সে সক্রিয় সহায়ক। সেও স্বামীজির অভী-মন্ত্রের উদ্‌গাত্রী। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় সাদা পাথরে গড়া একটি তপস্বিনীর মূর্তি।

কলেজ স্ট্রিটে অরবিন্দের বাসায় কতবার গিয়েছে নিবেদিতা।

নিবেদিতার জন্যে অরবিন্দের বরং ভয়। বলেছে, 'পুলিস তো আপনাকেই ধরবে।'

নিবেদিতা স্নিগ্ধমুখে হাসল, 'আইরিশ বিপ্লবের কোলে আমি মানুষ হয়েছি, কারাগার বা নির্বাসনে আমার ভয় নেই!'

'না, সত্যি ভয় নেই। আপনাকে আপনার গায়ের চামড়া বাঁচাবে। আপনি যে মেমসাহেব।'

নিবেদিতা প্রশান্তস্বরে বললে, 'না আমাকে বাঁচাবে আমার গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ। শ্মশান আর গৃহ যাঁর কাছে সমান। যিনি সর্বনিশ্চিন্ত, সর্বনির্ভয়।'

সুভাষের জীবনে এই স্বামীজির বাণী পৌঁছে দিল কৃষ্ণ সেন—প্রফেসর কৃষ্ণ সেন। সব কথার সার কথা, একটি মাত্র কথা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ যে আত্মা তা দুর্বলের লভ্য নয়। যে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও মেধাবী সেই এই বিত্তের অধিকারী। সমস্ত অজ্ঞানপুঞ্জের উপর ব্রহ্মাস্ত্রের মত কাজ করে উপনিষদের একটি মাত্র শব্দ—অভয়। মঙ্গলপথের নায়কই হচ্ছে এই অভয় আর হীনতা দুর্বলতা কাপুরুষতাই পাপ। তাই একমাত্র ধর্মই হচ্ছে বলসাধনা, শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা।

সুভাষ তার প্রাণে যেন এক নতুন তাপ নতুন দীপ্তি খুঁজে পেল। নতুন বিশ্বাস।

কী বলেছেন স্বামীজি? বলেছেন, 'বিশ্বাস—বিশ্বাসই মানুষকে সিংহ করে। যদি জড়জগতে বড় হতে চাও, বিশ্বাস করো তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জেনো, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রয়েছে, সেই অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেই ভাণ্ডার থেকে যত ইচ্ছে শক্তি সংগ্রহ করতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করো।

মূল কথা হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না হলে বিশ্বাস আসবে কী করে? নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখ—তোমার মাঝেই রয়েছে সেই অনন্তের আয়তন। আর ঈশ্বর কে? তুমিই ঈশ্বর। তাই আত্মবিশ্বাসই ঈশ্বরবিশ্বাস।

আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে তা একান্ত অনস্তি-ভাবপূর্ণ—স্কুলবালক কিছুই শেখে না, তার সমস্ত কেবল ভেঙে-চুরে যায়—ফল শ্রদ্ধাহীনত্ব। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করেছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলছে, সেই শ্রদ্ধারই বিলুপ্তি। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দ-ধানঃ বিনশ্যতি। তাই আমরা বিনাশের এত কাছাকাছি চলে এসেছি।'

'ধর্ম আর কী!' আবার বলছেন স্বামীজি, 'ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ। তুমি হচ্ছ অনন্তেরই অংশ, এই হচ্ছে তোমার স্বরূপ। তুমি তোমার স্বরূপে উদঘাটিত হও। সেই উদঘাটনের আগে তোমার ছুটি নেই। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। ওঠো জাগো তোমার সেই পরমতমকে না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়ো না।'

কৃষ্ণ সেন সুভাষ আর তার সন্নিহিততম বন্ধু চারুকে স্বামীজির

গ্রন্থাবলী দিয়ে গেল পড়তে। বললে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে পড়ো, যেখানটায় শক্ত ঠেকে, আমাকে বোলো, আমি চেষ্টা করব বুঝিয়ে দিতে। পড়তে-পড়তে দেখবে একটা অনির্বচনীয় উপলব্ধির সমুদ্রে—রসের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছ।

'আর এ এমন এক সাগর, অমৃতের সাগর, যেখানে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়।'

'তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলুন।' সুভাষ আর চারু একসঙ্গে অনুরোধ জানায়।

কৃষ্ণ সেন শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নমস্কার করে বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে কর্ম, নিষ্কাম কর্ম একটা উপায় মাত্র।'

'নিষ্কাম কর্ম!'

'হ্যাঁ, ফলের আশা না রেখে কাজ করে যাওয়া। শুধু কাজের জন্যে কাজ করে যাওয়া। খেলার জন্যেই খেলে যাওয়া। এই যে দেশের কতগুলো যুবক স্বাধীনতার জন্যে আত্মাহুতি দিচ্ছে,' কৃষ্ণ সেনের দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'তারাই নিষ্কাম কর্মী। তাদের এ উদ্দেশ্য নয় দেশ স্বাধীন করবার পর তারা মন্ত্রী হবে কি লাট-বেলাট হবে, কি অন্তত বড়লোক হবে। তাদের আত্মাহুতির জন্যেই আত্মাহুতি। এই দেখ স্বামীজি কী বলছেন।' কৃষ্ণ সেন বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটালো: 'ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ—মানুষ চাই, পশু নয়। নিরাশ হয়ো না, স্মরণ রেখো, ভগবান গীতায় বলছেন, কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়। আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। আমাদের আবার ভয় কী, নৈরাশ্য কী। উঠে পড়ে লাগো! নাম যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্যে পিছনে তাকিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কর্ম করো। মনে রেখো, তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করে রজ্জু প্রস্তুত হলে তাতে মত্ত হাতিকেও বাঁধা

যায়। সাহসী হও, তোপের মুখে যাও—মানুষ একবার মাত্রই মরে। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এমনি কত শত কথা—'

বালগঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ অতিথি হয়ে কাটিয়েছিলেন কয়েকদিন। কে জানে সেই সংস্পর্শ থেকে কোনো অনুপ্রাণনা তিলকে সঞ্চারিত হয়েছিল কিনা।

বম্বে থেকে পুনা যাচ্ছে তিলক, স্টেশনে, তার ট্রেনের কামরায় একজন সন্ন্যাসী উঠল। কজন গুজরাটি ভদ্রলোক সন্ন্যাসীকে তুলে দিতে এসেছিল, তিলকের সঙ্গে মামুলি পরিচয় করিয়ে দিল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি পুনা যাচ্ছেন। পুনাতে আপনার বাড়িতেই তো থাকতে পারেন।'

'অনায়াসে।' তিলক আতিথেয়তায় প্রসারিত হল।

নিভৃত হবার পর তিলক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার নাম কী?'

সন্ন্যাসী মৃদু হাসল। বললে, 'সন্ন্যাসীর কোনো নাম নেই।'

ন দশ দিন সন্ন্যাসী থাকল তিলকের বাড়িতে, কিন্তু তিলেকের জন্যেও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়া কথা নেই। বেদান্ত আর অদ্বৈতবাদ। সোঽহং আর তত্ত্বমসি। আমিও ঈশ্বর তুমিও ঈশ্বর।

তিলেকের জন্যেও অহঙ্কার নেই আত্মপ্রচার নেই। কে তিনি ধূসরতম ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এমন নির্লিপ্ত এমন নিরাসক্ত।

'আচ্ছা মহারাজ, গীতা কী শেখায়, সংসারত্যাগ, না, নিষ্কাম কর্ম?'

সন্ন্যাসী বললে, 'নিষ্কাম কর্ম।'

'আমারও সেই মত।' বললে তিলক, 'ত্যাগ যদি কিছু থাকেও সে কর্মত্যাগ নয় সে ফলত্যাগ।'

'হ্যাঁ,' বললে সন্ন্যাসী, 'সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধি। কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ আর ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ।'

সন্ন্যাসী চলে গেল—কোথায় গেল কে জানে। সঙ্গে একটা কপর্দকও নেই, আসনের জন্যে অজিন আর পরিধানের জন্যে একখানি কি দুখানি গেরুয়া। আর হাতে কমণ্ডলু। এই সন্ন্যাসীর সমস্ত বিত্ত।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল তিলক।

'জানি না।' বললে সন্ন্যাসী, 'শুধু এইটুকু জানি পথই আমাকে পথ দেখাবে। আমার গুরুমহারাজ শুধু বলতেন এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো—'

কোথায় গেল কে বলবে? দু-তিন বছর বাদে খবর এল স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্মসভায় দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছে। ভারতবর্ষের যে শহরেই যাচ্ছে দিচ্ছে রোমাঞ্চকর বক্তৃতা, মানুষের প্রকৃত সত্তাই যে ঈশ্বরত্ব এই রোমাঞ্চ। এই তো কাগজে-কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে। এ কী আশ্চর্য, এ তো সেই সন্ন্যাসী যে পুনায় তার বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিল ন-দশ দিন—সেই ঈশ্বরতন্ময় বেদান্তসিংহ।

স্বামীজিকে তখুনি চিঠি লিখল তিলক। আপনিই কি সেই সন্ন্যাসী?

স্বামীজি উত্তর দিলেন : আমিই সেই।

সেই তিলকের ছয় বছর জেল হল। কেন? ক্ষুদিরামের কাজ পরোক্ষে সমর্থন করে তার কাগজ কেশরীতে প্রবন্ধ লিখেছিল বলে। লিখেছিল, বোমা ছুঁড়ে মারাটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু কী করবে ক্ষুদিরাম? ব্রিটিশের এত লাঞ্ছনা ও অপমানের উত্তরে সে আর কী করতে পারে? হত্যাকে নিন্দা করতে চাও করো, কিন্তু আত্মাহুতিকে বন্দনা করো।

ছয়

'চারু! চারু!' চারুর বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সুভাষ ডাকছে বন্ধুকে।

চারু বেরিয়ে এল।

'মঠে রামদাসবাবাজী এসেছেন, যাবে?'

মঠ মানে চরণদাস বাবাজীর মঠ, বুঝতে পারল চারু। বললে, 'যাব।'

'চলো না দেখি কী বলেন?'

'চলো।'

দুই বন্ধু হাঁটতে লাগল।

'স্বামী বিবেকানন্দ পড়ছ?' চারু জিজ্ঞেস করলে।

'পড়ছি। বুঝছি। ভীষণ ভালো লাগছে।'

'অদ্ভুত ভালো।'

সুভাষ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আমিই সেই, সোঽহং। কত বড় আশা। বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি তেমনি আমার মধ্যেই ব্রহ্ম। একটা স্ফুলিঙ্গের মধ্যে প্রকাণ্ড দাবানল।'

'কত বড় সম্ভাবনা।' চারুও প্রতিধ্বনিত হল: 'আমরা সবাই মেঘে ঢাকা সূর্য, শুধু মেঘটা সরিয়ে দেওয়া।'

'অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ, স্বামীজি বলছেন,' বললে সুভাষ, 'যা মানুষকে তার স্বাধিকার দেয়, যা তার সমস্ত পরাধীনতা, সমস্ত কুসংস্কার দূর করে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ও কাজ করবার সাহস যোগায়। সেই শেষকালে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম করে তোলে।'

'ম্যাক্সমুলারও তাই বলেছেন, অদ্বৈতবাদই ধর্মজগতে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।'

'অদ্বৈতবাদ এত সোজা, স্বামীজি বলছেন, একটা শিশুকেও আমি এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারি।' সুভাষ বললে।

চারু প্রতিধ্বনিত হল: 'হ্যাঁ, আরো বলেছেন, উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলোর শিক্ষা একেবারে প্রথম থেকেই দেওয়া উচিত।'

দু বন্ধু মঠে এসে উপস্থিত হল।

দেখল বাবাজি মঠের বাইরে গাছের নিচে বসে আছেন, তাঁর মনের প্রশান্তিই যেন গাছের ছায়া হয়ে বিস্তীর্ণ। দু বন্ধু প্রণাম করে মাটিতে বসল আসনপিঁড়ি হয়ে।

সশ্রদ্ধ বিনীত কণ্ঠে সুভাষ বললে, 'আমরা আপনার কাছে এসেছি, আমাদের কিছু উপদেশ করুন।'

বাবাজি বিস্মিত হলেন। বললেন, 'আহা এমন কথা তো কেউ বলে না। সবাই তো শুধু বক্তৃতা ঝাড়ে, উপদেশ শুনতে চায় কজন? সকলে শুধু নেতা হতে চায়, সেবক হতে চায় না। সেবক হতে না শিখলে নেতা হবে কী করে?'

'স্বামী বিবেকানন্দও সেই কথা বলেন,' সুভাষ বললে, 'বলেন, যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও।'

চারুও যোগ করে দিল: 'আরো বলেন, নেতৃত্ব করবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও, আর একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে গোপনে নিন্দা করছে সে নিন্দা শুনো না।'

'বাঃ, খুব ভালো কথা।' বাবাজি বুঝি স্বামীজি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল, বললেন, 'নেতৃত্বের লোভ একটা পাশব প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। আমি তোমাদের, তোমাদেরি লোক, এ যে শুধু বলতে পারে নয় করে দেখাতে পারে, সেই নেতা হবার উপযুক্ত। তারই জন্যে প্রথম কথা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, চরিত্রগঠন। স্বামী বিবেকানন্দের তপস্যা আর কী!

শুধু ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য না থাকলে শরীরে বল থাকবে না, আর শরীরে বল না থাকলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবে কী করে ?'

সুভাষ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'স্বামী বিবেকানন্দও ঐ কথা বলেন। চাই লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, বজ্রভীষণ মনোবল।'

বাবাজি প্রসন্নমুখে বললেন, 'বলবেনই তো। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরও এই কথা। তাঁদেরও আগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ সুর। কী সব শক্তিশালী পুরুষ! তাঁদের পৌরুষের ভিত্তিই ঐ ব্রহ্মচর্য। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার'।'

'আমার স্বামী বিবেকানন্দকে খুব ভালো লাগে।' সুভাষ পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললে।

বাবাজি উদার স্বরে অকুণ্ঠ সায় দিলেন: 'লাগবেই তো, সকলকেই ভালো লাগবে। বিবেকানন্দের জ্ঞান, রামকৃষ্ণের ত্যাগ আর মহাপ্রভুর ভক্তি। আবার সকলের মধ্যেই সমস্ত।'

সুভাষ আনন্দে উথলে উঠল: 'বিবেকানন্দ দেশকে, দেশের প্রতি ধূলিকণাকে কী রকম ভালোবাসেন! দেশমাতাই তাঁর জগন্মাতা। কী রকম বলছেন, আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছু দিন ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই। আর-আর দেবতারা ঘুমুচ্ছেন। তোমার স্বজাতি দেশবাসী এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। বলুন ঠিক বলেন নি ?'

'নিশ্চয়ই, সুন্দর বলেছেন।'

'আর ওঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবা—খুব ভালো লাগে আমার। শিব ভাবলেই সেবা আর সেবা থাকবে না, পূজা হয়ে উঠবে।'

বাবাজি সমর্থনে মাথা নাড়লেন: 'মহাপ্রভুরও সেই কথা—জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।'

চারু বন্ধুপ্রীতিতে কোমলার্দ্র হয়ে বললে, 'আবার এদিকে যখন কৃষ্ণকীর্তন হবে তখন ইনি কান্নায় ভেসে যাবেন।'

বাবাজি গদ্গদভাবে বললেন, 'আহা, সব একসঙ্গে এসে মিলেছে। কিন্তু সব টিকিয়ে রাখতে হলে চাই চরিত্র, ব্রহ্মচর্য। যে নৌকোয় হাল নেই সে ঝড়তুফানে টিকবে কী করে? তেমনি যার চরিত্র নেই সে অতল পাতালে ডুববে।'

'আপনার উপদেশ আমরা পালন করব। আপনি আশীর্বাদ করুন।'

দু বন্ধু আবার আভূমি প্রণত হল, বাবাজি ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ। যে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত সেই বীর্যবান হতে পারে। তারই রক্তবিন্দু তেজকণিকায় পরিণত হয়। আর কোনো তপস্যা তপস্যা নয়, ব্রহ্মচর্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যে ব্রহ্মচারী তারই অন্তর আনন্দময়, মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ, শরীর দৃঢ়, মুখশ্রী লাবণ্যপূর্ণ। জীবনের এতগুলি সম্পদ কে বিসর্জন দেবে?

'আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া। দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥' যে পর্যন্ত নিদ্রায় না আচ্ছন্ন হও, যে পর্যন্ত না কালগ্রাসে পতিত হও, সে পর্যন্ত বেদান্তচিন্তায় সময় ব্যয় করো, কামকে কিছুমাত্র অবসর দিও না।

বেদান্তচিন্তা কী? 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা'—সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই ব্রহ্ম। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ।' আমিও ব্রহ্মাত্মক আর এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চও ব্রহ্মাত্মক। কিছুই ব্রহ্মবিরহিত, ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়। সুতরাং বেদান্তচিন্তা অর্থ সর্বক্ষণ ঈশ্বরমননে অধিষ্ঠিত থাকা।

আবার যখন দ্বৈতবাদে আসবে, ভক্তিতে আসবে, তখন তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা আমি সন্তান, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তখন ঈশ্বরকে শুধু জানা নয়, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে জানা। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।'

আর এই ঈশ্বরে আশ্রিত হতে না পারলে কী করে নির্ভয় হতে

পারব ? আর নির্ভয় হতে না পারলে কী করে উচ্চারণ করতে পারব বন্দেমাতরম ? দেশমাতাকে জগন্মাতারূপে চিনব কী করে ?

দু বন্ধু ফিরে যাচ্ছে আশ্রম থেকে। যেতে-যেতে কথায়-কথায় সুভাষ বললে চারুকে, 'বুঝলে চারু দেশকে শুধু ভালোবাসলেই চলবে না, তার বন্ধনমোচন করে তাকে স্বাধীন করতে হবে।'

চারু বললে, 'নিশ্চয়ই, একশোবার। দেশ যদি আমাদের মা হয় তবে তাঁর পায়ের বেড়ি আমাদের খুলে ফেলতেই হবে।'

'তার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় তাতেও আমরা পেছপা হব না।'

দেশমুক্তির আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, আগুন জ্বলেছে মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশে। বাংলা যা দেখায় তাই আর সকলে শেখে। বিদায়-সংবর্ধনা সভায় নাসিকের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা গুলি ছোঁড়ে। এ গুলি ফসকাল না, জ্যাকসন নিহত হল। অনন্তলক্ষ্মণ কানাইয়ে, বিনায়ক দেশপাণ্ডে আর কৃষ্ণজি কোপাল কার্ভের ফাঁসি হল। বিনায়ক দামোদর সাভারকার পিস্তল পাঠিয়েছে বিলেত থেকে এই অজুহাতে তাকে বিলেতে গ্রেপ্তার করে। জাহাজে করে যখন তাকে দেশে আনা হচ্ছে তখন সে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে। সেটা মার্সাই বন্দরের কাছাকাছি, বাথরুমে যাবার নাম করেই সে পুলিসের দৃষ্টির অগোচরে আসে। ইংরেজ পুলিস কল্পনাও করতে পারে নি কেউ মত্ততরঙ্গ সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে পারে। সে কী করে বুঝবে পরাধীনতার কী জ্বালা! আর সে বন্ধন মোচনের জন্যে দেশমাতৃকার বৃহৎব্রতধর বীর পুত্র এত অক্লেশে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে।

সাভারকার সাঁতরে তীর পেল বটে কিন্তু মুক্তির তীরে পৌঁছুতে পারল না। ফরাসী পুলিস তাকে ধরে মাসতুতো ভাই ইংরেজ পুলিসের কাছে গছিয়ে দিল। ভারতবর্ষে চালান হল সাভারকার। ইংরেজের বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

তার আগে মদনলাল ধিঙড়ার কথা মনে করো। ভারতসচিব মর্লির এ.ডি.সি. স্যার কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করে মারলে। মারলে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। ওয়াইলিকে বাঁচাতে গেল ডাঃ লাল কাকা, কিন্তু সেও বাঁচল না।

পাঞ্জাবি যুবক ধিঙড়ার কী আনন্দ! সারা ইংলণ্ডে এ বিশ্বাস জেগেছিল কালা আদমির গুলি খালি ফসকায়, নিজের দেশের লোকদের পারতে পারলেও শাদা আদমিকে স্পর্শও করতে পারে না। কী করে পারবে? শাদা আদমিরা যে স্বর্গপ্রসূত! বিধাতার বরপুত্র।

এ শুধু শাদা আদমিকে মারা নয়, একেবারে খোদ লণ্ডনে দাঁড়িয়ে মারা!

বিচারে ধিঙড়ার ফাঁসি হবে এ আর বেশি কথা কী। ফাঁসির আদেশ শুনে ধিঙড়া ইংরেজ জজকে সম্বোধন করে বললে, আমাকে আমার দেশের জন্যে মরবার সম্মান দিচ্ছেন বলে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

তারপর মাদ্রাজে, তিনিভেলির ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট য়্যাশকে একটা রেলের কামরার মধ্যে খুন করা হল। আততায়ী যুবক ভিঞ্চি আয়ার আত্মহত্যা করে গ্রেপ্তার এড়াল। তার পকেটে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, তাতে লেখা: ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে ভিঞ্চি তার কর্তব্য করেছে মাত্র। তার কদিন আগেই সে এক পুস্তিকা প্রচার করে, তার মূল কথা: ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াও। রামদাস স্বামী আর শিবাজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।

সুভাষ বললে, 'ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারলে একসঙ্গে কত শত্রু মারা যেত।'

'কিন্তু যুদ্ধ করবার মত হাতিয়ার কই?'

'সেই হচ্ছে কথা। কিন্তু এমনি খুচরো হত্যা করে কী করে ওদের ঝাড়েবাঁশে তাড়াবে?'

সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' সরকার নিষিদ্ধ করে

দিয়েছে। তার মানে শুধু ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া পড়ো। ইংরেজ যা দয়া করে বলে দেবে তাই তোমার দেশের ইতিহাস।

'তা আমরা মানি না।' চারু আর সুভাষ দুই বন্ধুই স্কুলের এক বিতর্ক সভায় উচ্চনাদ আপত্তি জানাল। ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কী এই নিয়ে বিতর্ক। উপকারিতার কথা পরে হবে, ইতিহাসটা কী বস্তু তাই আগে সাব্যস্ত হোক। ইতিহাসটা অন্তত সত্যবস্তু হবে এ দাবি প্রাথমিক। তাই সমস্ত সত্য ইংরেজর লেখা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না, ভারতীয় ঐতিহাসিকের রচনাও পড়তে হবে। ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া আমরা পড়ব, সঙ্গে সঙ্গে পড়ব দেউস্করের 'দেশের কথা।'

'দেশের কথা!' হেডমাস্টার খেপে গেল।

রিপোর্ট পাঠাল উপরে। এই দুটো দেশদ্রোহী ছেলেকে অন্তরীন করা যায় কি না।

এই কথা? সব ছেলে লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়তে লাগল দেশের কথা। সুভাষ বাঙালি ছেলেদের নিয়ে দল পাকাল। যদি হেডমাস্টার কোনো শাস্তি দিতে চায় তা হলে সব বাঙালি ছেলে একজোট হয়ে ট্রান্সফার নিয়ে বসবে। হ্যাঁ, একজোট হয়ে। সুভাষের গঠনশক্তির জোর দেখে হেডমাস্টার ঘাবড়ে গেল। বাঙালি ছেলেরা চলে গেলে তার স্কুলের আর থাকল কী। বাঙালি ছেলেরাই তো ভালো ছেলে, স্কুলের-নাম-রাখা ছেলে!

কিন্তু এ সব বোধহয় রাজনীতি হচ্ছে। সুভাষের বাড়িতে রাজনীতি অচল। দাদারা মাঝে মাঝে যা বলাবলি করে তাই সুভাষ শোনে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আন্দোলনে কেউ এখনো নামে নি, নামবার কথা ভাববারও কারু অবকাশ নেই।

নানা বিশুদ্ধ চিন্তায় শুধু ধমনীতে রক্ত নির্মল হতে থাকে।

দু বন্ধু, সুভাষ আর চারু, কাঠজুড়ি নদীর ধারে বেড়ায় আর গান গায়ঃ

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়—
সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল ভাই
আগে চল আগে চল ভাই॥'

সাত

সন্ধ্যায় নিয়মিত বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে সুভাষ আর চারু, হঠাৎ দেখল একটা বাড়ির সামনে কতগুলি লোকের ভিড় জমেছে। এ কী, কে, কারা কাঁদছে? ব্যাপার কী?

'কী হয়েছে?' সুভাষ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'বাড়ির কর্তা মারা গিয়েছে।'

এটুকু খবরই তো যথেষ্ট। এর বেশি কে মাথা গলায়! এটুকু খবর নিয়ে কেটে পড়াই তো যথেষ্ট ভদ্রতা।

না, আরো একটু জানা দরকার।

'কে বাড়ির কর্তা?'

'একজন বাঙালি মুহুরি।'

'কখন মারা গেছেন?'

'সকালের দিকে।'

'সকালের দিকে!' সুভাষ বিস্ময় মানল: 'তা এখনো মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় নি কেন?'

'সেই নিয়েই তো কান্না। মৃতের জন্যে তত নয় যত মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে না তার জন্যে।'

'সৎকার হচ্ছে না কেন?'

'ভদ্রলোক বসন্ত হয়ে মারা গেছেন, তাই তাঁর মৃতদেহ কেউ ছুঁতে চাচ্ছে না।'

'ছুঁতে চাচ্ছে না আর তাই আপনারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন? এত ভয়, এত কুসংস্কার!' সুভাষ বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল: 'বেশ, আর কেউ না যায়, আমি একাই এই মৃতদেহ কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাব।'

চারু এগিয়ে এসে সুভাষের হাত ধরে টেনে বাধা দিল। বললে, 'সে কি, তুমি—'

'হ্যাঁ, তুমি আমার বাড়ি গিয়ে খবর দাও, আমি শ্মশানে যাচ্ছি, কখন ফিরব তার ঠিক নেই।'

ভিড় সরিয়ে এগুতে চাইল সুভাষ।

একজন চারুকে জিজ্ঞেস করলে, 'কে ও?'

চারু বললে, 'সরকারী উকিল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসুর ছেলে।'

'বলো কী! এত বড় ভদ্রলোক—'

সুভাষ জনতাকে লক্ষ্য করে অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'পথ দিন, বাড়ির ভেতরে যাই—'

একটি যুবক এগিয়ে এসে সুভাষকে বললে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

আরো একটি ছেলে এগিয়ে এল। কোঁচা খুলে কোমরে জড়াল, বললে, 'আমিও যাব।'

'হ্যাঁ, কিসের ভয়, কিসের প্রাণের মায়া!' সুভাষ বললে উদ্বেল কণ্ঠে, 'পরসেবাই ঈশ্বরপূজা।'

স্বামীজির কথাটা কাজ করল মন্ত্রের মত। ভিড়ের মধ্যে তখন রোল উঠল : আমিও যাব, আমিও যাব।

কী বলছেন স্বামীজি? বলছেন, তারাই যথার্থ জীবিত যারা অপরের জন্যে জীবনধারণ করে। পরোপকারই জীবন, পরহিত-চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। কাজ করো, পরের হিতের জন্যে কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। পরোপকারের জন্যেই সাধুদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যে সমুদয় ত্যাগ করবে। তোমার ভালো করলেই আমার ভালো হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। সমস্ত শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য শুধুই আছে—পরোপকারস্তু

পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম, মানে, পরোপকার করলেই পুণ্য আর পরপীড়ন করলেই পাপ।

পরোপকারও করতে চাইলেই করা যায় না। গাঁয়ের লোকদের লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক গাঁয়ে ঢুকল সুভাষ। ওরে ওরা লেখাপড়া শেখাতে এসেছে বলছে, পালা, ওদের আসল মতলব কে জানে। ভদ্রলোকদের পোশাকে আচ্ছাদিত সুভাষ ও তার বন্ধুদের গাঁয়ের লোক কিছুতেই আপন জন বলে মনে করতে পারল না, দূর থেকে দেখেই তারা ছুট দিল।

পরোপকার পরে হবে, আগে কিছু আত্মোপলব্ধি হোক। সুভাষ যোগে মন দিল। মনকে ধ্যানে সমাহিত করে বসল ঘরের কোণে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো তাই বলেছেন, ধ্যান করবে মনে, বনে, বা কোণে। সেই কোণেই বসেছে সুভাষ। ধ্যানে মনে শান্তি জাগবে, পবিত্রতার শান্তি আর শরীরে প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রসন্নতা।

কিন্তু শুধু বই পড়ে কি যোগ শেখা যায়? যোগ তো শুধু চোখ বুজে বুক টান করে চুপচাপ বসে থাকা নয়, যোগ হচ্ছে ভগবৎ-সত্তায় নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেওয়া, বাইরে নিষ্কাম কর্ম করা আর অন্তরে ভগবৎ-তন্ময় হয়ে থাকা, যুদ্ধেও যোগের বিক্ষেপ নেই, সেই যোগ শিখতে কি একজন গুরুর দরকার হবে না?

কখন গুরু আসে ঠিক নেই, ইতিমধ্যে নিজের চেষ্টায়ই যথাসাধ্য করা যাক। যোগ না করলে অভিনিবেশ গাঢ় হবে না, মেধা তীক্ষ্ণ হবে না, ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হবে না। তাই মেঝেতে আসন করে সুভাষ বসেছে তদ্গত হয়ে। কতক্ষণ বসেছে তার খেয়াল নেই।

মা প্রভাবতী ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী রে সুবি, তোর হল? আমাকে আজ কথামৃত পড়ে শোনাবিনে?'

মার ডাক শুনে সুভাষ উঠে পড়ল। উঠেই মাকে প্রণাম করল।

প্রভাবতী এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, 'এ কী!'

সুভাষ লজ্জিত মুখে বললে, 'এখন থেকে ভেবেছি ভোরে উঠে রোজ তোমাকে আর বাবাকে প্রণাম করব।'

ছেলের কখন কী খেয়াল হয় কে বলবে। সস্নেহ প্রশ্রয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রভাবতী। মাকে যখনই চিঠি লিখেছে সুভাষ, ঠিকানায় লিখেছেঃ শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী। পরমপূজনীয়া বা শ্রীচরণকমলেষু এ সব ঠিকই আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাকে শ্রীযুক্তা না বলে শ্রীমতী বলা। শ্রীযুক্তা ও শ্রীমতীর একই অর্থ, তবু শ্রীযুক্তা যেন দূরস্থিতা আর শ্রীমতী যেন সর্ববান্ধবরূপিণী অন্তরঙ্গা। শ্রীযুক্তা যেন পূজার ঘরে সিংহাসনে বসে আছে আর শ্রীমতী যেন ঘরের কাজকর্ম করছে, ক্ষুধায় খেতে দিচ্ছে, রোগে সেবা করছে, শাসনে দৃঢ় হয়েও সহস্র আবদার পালন করছে হাসি-মুখে। 'গৃহলক্ষ্মীশ্চ গেহিন্যাং গেহে চ গৃহদেবতা।' 'যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু।'

সুভাষ বইয়ের সেলফ থেকে কথামৃত নিয়ে বসল মেঝেতে। মা-ও বসলেন।

পড়তে-পড়তে এক জায়গায় হঠাৎ থেমে পড়ল সুভাষ। বললে, 'মা, দেখ শ্রীরামকৃষ্ণের কী অপূর্ব ত্যাগ! খড়্গহস্তা আনন্দময়ী কালীকে সব দিচ্ছেন আর বলছেন—' বইয়ের সে জায়গাটা বার করলঃ 'মা, এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি—' মুখ তুলল সুভাষঃ 'জানো মা, করালবদনা কালী অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সমস্ত গ্রাস করতে চায়, সমস্ত গ্রাস না করে সে ছাড়বে না আর রামকৃষ্ণেরও সমস্ত না দিয়ে দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। কিন্তু মা, জানো, রামকৃষ্ণ সব দিল কিন্তু একটা জিনিস—সত্য দিতে পারল না।'

প্রভাবতী বললেন, 'সত্য দেবেন কী করে? সত্যই তো মা কালী।'

'হ্যাঁ মা, বিবেকানন্দেরও সেই কথা। স্বয়ং ঈশ্বরই সত্য। জীবনে মহত্তের আর বৃহত্তের শেষ সীমাই ঈশ্বর। আর একমাত্র মানুষই ঈশ্বর হতে পারে। মানুষই ঈশ্বরের প্রতিভাস।'

ঘরের বাইরে থেকে জানকীনাথ ডাকলেন : 'সুবি!'

সুভাষ উঠে পড়ল। অনেক সাহস সঞ্চয় করে কাছে গিয়ে ধপ করে প্রণাম করে বসল।

জানকীনাথ থমকে গেলেন। 'এ আবার কী!'

মৃদু হেসে প্রভাবতী বললেন, 'ওকে কোন সাধু বলে দিয়েছে নিত্য প্রভাতে বাবা-মাকে প্রণাম করবে।'

জানকীনাথ ছেলের দিকে তাকালেন। সুভাষ লজ্জিত মুখে একপাশে সরে দাঁড়াল।

'বাপ-মায়ের উপর ভক্তি তো ভালো, কিন্তু' জানকীনাথের স্বরে ঈষৎ অসন্তোষ ফুটল : 'হঠাৎ সাধুসন্ধানে মন কেন?'

সুভাষ বিনীত ভঙ্গিতে চুপ করে রইল।

'জিজ্ঞেস করি পড়ার বইয়ে ভক্তি কেমন?' জানকীনাথ স্পষ্টতর হলেন : 'কেমন হচ্ছে পড়াশুনো?'

'ভালোই হচ্ছে।'

'সামনেই তো ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা, কী রকম বুঝছ? কে ফার্স্ট হবে? তুমি না চারু?'

সুভাষের উত্তর দেবার আগেই বাইরে থেকে কে ডেকে উঠল : সুভাষ!

এ কণ্ঠস্বর এ বাড়ির সকলের পরিচিত। প্রভাবতী বলে উঠলেন : 'এ যে চারুর গলা। এস এস চারু।'

চারু ঘরে ঢুকতেই জানকীনাথ প্রসন্নমনে বলে উঠলেন : 'আরে নাম করতেই যে চারু এসে উপস্থিত। কী ব্যাপার?'

চারু বললে, 'কৃষ্ণনগর থেকে হেড মাস্টারমশাই একটি ছেলের হাত দিয়ে সুভাষকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।'

'কে, বেণীমাধববাবু? কী লিখেছেন?'

সুভাষ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে কপালে ঠেকাল। পড়ল চিঠি। পড়া সাঙ্গ করে বললে, 'মাস্টারমশাই লিখেছেন তাঁর স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে হেমন্তকুমার সরকার চেঞ্জের জন্যে কটক যাচ্ছে। পুরীর সমুদ্রের ধারে তার জন্যে যেন কোথাও একটা জায়গা ঠিক করে দিই। আরো লিখেছেন এক মিনিট আলাপ করলেই বুঝতে পারবে ছেলেটির চরিত্র।' বলেই চারুর প্রতি উৎসুক হল সুভাষ: 'কই হেমন্ত কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে উঠেছে।' চারু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'চলো দেখা করে আসবে।'

'আমি এখুনি আসছি বাবা। মা, আমি ফিরে এসে তোমায় কথামৃত শোনাব।' বলে সুভাষ বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

কথামৃতই বটে! এমন কথা কে কবে বলেছে! এত সহজ করে এত হৃদয়হরণ করে।

সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলছেন, 'এই রকম আছে যে সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে রাখলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়।

নিবৃত্তিই ভালো, প্রবৃত্তি ভালো নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বললাম, তা আমি পারব না। আমি তো চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছে হয় আর কারুকে দাও।

বদ্ধজীব হরিনাম শুনতে চায় না, বলে হরিনাম মরবার দিন হবে। এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলেমেয়েদের বলে, প্রদীপে অত সলতে কেন? একটি সলতে দাও, তেল কম পুড়বে।'

কত দিক দিয়ে কত রকমের কথা।

মণিলাল মল্লিক আর ভবনাথ একজিবিশনের কথা বলছিল। বলছিল, কত রাজারা কত বহুমূল্য জিনিস পাঠিয়েছে, সোনার খাট সোনার টেবিল-চেয়ার—সে সব একটা দেখবার জিনিস—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ হয়। ঐ সব সোনার জিনিস, রাজারাজড়ার জিনিস দেখে সব ছ্যা হয়ে যায়। সেটাও অনেক লাভ। কলকাতায় আমি যখন আসতাম হৃদে আমাকে লাটসাহেবের বাড়ি দেখাত—মামা, ঐ দেখ লাটসাহেবের বাড়ি, বড় বড় থাম! মা দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির ইঁট উঁচু করে সাজানো।'

আর কর্ম করার কথা কী সুন্দর বুঝিয়েছেন।

'পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বরদর্শন হয় না। কর্ম চাই, ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো-সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। তাঁর জন্যে একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্যে অমুক পাগল হয়ে গেছে।'

চারু সুভাষকে নিয়ে এল তার বাড়িতে।

বাইরের ঘরে একটি শ্যামবর্ণ দীর্ঘায়ত দীপ্তচক্ষু কিশোর বসে আছে। পরিচয় করিয়ে দিতে হল না, যেন কত দিনের চেনা মানুষ, এমনি উত্তপ্ত সৌহার্দ্যে তার হাত ধরল সুভাষ।

'তুমিই হেমন্ত সরকার?'

'আর তুমিই মাস্টারমশায়ের সুভাষচন্দ্র?'

'আমাদের বাড়ি ওঠ নি কেন?'

হেমন্ত আতঙ্কিত হবার ভাব করলে: 'ওরে বাবাঃ, তোমাদের হচ্ছে বড়লোকের বাড়ি, সেখানে আমার মত গরিব কি উঠতে পারে?'

'বড়লোকের ঘরে জন্মেছি সেটা কি আমার অপরাধ?' সুভাষের চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল: 'আমি কি বড়লোক?'

হেমন্ত একেবারে সুভাষের কাঁধের উপর হাত রাখল। বললে, 'না, না, তুমি বড়লোক হতে যাবে কেন? তুমি বড় মানুষ। কত বড় তোমার বুক, বুকের পাটা—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, অনেক পরামর্শ।'

সে যে কী কথা হেমন্তর চোখের দিকে চেয়েই যেন সুভাষ টের পেল। বললে, 'তোমার পুরীর বাসা আগে ঠিক হোক।'

'সে হয়ে যাবে ঠিক, তার জন্যে ভাবি না।' হেমন্তর কণ্ঠ তপ্ততর হল: 'কিন্তু এ এমন কথা যার আর তর সয় না।'

'শুধু কথা?' সুভাষ একটু হাসল।

'না, না, কাজ। কাজের জন্যেই কথা।'

আট

কাঠজুড়ি নদীর বাঁধের উপর সুভাষ আর হেমন্ত বেড়াচ্ছে।

হেমন্ত বললে, 'এস বসি। কথাটা গোপনীয়।'

নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে বসল। হেমন্ত বললে, 'বিপ্লবের পথ ছাড়া দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। তোমার কী মত?'

'এ আবার গোপনীয় কী! এ তো জাজ্বল্যমান সত্য।' সুভাষ তার উপলব্ধিতে গম্ভীর হল: 'আমারও সেই মত। স্বাধীনতা কেউ দেয় না, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়।'

হেমন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল: 'আর তা গায়ের জোরে।'

'নিশ্চয়ই। শারীরিক দৌর্বল্যই আমাদের সকল অনিষ্টের মূল। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলছেন, গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো। অনিষ্টের মূল কারণ, আর কিছু নয়, আমরা দুর্বল আমাদের শরীর দুর্বল মন দুর্বল আত্মবিশ্বাস দুর্বল।'

'গায়ের জোরে মানে কিন্তু অস্ত্রের জোরে।'

'নিশ্চয়ই। গায়ে জোর না থাকলে তুমি অস্ত্র ছুঁড়বে কী করে. কী করে সমস্ত বিপদ-বাধা তুচ্ছ করবে, মৃত্যুর মুখে বীরদর্পে দাঁড়াবে? বেদান্তে বিশ্বাসী হবে? ভাবতে পারবে তুমি অচ্ছেদ্য অদাহ্য সর্বপ্রকার বিকারশূন্য?'

হেমন্ত সুভাষের হাত চেপে ধরল। নিম্ন গাঢ়স্বরে বললে, 'তুমি আমাদের গুপ্ত সমিতিতে আসবে?'

'কী হয় তোমাদের সমিতিতে?'

'অনেক কিছু হয়।' হেমন্তর স্বর গাঢ়তর হল: 'রিভলভার প্র্যাকটিস হয়। তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে?'

'দেব।' এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল সুভাষ। পরে স্বচ্ছ বাস্তববুদ্ধিতে বললে, 'কিন্তু আগে পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

হেমন্ত সায় দিল : 'নিশ্চয়ই। পরীক্ষার পরেই তো আসবে।'

সুভাষ বললে, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না বিপ্লবী হবার আগে মানুষ হওয়া দরকার। ত্যাগী, পরোপকারী, আদর্শনিষ্ঠ—'

'একশোবার।' হেমন্ত জ্বলে উঠল : 'ভাবো তো এ সব বীর বঙ্গ সন্তানদের কথা—কী তাদের ত্যাগ, তাদের দেশপ্রেম, পরের জন্যে আমাদের সকলের জন্যে, স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেল—ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন বোস, প্রফুল্ল চাকী—'

আরেকটি নাম সুভাষ যোগ করে দিল : 'অরবিন্দ।'

'হ্যাঁ, সবার আগে অরবিন্দ।' হেমন্ত সমস্ত ধমনীতে চঞ্চল হয়ে উঠল : 'বলো এদের আরব্ধ ব্রত কি আমরা সাঙ্গ করব না? সিদ্ধ করব না?'

সবার আগে অববিন্দ।

অরবিন্দ শুধু বিপ্লবী ভাবের নয়, বিপ্লবী কর্মেরও প্রবর্তক। বঙ্গ-ভঙ্গের পর বলেছিল এ মহত্তম আশীর্বাদ কেননা এই বেদনা এই লাঞ্ছনাই দেশমুক্তিকে এগিয়ে আনবে, সৃষ্টি করবে মহাবিপ্লব, মহাজাগরণ। সমস্ত মায়া ও মরীচিকাকে এক নিমেষে উড়িয়ে নেবে। দেশ চিনতে পারবে তার নিজের স্বরূপ।

অরবিন্দ তখন বরোদায়, গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিবেদিতা গাইকোয়াড়ের নিমন্ত্রণে বরোদায় আসছে। স্টেশনে আরো অনেক রাজকর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও গিয়েছে। একটা বড় গাড়ি করে শহরে ঢুকছে, মিনারগম্বুজওয়ালা কলেজ দেখে নিবেদিতা বললে, 'একটা কদর্য স্তূপ', অথচ ভারতীয় রীতিতে তৈরি ছোট একটা গৃহস্থ-কুটির দেখে বললে, 'আহা কী সুন্দর!'

একজন হোমরাচোমরা রাজকর্মচারী অরবিন্দের কানে-কানে বললে, 'উনি পাগল নাকি?'

অরবিন্দ-নিবেদিতায় যখন প্রথম সাক্ষাৎ হল, দুজনই পরস্পরকে চিনল। চিনল, তারা একই মহৎ শিল্পের দুই কারিগর।

'সেই মহৎ শিল্প বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবের মন্ত্র বন্দেমাতরম্।

'কলকাতা আপনাকে চায়।' অরবিন্দকে বললে নিবেদিতা, 'বাংলাই আপনার উপযুক্ত জায়গা।'

অরবিন্দ বললে, 'না। আমার জায়গা পশ্চাতে, নেপথ্যে। আমার কাজ মানুষ তৈরি করা।'

'আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।' নিবেদিতা সরল বন্ধুতায় তার পবিত্র হাতখানি অরবিন্দের দিকে প্রসারিত করে দিল: 'আমি আপনার দলের মানুষ। আপনার সহকর্মী।'

অরবিন্দই গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষা দিল বারীন্দ্রকে, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামীকে, হেমচন্দ্র কানুনগোকে। হেমচন্দ্র বলছে, 'সেদিন সন্ধেবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হল। আমি তলোয়ার ও গীতা হাতে নিলাম। অরবিন্দ-রচিত সংস্কৃত মন্ত্র বা সত্যপাঠ পড়বার হুকুম হল। সংস্কৃত লেখাটি না পড়ে, আমি যা বলেছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তা হচ্ছে, ভারতের অধীনতা মোচনের জন্যে সব করব। অরবিন্দ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে যা বলেছিলাম তাতে বুঝি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমায় সংস্কৃত মন্ত্র পড়বার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন—'

অরবিন্দই হেমচন্দ্র আর বারীনকে পাঠিয়েছিল ফুলারকে মারতে।

ব্যারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুটি যুবক দেখা করতে এসেছিল রাত্রে। তোমরা কে? যুবক দুটি উত্তর দিল, আমরা ফুলারকে গুলি করতে চলেছি। সুরেন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। বললেন, তাকে মেরে লাভ কী? সে তো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। একটা মরা লোককে মেরে কী হবে?

স্ত্রীকে চিঠি লিখছে অরবিন্দ: 'প্রিয়তমা মৃণালিনী, অন্য লোকে

স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলে জানে। আমি স্বদেশকে মা বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসে যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তা হলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করতে বসে, না, মাকে উদ্ধার করতে ছুটে যায়?'

বগলা মূর্তির পূজা করল অরবিন্দ। শত্রুনিধনমানসেই বগলা পূজা।

সুধাসাগরমধ্যে মণিময় মণ্ডপ, তার মাঝে রত্ন নির্মিত বেদী, তার উপরে সিংহাসন। তার উপরে বসে আছে বগলামুখী। এর বর্ণ পীত, আভরণ পীত, গলার মালাও পীত। এক হাতে মুদ্গর, অন্য হাতে শত্রুর জিভ। বাঁ হাতে শত্রুর জিভ টেনে ধরে ডান হাতে গদার আঘাতে শত্রুকে প্রহার করছে।

কে অরবিন্দের শত্রু? তার দেশের যে শত্রু সেই তার শত্রু। তার দেশের শত্রু কে? তাও কি বলে দিতে হবে? না বললে হৃদয়ঙ্গম হয় না?

শত্রু ঐ সেই রাক্ষস, ইংরেজ, যে শোষণ করে শাসন করছে।

তারপর অরবিন্দ 'ভবানী-মন্দির' লেখে। মর্মকথা আর কিছুই নয়, বিপ্লবের ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে মা ভবানীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেই আত্মসমর্পণই চরম দীক্ষা। মায়ের কাছে শরণ নিলেই আর মৃত্যুভয় থাকবে না। মৃত্যুভয়কে পর্যুদস্ত করে দেবার জন্যেই ভবানীমন্ত্র।

এই মন্ত্রের আদি উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র। সে মন্ত্র, আমি আমার মাকে বন্দনা করি। বন্দেমাতরম। 'আমি অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি, আর কী যমের ভয় করেছি।'

বঙ্কিমের মন্ত্রকেই অরবিন্দ মূর্তি দিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'মাতা কে?'

উত্তর না করে ভবানন্দ গাইতে লাগল :

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম
সুখদাং বরদাং মাতরম ॥

মহেন্দ্র বললে, 'এ তো দেশ, এ তো মা নয়।'

ভবানন্দ বললেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বন্ধু নেই স্ত্রী নেই পুত্র নেই ঘর নেই বাড়ি নেই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়সমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা—'

তখন বুঝে মহেন্দ্র বললেন, 'তবে আবার গাও।'

ভবানন্দ গাইল।

মহেন্দ্র দেখল দস্যু গাইতে গাইতে কাঁদছে। মহেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা?'

'আমরা সন্তান।'

'সন্তান কি? কার সন্তান?'

'মায়ের সন্তান।'

'ভালো—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করে মায়ের পুজো করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?'

'আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।'

'এই তো গাড়ি লুটলে।'

'সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুটলাম?'

মহেন্দ্র অবাক হবার ভাব করল। বললে, 'কেন, রাজার টাকা লুটলে?'

'রাজার টাকা! এই টাকাগুলো যে রাজা নেবে তার কী অধিকার?'

'রাজার রাজভোগ।'

ভবানন্দ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'যে রাজা রাজ্য পালন করে না সে রাজা কী।'

মহেন্দ্র সেপাইয়ের ভয় দেখাল। ভবানন্দ গ্রাহ্য করলেন না, সেপাইয়ের তোপের মুখে পড়তে তাঁর ভয় নেই। বললেন, 'একবার বই তো আর দুবার মরব না। কিন্তু ওদের না তাড়িয়ে মরতেও সাধ নেই।'

'কিন্তু ওদের তাড়াবে কেমন করে?'

'মেরে।'

'তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?'

দস্যু-সন্ন্যাসী আবার গান ধরল:

'সপ্তকোটীকণ্ঠকলকল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুর্জৈধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।'

এই বন্দেমাতরম মন্ত্রই সমস্ত আন্দোলনের নান্দীপাঠ। সর্বাসুরবিনাশা সর্বদানবঘাতিনী অনেকশস্ত্রহস্তা মাকে প্রণাম করি।

এই বন্দেমাতবম মুখে নিয়েই তো বিপ্লবীরা ফাঁসিকাঠে উঠেছে, এই মন্ত্রের জোরেই সহ্য করেছে সমস্ত নির্যাতন। এই মন্ত্রই অন্ধের আলো, মৃতের প্রাণ, জড়ের চৈতন্য। শত্রুর উৎপাটন।

ববিশাল কনফারেন্সের কথা ভাবো। অশ্বিনী দত্তের বরিশাল। অরবিন্দ বললে, আমি সেই পুণ্য পীঠস্থলে এসেছি যেখানে অশ্বিনীকুমারের জন্ম ও কর্মযোগের আয়োজন।

সম্মিলনের দুই শাখা, রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক। রাজনৈতিক শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, সাহিত্যিক শাখার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ।

প্রকাশ্য স্থানে বন্দেমাতরম উচ্চারণ করা যাবে না এই মর্মে ফুলার সার্কুলার জারি করেছে। আর, তারও চেয়ে নির্মম, জেলা-

ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন ফতোয়া দিয়েছে কলকাতা থেকে যে সমস্ত নেতা এসেছে তাদের অভ্যর্থনা করবার সময়ও বলা যাবে না ঐ মন্ত্র।

এ কী অপমানকর প্রস্তাব! সুরেন্দ্রনাথ বললে, 'অভ্যর্থনার সময় নাই বা হল, পরে দেখা যাবে।'

নেতারা নামল স্টিমার থেকে। অরবিন্দও নামল।

রসুলের গাড়ি আগে চলল, পিছনে আর সকলের। পদব্রজে আপামর সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী। দু ধারে কাতার-দেওয়া লাঠিয়াল পুলিস—একটি মাত্র উচ্চারণকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

কিন্তু কার সাধ্য সেই ধ্বনিকে বিধ্বস্ত করে। শ্রুতে রুদ্ধ করলেও অশ্রুতে সে ধ্বনি তরঙ্গিত হবে অন্তরীক্ষে, সন্তানের অন্তরে অন্তরে। বাণী হয়ে বেঁচে থাকবে। ধ্বনি মরলেও বাণী মরে না।

বন্দেমাতরম। শোভাযাত্রার শেষের দিক থেকে উঠল আনন্দ-ধ্বনি।

সঙ্গে সঙ্গে এলোপাথাড়ি লাঠি পড়ল। বহু লোকের মাথা ফাটল, রক্তে লাল হয়ে গেল রাজপথ।

পুলিস-সুপার কেম্পকে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'আর চালাকি করবেন না, আপনাকে আমি য়্যারেস্ট করলাম।'

ম্যাজিস্ট্রেট তার বাড়িতে বসেই তক্ষুনি সরাসরি বিচারে সুরেন্দ্রনাথকে দুশো টাকা জরিমানা করলে। জরিমানার টাকা তক্ষুনি যোগাড় করে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ চলে এল সভাস্থলে।

বন্দেমাতরম।

এই তো প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ।• একটা নিরুপদ্রব শান্ত জনতা একটা নির্দোষ স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে আর তারই জন্যে ইংরেজের পুলিস লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরাচ্ছে অথচ প্রত্যুত্তরে কেউ প্রতিহিংসায় দুর্মদ হয়ে উঠছে না, ছাড়ছেও না তার মুখের মন্ত্র—এ দৃশ্য দুই চোখ বিস্ময়ে বিশাল করে দেখবার মত দৃশ্য।

অরবিন্দ দেখল।

সবচেয়ে বেশি করে দেখল চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে। বিজয়কৃষ্ণ-শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছেলে। পুলিস সার্জেণ্ট যত তাকে লাঠি মারে তত সে বন্দেমাতরম বলে। যতবার লাঠি ততবার বন্দেমাতরম। আবার লাঠি আবার বন্দেমাতরম।

শেষে কী হল? রাস্তার আশে-পাশে ছাদে-বারান্দায় জানলায়-দরজায় বন্দেমাতরম, বালক-বালিকার মুখেও বন্দেমাতরম। দাঁড়ের পাখিও বুঝি এতক্ষণে শিখে নিল বন্দেমাতরম।

পুলিস মারতে-মারতে চিত্তরঞ্জনকে একটা বড় পুকুরে, হাভেলি দিঘিতে, ফেলে দিল। পুকুরে পড়েও চিত্তরঞ্জন বলছে, বন্দেমাতরম। লাঠি-হাতে পুলিসও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুকুরের জল রক্তে লাল হয়ে গেলেও চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম ছাড়ল না। যদি এখন শেষ নিশ্বাসও পড়ে সেই নিশ্বাসের সঙ্গেও ধ্বনিত হবে বন্দেমাতরম।

খবর পেয়ে অশ্বিনী দত্ত ছুটে এল আর তার পদশব্দ শুনেই পালিয়ে গেল পুলিস।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় চিত্তরঞ্জনকে সভাস্থলে আনা হল। সমগ্র সভা একটি একক কণ্ঠে নিনাদিত হয়ে উঠল, বন্দেমাতরম।

বিগাঢ় ধ্যানীর চোখে দেখল অরবিন্দ। এও কি তার বাসুদেব দর্শন নয়?

বন্দেমাতরম তো দুর্গার স্তুতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনকে বললে, হে মহাবাহু, শত্রুজয়ের জন্যে তুমি শুচি হয়ে দুর্গাস্তোত্র পাঠ করো। অর্জুন রথ থেকে নেমে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তোত্র পাঠ করল:

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্যে মন্দরবাসিনি!
কুমারী কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে!

বিপ্লবের ছবি দেখল অরবিন্দ। শত্রু-নিসূদনের ছবি। শত্রুর উৎসাদন ছাড়া প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব। ধূলিজালকে কর্দমে পরিণত না করলে জল দাঁড়াবে কোথায়?

জয় হোক জয় হোক হরের, যিনি বিষধরকে বলয় করেছেন, চন্দ্রকে তিলক করেছেন যিনি ভুবনের মূল, যিনি বৃষে ভ্রমণ করেন, যিনি ত্রিশূল-ডমরু ধরেন, যিনি কটাক্ষে মদন দহন করেন, যাঁর শিরে গঙ্গা অর্ধাঙ্গ গৌরী।

জয় হোক জয় হোক হরির, যিনি ভুজদ্বয়ে গিরি ধরেন, যিনি দশানন ও কংসকে বিনাশ করেন, যিনি অসুরকে বিলোপ করেন, যিনি মুনিজনের মানসসরোবরের হংস, যার বাণী মধুর, বাঁশি মধুর।

কিন্তু এখন আর বাঁশি নয়, এখন অসি। এখন 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি।' এখন আর বৃন্দাবনের বাঁশি-বাজানো কৃষ্ণ নয়, কুরুক্ষেত্রের গীতারূপ সিংহনাদকারী কৃষ্ণ।

পুলিস বরিশাল কনফারেন্স ভেঙে দিল। সমস্ত নেতা ফিরে চলল কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথও।

তাঁর অভিভাষণ দেওয়া হল না।

কিন্তু অরবিন্দের কাছে সে যেন কিছু 'হল না' নয়, সে যেন কিছু একটা 'হল'। যেন অর্জুনের গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা হল। দেশকণ্টক ইংরেজকে উন্মুলিত করার জন্যে তরবারে শান পড়ল।

'বরিশাল হল পুণ্যে বিশাল লাঠির ঘায়ে।' উজ্জ্বল চোখে কোনো বিপ্লবী মরণপণ প্রতিজ্ঞা করলেই অরবিন্দ বলত: দেখ দেখ ওর বরিশাল চোখ!

উল্লাসকর দত্তও তাই বলে। বরিশাল কনফারেন্সে পুলিসের অকথ্য অত্যাচার থেকেই আমার বিপ্লব সাধনা। হেমকানুনগোরও সেই কথা। বিপ্লব কী আগে ভালো বুঝতাম না, বরিশালের পর মাথাটা ঠাণ্ডা হল। আর রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধলেন:

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে।

'হ্যাঁ, বাঙলায় যে বিক্ষোভের বারুদ জমেছিল অরবিন্দই তাকে বিপ্লবের মন্ত্রবহ্নি সঞ্চার করে দিল।' বললে হেমন্ত, 'তাই বলছিলাম সবার আগে অরবিন্দ।'

'কিন্তু তারো আগে একজন আছে।' স্মিতমুখে সুভাষ বললে।

'আরো একজন? কে?'

'স্বামী বিবেকানন্দ।'

কী বলছেন স্বামীজি? এবং কবে বলছেন?

বলছেন: 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। যুবকগণ, ওঠো, জাগো, শুভ মুহূর্ত এসে পৌঁছেছে। সাহস অবলম্বন করো, ভয় পেও না। ওঠো জাগো, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে ধনবল আছে, কিন্তু আমার বাংলাতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রকাশিত করতে হবে। লোকে বলে বাঙালি জাতির কল্পনাশক্তি প্রখর। আমি তা বিশ্বাস করি। আমাদের লোকে ভাবুক জাতি বলে উপহাস করে থাকে। কিন্তু তোমাদের বলছি এ উপহাসের বিষয় নয়, কারণ হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি খুব ভালো জিনিস হতে পারে, কিন্তু তা বেশিদূর যেতে পারে না। ভাবের মধ্যে দিয়েই গভীরতম রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। অতএব, বাঙালিদ্বারাই—ভাবুক বাঙালিদ্বারাই এ কার্য সাধিত হবে।'

এ উক্তি করা হয়, ১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি।

সুভাষের জন্মের এক মাস পাঁচ দিন পরে। সুভাষের জন্ম ১৮৯৭-র ২৩শে জানুয়ারি।

আরো অনেক বলেছেন স্বামীজি। বলছেন, 'এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্—' এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে

বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'

আবার বলছেন: 'শত্রুগণকে বীর্য প্রকাশ করে শাসন করতে হবে, এ গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থকে ঘরের এক কোণে বসে কাঁদলে আর অহিংসা পরমো ধর্মঃ বলে বাজে বকলে চলবে না। যদি তিনি শত্রুদের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করেন তা হলে তাঁর কর্তব্যের অবহেলা করা হয়।'

স্বামীজি যখন ঢাকা সফরে যান, সেটা ১৯০১ সাল, তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক যুবকের সমাবেশ হত। তার মধ্যে থাকত ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেম ঘোষ আর তার সহযোগী শ্রীশ পাল। স্বামীজি বিপ্লবীদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্বোধন করেন, আর বলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈকে আদর্শ করো। 'মেরি ঝাঁসি নেহি দেউঙ্গি।' যে নাগপাশে বিদেশী ভারতকে বেঁধে রেখেছে তা ছিন্ন করো। দেশ-ভক্তি ও সন্তানধর্মকে মাথায় করে রাখো।

শ্রীশ পালকে জানো?

কে?

পুলিস ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জিকে যে কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে গুলি করে মারে।

তবেই দেখ সবার আগে স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দই বিপ্লবীর বিপ্লবী—মহাবিপ্লবী।

নয়

'দেয়ালে এসব কাদের ছবি টাঙিয়েছিস রে সুবি?' সম্পর্কে মামা একজন শাঁসালো পুলিশ-অফিসর সুভাষকে জিজ্ঞেস করলে।

'ছবিগুলো দেখে চেনা যাচ্ছে না?' সুভাষ বললে স্বচ্ছমুখে, 'একটু কাছে গিয়ে দেখুন।'

'কাছে যাবার সাহস নেই। যদি মাথার খুলিটা উড়ে যায়।' মাথায় একবার হাত বুলালো অফিসর।

'এরা তো কেউ নেই সশরীরে।' ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তবু সুভাষ বললে, 'ক্ষুদিরাম কানাইলাল আর সত্যেন এই তিনজনের তো ফাঁসিই হয়ে গেছে, আর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে প্রথম শহীদ হলেন—'

'সবাই সমান, মরেও মরতে চায় না—কিন্তু তোমার পড়ার ঘরের দেয়ালে এসব কেন?'

সুভাষ যেন অন্য চিন্তায় বিভোর, প্রশ্নটা মাথায় ঢুকল না। বললে, 'প্রফুল্ল চাকীর সে প্রশ্নটা কী মর্মান্তিক!'

'কোন প্রশ্ন?'

'যেটা নন্দলাল ব্যানার্জিকে করেছিল—আপনি বাঙালি হয়ে বাঙালিকে ধরবেন?'

নন্দলাল! নামটা শুনে অফিসার আত্মীয়ের অস্বস্তিকর ভাব হল। ধমকের সুরে বললে, 'সে কি, নন্দলাল তার কর্তব্য করবে না? তুমি তোমার কর্তব্য করবে না?'

'নিশ্চয় করব।'

'তোমার কর্তব্য কী?'

'আমার কর্তব্য ভালো করে পড়ে ভালো ভাবে পরীক্ষা পাস করা।'

'তবে এসব রাজনীতিতে মন দিয়েছ কেন?'

এক পাশে অরবিন্দের ছবি, তার দিকে তাকাল সুভাষ। এই তো সেই মহামানব যিনি বললেন, ঈশ্বর আর জাতীয়তাবাদ এক বস্তু। নতুন ভগবদ্‌গীতা প্রচার করলেন—জাতীয়তাবাদই ধর্ম।

আর ও প্রান্তের ছবি স্বামী বিবেকানন্দের।

'এঁকেও রেখেছ দেখছি।' অফিসর-আত্মীয় বুঝি চমকে উঠল।

'ইনি তো সন্ন্যাসী।' সুভাষ সবিনয়ে বললে।

'সন্ন্যাসী! ইনি বিপ্লবীর রাজা। যাকে ধরি তারই সুটকেসে বিবেকানন্দ। কিন্তু এ সব ভালো নয়। এ সব তুলে ফেল। তোমার বাবা কোথায়?' আত্মীয়-অফিসর জানকীনাথকে বলতে গেল।

দেয়ালের কাছে সরে এসে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল আবার ছবিগুলি।

আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হল। রাজসাক্ষীর কাজ কী? রাজসাক্ষীর কাজ আদালতে দাঁড়িয়ে দলের সমস্ত ফাঁস করে দেওয়া আর সেই কৃতঘ্নতার মূল্যে সরকারের কাছ থেকে নিজের মুক্তি কিনে নেওয়া। যারা এক দলের মানুষ, এক পথের সহযাত্রী, তাদের কাছে এর চেয়ে জঘন্যতর আচরণ আর কী হতে পারে? তখন একটা ইংরেজ মারার চেয়ে এই স্বদেশী কুলাঙ্গারকে মারা বেশি আনন্দের।

কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মামলার দুই আসামী, ঠিক করল নরেন গোঁসাইকে সাবাড় করে দিতে হবে।

জেলের মধ্যে হত্যাকাণ্ড! তার জন্যে নিখুঁত নিশ্ছিদ্র ষড়যন্ত্র। এ পরিকল্পনা শুধু বাঙালির মস্তিষ্কে, এর রূপায়ন শুধু বাঙালির মণিবন্ধে।

খাবারের হাঁড়ির মধ্যে করে বাইরে থেকে দু-দুটো রিভলভার আনা হল। একটা নিল সত্যেন, আরেকটা কানাই। চন্দননগরের কানাই, মেদিনীপুরের সত্যেন।

সত্যেন তার রিভলভারটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল কোমরে। যেন ধস্তাধস্তি হলেও কেউ সহজে সেটা তার থেকে কেড়ে নিতে না পারে। আর কানাই? তার মনোভাব উদাসীন। থাক না ওটা পকেটে। কেউ কেড়ে নিতে পারে তো নিক। কিন্তু তার আগে শেষ গুলিটি পর্যন্ত নরেন গোঁসাইয়ের উপর খরচ হয়ে গেছে জানবে। ও কলঙ্ক যদি যায়, তারপর আমি যাব কি আমার রিভলভারটা যাবে তাতে কিছুই এসে যাবে না।

তখনও রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য চলছে কোর্টে। সত্যেন ধুয়ো তুলল, আমিও রাজসাক্ষী হব। সেই কারণে নরেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ দরকার।

পুলিস টোপ গিলল। নরেনকে আগেই আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়েছিল জেল-হাসপাতালের দোতালায়, দুজন ইউরেশিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডারের রক্ষণাবেক্ষণে। সত্যেন যদি ভাব জমাতে চায়, আসুক না। আরেকজন রাজসাক্ষী পাওয়া গেলে তো সরকারের পোয়া বারো।

কিন্তু কানাই, কানাইলাল কী করবে? তার কী কৌশল? কী সাধনা?

তার শবসাধনা।

সে রিভলভারটা পকেটে নিয়ে একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে রইল।

'তোমার কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওয়ার্ডার।

'বিরক্ত করো না।' কানাই বললে, 'শবসাধনায় নিযুক্ত আছি।'

শবসাধনা কঠিনতম সাধনা এমনি যন্ত্রণাকাতর মুখ নিয়ে কানাই উঠে বসল।

'তোমার কী হয়েছে?'

'পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। শিগগির ডাক্তারবাবুকে ডাকো। নয়তো হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

কানাই সাধনায় সিদ্ধ হল। চলে এল হাসপাতাল।

উনিশো আট সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। সকালবেলা সত্যেন এসেছে নরেনের সঙ্গে ভাব জমাতে। হাসপাতালের দোতালায় সিঁড়ির পাশে ডিসপেনসারিতে মুখোমুখি বসেছে দুজন। দু-চারটে কথা হতে না হতেই সত্যেন তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেটের ভিতর থেকেই তাক করে গুলি ছুঁড়ল। একটা শব্দ হল শুধু, কার্তুজ আগুন ছাড়ল না। না, পকেটের ভিতর থেকে নয়, খোলা হাতে রিভলভার বার করে আনলে সত্যেন, নরেনকে সোজাসুজি তাক করলে। গুলি নরেনের উরু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ইউরেশিয়ান ওয়ার্ডারদের একজন, নাম হিগেনবোথাম, সত্যেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রিভলভার ধরে টানাটানি করতে লাগল। লাভের মধ্যে হল এই, রিভলভারের বাঁটের ঘায়ে তার কব্জি ভেঙে গেল। কব্জি ভেঙে যেতেই সে ছেড়ে দিল সত্যেনকে।

এই ফাঁকে নরেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে সোজা ছুট দিল। দাঁত মাজার ভান করে কানাই ডিসপেনসারির সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল, এবার সে ছুটন্ত নরেনের পিছু নিলে। তার গুলি নরেনের শিরদাঁড়া ভেদ করে বুকে গিয়ে বসল। দু-পাশে দেয়াল এমনি একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল নরেন। দু-এক পা যেতে না যেতেই পড়ে গেল মাটিতে।

সত্যেন ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, কেউ কোথাও নেই। হাতে রিভলভার, সামনে একটা কয়েদীকে জিজ্ঞেস করলে, নরেন কোথায়?

কয়েদী ইশারা করে দেখিয়ে দিল পাশের গলিতে।

গলিতে ঢুকে দেখল কানাই তার শেষ গুলিটিও খরচ করে সমস্ত

নিঃসংশয় করে দিয়েছে। নরেন গোঁসাই মৃত। বিশ্বাসঘাতকতার পাপ আপন রক্তে ধুয়ে যাচ্ছে।

আর কানাই দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই ঘটে নি। কিংবা এ যেন হামেসাই ঘটছে। এ আবার এমন কী নতুন! যেন আত্মবান পুরুষ নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাসক্ত, সমস্ত রাগদ্বেষ-বিমুক্ত। ধরতে হয় ধরো, মারতে হয় মারো, কত বড় আনন্দের মুহূর্ত আস্বাদ করছি নীরবে।

তারপর হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, পাগলা ঘন্টি, ভোম্বা, ছুটোছুটি, লুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হল সত্যেন, গ্রেপ্তার হল কানাই। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তালাবন্ধ হল। শুরু হল মারধোর, শুরু হল খানাতল্লাসি।

আর কিসে কী হবে! সত্যেন মাথা, কানাই ডান হাত, যে বলবতী আশালতা রোপণ করেছিলাম তা ফলবতী হয়েছে—আর কী চাই। সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে গেল, বাঙালি বিপ্লববাদ বৈফল্যের পঙ্ককুণ্ডে সাফল্যের শতদল ফুটিয়েছে।

কানাই আর সত্যেন দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হল।

সত্যেন ব্রাহ্ম। একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী এল তাকে আশীর্বাদ করতে। কাছে বসিয়ে বললে, ভগবানে আত্মসমর্পণ করে থাকো। বিরাটের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছ মনে এমনি একটি সুস্থির প্রশান্তি আনো। পার্থিব চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও।

শিবনাথ ফিরে এলে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। বলুন কী হল, কেমন দেখলেন।

শিবনাথ বললে আশীর্বাদ করে এসেছেন সত্যেনকে।

'সে কী, শুধু সত্যেনকে? কানাইকে আশীর্বাদ করেন নি?'

'কানাইকে দেখলাম পায়চারি করছে। যেন খাঁচায় পোরা সিংহ। বহুযুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।'

কখনো বা সে যতচিত্ত যোগীর মত অচঞ্চল, যেন নির্বাত প্রদেশে স্থিত দীপশিখা। যেন পরমসুখকর আত্মানন্দেই সে নিমগ্ন।

ফাঁসির আদেশ পাবার পর তার ওজন বেড়ে গেল প্রায় ষোল পাউণ্ড। অনির্বিঘ্ন চিত্তে ব্রহ্মসংস্পর্শসুখের এই ফলশ্রুতি।

ফাঁসির দিন ভোর চারটের সময় জেলর তার সেলে এল। এসে দেখল কানাই ঘুমুচ্ছে। ওঠো হে, সময় হল। কানাই তবুও নিদ্রাচ্ছন্ন। সে কী, ট্রেন যে সিটি দিয়েছে, সে ট্রেনে করে যাবে না আরেক ঘুমের দেশে?

ও, হ্যাঁ, চলুন। নিজে এতটুকু উদ্বিগ্ন হল না, অন্যকেও এতটুকু উদ্বিগ্ন করল না। নির্বিকল্প চিত্তে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল।

গলায় দড়িটা বুঝি ঠিক করে পরানো হয় নি। বললে সেই কথা। কে একজন সংশোধন করে দিল।

মৃত্যুর মঞ্চে শাশ্বত জীবনের জয়গান গেয়ে কানাই অপসৃত হল।

হে মৃত্যু, তোমার ভয়াল ভ্রূকুটিকে আমি ভয় করি না। যতক্ষণ তুমি আমাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেবে-ছিলাম তুমি আমার চেয়ে বড়, তুমিই আমার চরম, আমার নিয়ন্তা। এখন তোমার আঘাত পেয়ে বুঝলাম তুমি আমার চরমও নও নিয়ন্তাও নও। তুমি তো আঘাত করছ আমার জড়দেহকে কিন্তু আমার জড়দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা বসে আছেন তাকে তুমি স্পর্শও করতে পারছ না। অতএব আমিই তোমার চেয়ে বড়, তোমার ক্রান্তকারী। আমার একটা বুদ্বুদাকার ক্ষুদ্র জীবন তুমি নিলে কিন্তু আমার এই আকাশাকার মহাজীবন তুমি নেবে কী করে?

একটা ইংরেজ পুলিস সার্জেন্ট বারীন ঘোষকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে?'

দেখে এস গে কালীঘাটের শ্মশানে, কত যুবক কানাইয়ের চিতার উপর ফুল দিচ্ছে। শুনে এস গে বন্দেমাতরম কাকে বলে। বন্দেমাতরম কেমন করে বলতে হয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন :

'গোঁসাই হল গুলিখোর কানাই নিল ফাঁসি।
কোন চোখে বা কাঁদি বল কোন চোখে বা হাসি ॥'

কানাইয়ের ফাঁসি হল ১০ই নভেম্বর, সত্যেনের ফাঁসি হল তেরো দিন পর, তেইশে।

ফাঁসির পর আলিপুর জেলের বাইরের অপেক্ষমান জনতাকে এক ইংরেজ পুলিস-অফিসর বললে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, সব শেষ হয়ে গেছে। কানাই নির্ভীক, সত্যেন মনে হয় নির্ভীকতর। যখন আমি ওকে সেল থেকে ডেকে আনতে গেলাম, দেখলাম দুই চোখ মেলে সেলে বসে আছে। বললাম, সত্যেন, তৈরি হও। সত্যেন বললে, আমি তৈরি। বলে হেসে উঠে দাঁড়াল। যেন জানে যে কাণ্ডটা এখুনি ঘটবে সেটা একটা মজার কাণ্ড। নিজেই ধীর পায়ে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলল।'

তা হলে কথাটা কী দাঁড়াল ?

কথাটা দাঁড়াল এই : এগিয়ে চলো। মৃত্যু নেই। ভয়ের যে বিচিত্র চলচ্ছবি দেখছ, সেটা ভ্রান্তিকর। শুধু এগিয়ে চলো। শুধু অতিক্রম করো।

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, আর যে চলতে থাকে তার ভাগ্যও চলতে থাকে। পথে চলো এগিয়ে চলো। অতিক্রম করে চলো।

যে শুয়ে আছে তার কলিযুগ, যে জেগে উঠেছে তার দ্বাপর যুগ, যে উঠে দাঁড়িয়েছে তার ত্রেতা যুগ আর যে চলছে তার সত্য যুগ আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং পথে চলো এগিয়ে চলো। অতিক্রম করে চলো।

যে চলছে সেই মধু অর্জন করছে, যে চলছে সেই অমৃত ফল লাভ করছে—ঐ দেখ সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব, সে চলতে-চলতে কখনো

তন্দ্রালু হয় না, তাই শুধু পথে চলো এগিয়ে চলো। পার হয়ে চলো।

পথ কখনো সমতল নয়, কুসুমাস্তৃত নয়। পথ বন্ধুর, কুটিল, কণ্টকাকীর্ণ। তাই ভীত হলে চলবে না, কারণ জগতে আর যারই স্থান থাক ভীতের স্থান নেই।

.হে ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার দ্বারা রক্ষিত হই। আমরা যেন তোমার বজ্রকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে শত্রুকে আঘাত করতে পারি। যেন পরাজিত করতে পারি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

আলিপুর বোমার মামলা প্রথম রুজু হয় বার্লির কোর্টে। বার্লি আসামীদের দায়রায় সোপার্দ করেন আর সে দায়রার বিচারে বসে বিচক্রফট। মুখ্য আসামী অরবিন্দ, আর বিচক্রফট কেমব্রিজে তার সহপাঠী ছিল। ক্লাসিকসে অরবিন্দ বিচক্রফটের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল। সে প্রায় পনেরো ষোল বছর আগেকার কথা, বিচক্রফটের মনে আছে কিনা কে জানে।

প্রায় এক বছর নির্জন কারাবাসে কাটাতে হল অরবিন্দকে।

দুর্বহ দিন কী করে ব্যয় করা যায়! শুধু অসংলগ্ন চিন্তা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, সমস্তই কেমন ভিত্তিহীন, অরবিন্দের মন হাহাকার করতে লাগল। কী করে দিন কাটাই, কোন চিন্তা নিয়ে? কোনো চিন্তাই যে মনকে বিশ্রাম দেয় না, আয়তন দেয় না, আনন্দে মাতিয়ে রাখে না। কেবলই ক্লান্ত করে, শুষ্ক করে, রুগ্ন করে, দগ্ধ করে। যেন এক গুরুভার পাষাণ বুকের উপর বসে থাকে সর্বক্ষণ। তবে কি সে পাগল হয়ে যাবে? নইলে সমস্ত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেন? যে বুদ্ধি চিন্তাকে চালনা করে সে পর্যন্ত শিথিল।

হঠাৎ অরবিন্দের মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটি জ্যোতির্বাক্য, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সেই মন্ত্র অহর্নিশ জপ করতে বসল, নির্জন কারাবাসের বিভীষিকা সরে গেল চকিতে।

অরবিন্দ লিখছে: 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম এই উপলব্ধি বৃক্ষে গৃহে

প্রাচীরে মানুষে পশুতে পক্ষীতে ধাতুতে মৃত্তিকায় সর্বভূতে আরোপ করতে লাগলাম। করতে করতে এমন ভাব হয়ে যেত-যে কারাগারকে আর কারাগারই বোধ হত না। সেই উঁচু প্রাচীর, লোহার গরাদ, সেই সাদা দেয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ কিছুই যেন আর অচেতন নয়, সমস্তই সর্বব্যাপী চৈতন্যে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। এক-একবার এমন মনে হত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাঁশি বাজাতে দাঁড়িয়েছেন আর সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টেনে বের করে নিচ্ছেন। সর্বদা এই অনুভব হতে লাগল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করছে, আমাকে কোলে করে রয়েছে।'

কারাগারে সর্বত্র অরবিন্দ বাসুদেব দেখল। প্রাচীর কোথায়, বাসুদেব দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাছ ছিল, দেখল সেও বাসুদেব। কয়েদী কোথায়, প্রহরী কোথায়, পুলিস কোথায়, সবাই বাসুদেব। ঘরের মর্চেপড়া জানলার শিকগুলোও বাসুদেব। কোথাও নিস্তার নেই, সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় হয়ে উঠেছে। 'যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥'

সেই অফিসর ভদ্রলোক জানকীনাথের বৈঠকখানায় এসে বসল।

চিন্তিত মুখে বললে, 'আপনার বাড়িতে দেখি রাজনীতি ঢুকেছে।'

'রাজনীতি ?' জানকীনাথ টেবিলের থেকে মুখ তুললেন : 'তার মানে ?'

'শুধু রাজনীতি নয়, বলতে পারেন রাজদ্রোহ।'

'আপনি কি বলছেন ?' খাড়া হয়ে বসলেন জানকীনাথ।

'বলছি এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী ?'

'সুবি—সুভাষের পড়ার ঘরে যত সব রাজদ্রোহীদের ছবি টাঙানো। ঐ সব আলিপুর বোমার মামলার খুনে আসামীরা—' অফিসর-আত্মীয় আতঙ্কিত মুখে নামোচ্চারণ করতে লাগল : 'অরবিন্দ ক্ষুদিরাম কানাইলাল প্রফুল্ল চাকী—'

জানকীনাথ চমকে উঠলেন : 'ও সব ছবি ও পেল কোথায় ?'

'খবরের কাগজ থেকে কেটে পিসবোর্ডে আঠা দিয়ে আটকে টাঙিয়ে রেখেছে।'

জানকীনাথ বুঝি একটু প্রশ্রয়ের প্রলেপ দিতে চাইলেন। বললেন, 'ছেলেমানুষ। বুদ্ধি এখনও পাকে নি। ছবি মনের মধ্যে আছে তাই থাক না, কেটে বাইরে এনে টাঙাবার দরকার কী। ছেলেমানুষ আর কাকে বলে !'

'সে যাই হোক', অফিসর আত্মীয় গম্ভীর হল : 'ছবিগুলো সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'না, না, ছবি-টবি রাখা চলবে না, সমস্ত সরিয়ে ফেলতে হবে।' জানকীনাথ উঠে পড়লেন।

সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে তার ঘরে ঢুকেই সুভাষ একটা ধাক্কা খেল। দেখল দেয়ালটা শাদা। ছবিশূন্য।

সারদা ঝি কাজ করছে তাকে লক্ষ্য করে সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'এ কি, দেয়ালের সব ছবি কী হল?'

সারদা বললে, 'কর্তাবাবু সরিয়ে ফেলেছেন।'

'বাবা সরিয়ে ফেলেছেন!' সুভাষ স্তব্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ নজরে পড়ল, বিবেকানন্দের ছবিটা নিটুট রয়ে গেছে। কী ভেবে বাবা সেটা সরিয়ে নেন নি।

'যাক, তুমি আছ। তুমি থাকো। তুমি থাকলেই হল।' স্বামীজির ছবির কাছে এসে দাঁড়াল সুভাষ: 'তুমিই বিপ্লব-মহেশ্বর। আমি আর কিছু জানিনা, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমাকে জানলে কোথায় পাপ, কোথায় দৌর্বল্য, কোথায় ভীরুতা! তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ শুধু নিজের মুক্তির জন্যে নয়, দেশের মুক্তির জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে। তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমাকে আশীর্বাদ করো।'

'আমাদের প্রয়োজন শুধু শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি।' বলছেন বিবেকানন্দ: 'উপনিষৎসমূহই শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। যে শক্তিসঞ্চারে উপনিষৎ সমর্থ তা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। উপনিষদই সকল জাতির সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতদের ঈশ্বরকে আহ্বান করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

'সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়-মনোবাক্যে যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উলটে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না।' আবার বলছেন স্বামীজি: 'বাধা যতই হবে ততই ভালো। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নতুন হবে যত ভালো হবে সে জিনিস প্রথম তত বেশি

বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্বলক্ষণ। বাধাও নেই সিদ্ধিও নেই।'

অরবিন্দের নির্জনবাসের কারাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ দেখা দিলেন।

গ্রেপ্তারের সময় অরবিন্দের ঘরে যে দক্ষিণেশ্বরের মাটি পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়ে পুলিসের কম হয়রানি হয় নি। নিশ্চয়ই এ মাটি নয়, এ ভয়ঙ্কব তেজী কোনো বিস্ফোরক পদার্থ। সাধারণ মাটি কৌটোয় ভরে রাখবে অরবিন্দ তেমন ছেলেই নয়। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠাও। দেখ কী সাংঘাতিক ফল না জানি বেরোয়।

ফল সাংঘাতিকই বটে। মাটি মাটি বলেই প্রতিপন্ন হল বটে কিন্তু কারাগারে অরবিন্দ বাসুদেব দর্শন করলে। 'সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল।' 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

'বিবেকানন্দ তেমনি একটা ভাব,' বলছেন অরবিন্দ, 'যা সিংহ-প্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত, যা সমুদ্রের জোয়ায়ের মত প্রবেশ করছে ভারতেব মর্মকেন্দ্রে, যা এখনো জেগে আছে মাতৃমর্মে, মায়ের সন্তানদের মর্মলোকে।'

'কে মা? মৃত্যুরূপিণী কালীই আমার মা।' বলছেন স্বামীজি, 'মৃত্যু বা কালীকে পূজা করতে সাহস পায় কজন? এস, ভয় কী, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি, দুঃখকে দুঃখ জেনেই বুকে তুলে নিই। ভয় কী, ঐ ভীষণা ঐ কঠিনা যে আমাদেরই মা।'

কারাকক্ষে অরবিন্দকে বিবেকানন্দ পনেরো দিন দেখা দিলেন। দেখা দিলেন অতিমানসতত্ত্বের সন্ধান দিতে। বলছেন অরবিন্দ, 'বিবেকানন্দই আমাকে অতিমানসতত্ত্বের সন্ধান দেন—এই এই ঐ ঐ—এমনি নির্দেশ দিয়ে নানা ভাবে। আলিপুর জেলে পনেরো দিন ধরে আমাকে শেখান ও বোঝান।'

'বিলেত থেকে ফিরে যখন বরোদায় ছিলাম তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও

বিবেকানন্দের বই পড়ি।' বলছেন অরবিন্দ: 'সমস্ত ভারতেই তাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। হঠযোগ অভ্যেস করার সময় আমি আরেকবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন।'

'শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দের বশ্যতা স্বীকার প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যের বশ্যতা স্বীকার।' এও অরবিন্দের কথা।

আর বিবেকানন্দ কী বলছেন দেশপ্রেম সম্পর্কে?

'ওরা দেশপ্রেমের কথা বলে। আমি দেশপ্রেম নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি কিন্তু আমার দেশপ্রেমের আদর্শ আলাদা। তার জন্যে তিনটে জিনিস দরকার। প্রথম হৃদয়, আন্তরিক অনুভূতি—বুদ্ধি-যুক্তির সাধ্য আর কতটুকু? দ্বিতীয়, প্রেরণা—হৃদয়ের থেকেই আসবে এই প্রেরণা। আর তৃতীয়, ভালোবাসা। ভালোবাসাই অসম্ভবের দুয়ার খুলে দিতে পারে, বিশ্বের সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠিই ভালোবাসার হাতে। সুতরাং যারা দেশপ্রেমিক হতে চাও, আগে অনুভব করতে শেখ। তোমাদের কি অনুভূতি আছে? দেবতা ও ঋষিদের কোটি কোটি বংশধর আজ ভারতে অনাহারে আছে এ কি তোমার হৃদয়ের গভীরে একবারও অনুভব করো? একবারও কি অনুভব করো যে কালো মেঘের মত ঘোর অজ্ঞান সারা দেশ আচ্ছন্ন করে আছে? এ সব অনুভব কি তোমাকে অস্থির করে তোলে? রাতের ঘুম কেড়ে নেয়? এ ব্যথা কি তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার হৃৎস্পন্দনের তালে-তালে আছড়ে পড়ে?

শুধু—এটুকুই নয়। পর্বত প্রমাণ বাধা এলে তাকে অতিক্রম করার সাহস আছে তো? যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও তুমি, তরবারি হাতে নিয়ে, তোমার কর্তব্যসাধনে এগিয়ে যাবে, তোমার আছে তো সেই প্রতিজ্ঞা? তোমার নির্বিচল নিষ্ঠা আছে তো? যদি তোমার এ সব থেকে থাকে, তুমি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে। যদি তুমি গুহাতেও থাকো, তোমার চিন্তা

পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, শত শত বৎসর ধরে জগন্ময় স্পন্দিত হবে—হয়তো কোনোদিন কোনো এক আধারে মূর্ত হয়ে পরিপূর্ণ সিদ্ধিতে বিকশিত হয়ে উঠবে। চিন্তা, আন্তরিকতা ও পুণ্য সঙ্কল্পের মাঝে এমনি দিব্যশক্তি।'

'তোমার এই অভীপ্সা আমার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠুক—আমিই তোমার সেই স্বপ্নকে ফলান্বিত করে তুলি—' সেদিন স্বামীজির দিকে তাকিয়ে সুভাষের মনের গহনে কি এমনি এক নীরব প্রার্থনা চেয়েছিল উচ্চারিত হতে ?

ছেলেকে নিয়ে বাবা-মা যেন ভাবনায় পড়লেন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর কেবল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ করে। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন সাধুর খোঁজ পাওয়া গেছে তার সঙ্গ করতে ছোটে। ছেলেটা শেষে সন্নেসী হয়ে যাবে নাকি ?

সন্নেসী হওয়াটা অবশ্যি চণ্ডনীতি নয় কিন্তু স্রেফ পণ্ডনীতি। ছেলে কোথায় বিদ্যার গৌরবে জগজ্জয়ী হবে, তা নয়, কৌপীনকন্থা সম্বল করে বাউণ্ডুলে ভবঘুরে হতে চলেছে। বলে কিনা, আত্মানং মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। নিজের মুক্তি আর জগতের হিত—এর বাইরে আর কিছু নেই। বলে কিনা, রামকৃষ্ণের মত কামকাঞ্চন ত্যাগই আমার আদর্শ, বিবেকানন্দের মত অভী-মন্ত্রের শরীরী স্তোত্র হয়ে ওঠা।

অভিভাবকরা অনেক বোঝান কিন্তু সুভাষ শুনেও শোনে না। প্রভাবতীর কাকুতি-মিনতি নিষ্ফল, এমন কি জানকীনাথের তিরস্কারও।

ছেলেটা এমন তো কখনো ছিল না। আগে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ বলত, এখন বলছে কি না, ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন ভ্রাতা—গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী। কখনো বা বলছে ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা না মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। আজকাল যেন বাধাবন্ধন বিশেষ মানতে চায় না, বলতেই বলে, নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

কটকে নানারকম সাধুর আমদানি। খবর পেলেই সুভাষ দেখতে ছোটে, ঘন হয়ে ঘেঁষতে চায়। যে সব সাধু মঠধারী বা আশ্রমবাসী তাদের সুভাষের তত পছন্দ হয় না—যদি মঠে ঢুকলি বা কুটিরই বাঁধলি, তবে মিছিমিছি ঘর ছাড়তে গেলি কেন? যদি ভিক্ষাবৃত্তিই নিলি তবে তোর চাকরি ছাড়বার কী হয়েছিল? পুত্র ত্যাগ করে এসে শিষ্য বানাবার বাহাদুরি কী? তার চেয়ে যে সাধু নির্গ্রন্থ, সর্ববন্ধনবিরহিত, যার আসন-শয়ন উন্মুক্ত আকাশের নিচে, বৃক্ষতলে, সেই কাম্যতর। সুভাষ তারই কাছে গিয়ে ঘনতর হয়।

তাদের কুলগুরু একদিন গৃহে এসে উপস্থিত। তাঁর কাছে ধর্ম-কথা শুনে সুভাষ অবশ্যি খুব আনন্দিত কিন্তু যেহেতু কুলগুরু সন্ন্যাসী নন সেহেতু সুভাষ যেন তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধান্বিত হতে পারছে না। যে গুরুর গৃহে ও শ্মশানে সমত্ববুদ্ধি আছে ও যে গুরু স্বয়ং আচরণ করে উপদেশ দেবার সৎসাহস দেখাতে পারে সুভাষ বুঝি তারই প্রতি সশ্রদ্ধ।

তার ব্যবহারে ও অবাধ্যতায় বাবা-মা কষ্ট পাচ্ছেন এও সুভাষের কাছে এক গভীর যাতনা। সে তো বাবা-মাকে কষ্ট দিতে, তাঁদের অবাধ্য হতে, মোটেই অভ্যস্ত নয়, কিন্তু তার মধ্যে যে এক ঐশ্বরিক উন্মাদনা এসেছে সে যে কোনো বাধ্যতা কোনো বশ্যতা মানতে চায় না। আর শ্রীরামকৃষ্ণই তো বলেছেন ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু যার জন্যে বাবা-মার আদেশকে অমান্য করা যায়। প্রহ্লাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনে নি তার বাপের শাসন। ভরত রামের জন্যে মানে নি তার মায়ের মিনতি। তাই ঈশ্বরের জন্যে যদি বাবা-মাকে কষ্ট দিতে হয় তা হলে সেটা ঈশ্বরই বুঝবেন।

কিন্তু কই, সেই সাধু কই, সেই গুরু কই? যে তাকে এই সঙ্কীর্ণ অহং-এর কারাগার থেকে ছিন্ন করে নিয়ে যাবে নির্মুক্ত নিখিল জীবনের মাঝখানে, সেই পুণ্যপীযুষপূর্ণ মহাজন কোথায়?

শুধু অভীপ্সা, শুধু অন্বেষণ। পথপ্রদর্শক কই?

কোথাও কিছু না পেয়ে সুভাষ যোগ নিয়ে বসল। শুধু বই পড়ে কি যোগ শেখা যায়, শুধু ছাপানো ছবি দেখে? তার বেশি আর এখন কই? এখন নিজে নিজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা ভালো। শুধু মনকে একাগ্র করা, সমস্ত বিষয় থেকে বিমুক্ত করে নেওয়া—এই একটা ব্যায়াম তো মাত্র। কোনো একটা বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকা, সে অসীম নীলাকাশই হোক বা দেয়ালে কয়লা দিয়ে আঁকা একটা গোল চিহ্নমাত্রই হোক। শুধু মনকে আর চালক নয়, মনকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য করে তোলা। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করতে পারলেই মানুষ দেবত্বে গিয়ে পৌঁছোয়।

আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর, শুধু নিজের মুক্তি দিয়ে কী হবে? আর-সকলকে মুক্ত করতে হবে না? আমি কি একা? আমি কি সকলকে নিয়ে নই? আমি আমার কাজ গুছিয়ে একা-একা সরে পড়ব আর আমার চারপাশের সকলে বন্ধনে-শৃঙ্খলে জর্জর হতে থাকবে?

পথ খুঁজে পায় না সুভাষ।

স্বামীজির কথা আবার মনে পড়ে: 'গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখন ভাববে, তখনি মনে অশান্তি। সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।'

সুভাষচন্দ্র তার দানের হাত বড় করে বসল। দরিদ্র বা দুঃস্থ দেখলেই ঢেলে দিত অকাতরে। হৃদয়ে স্বাভাবিক অনুভবটুকু ছিল বলেই বিচার করে দেখতে চাইত না বেশি হয়ে গেল নাকি। আমি দিচ্ছি না, ও নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করছে, এমনি ভাবের

থেকেই দিত। স্বামীজির কাছে বলা রামকৃষ্ণের কথা সুভাষ ভোলে নি—জীবে দয়া নয়, জীবে প্রেম।

শুধু ভালোবাসায়ই বা কী হবে যদি ওদের না দুঃখদারিদ্র্য দূর করতে পারি। শিকাগোর জগজ্জয় বক্তৃতার পর স্বামীজি তাঁর হোটেলে ফিরে গিয়ে কাঁদতে বসলেন, আমার দেশের লোক যখন অনাহারে আছে তখন মূল্যহীন এই সংবর্ধনা।

'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' বলছেন স্বামীজী, 'ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তাদের কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলেছি। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? কিন্তু কালকে অতিক্রম করা কঠিন। 'কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।' আর সকলে ঘুমিয়ে থাকলে কী হবে, কাল ঠিক জেগে আছে। অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ-লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্যে কাঁদো। ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাচ্ছ? দরিদ্র দুঃখী দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তার উপাসনা করো না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করে কূপ খনন করার অর্থ কী।'

এ সব পড়তে-পড়তে সুভাষের মন ভারতের জনগণের জন্যে আবো বেশি কাতর, আরো বেশি উন্মুখ হয়ে উঠল।

সত্যিই তো, আমি স্বার্থপরেব মত শুধু নিজের তল্পি বাঁধব? আব এরা ভারতের অগণন জনগণ, যারা আমার প্রতিবেশী, যারা আমাকে ঘিরে আছে ধরে আছে, দিনে দিনে গড়ে-পিটে বড় করে তুলেছে, তাবাই আমার কেউ নয়?

বলছেন আবার স্বামীজি, 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বব বিধবার অশ্রুমোচন বা পিতামাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যতদিন ভারতের কোটি-কোটি লোক দারিদ্র্যে, অজ্ঞানে ও অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন

তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরকম প্রত্যেক লোককে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মত থাকবে ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্যে কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগ্য বলব। তাদেরই আমি মহাত্মা বলি যাদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা না হলে তারা দুরাত্মা।'

দুরাত্মা! দেশদ্রোহী! আমিও কি আমার গরিব দেশবাসীদের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু নিজ স্বার্থসাধনে ধ্যানাসীন থাকব?

ঐ শোনো ডাক পাঠিয়েছেন স্বামীজি:

'ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র-শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচারবল যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি এত প্রীতি এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম। অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন-পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো। তোমার যাই বিলীন হওয়া,

অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্তন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ' ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।'

অরবিন্দও স্বীকার করেছে বিবেকানন্দের মধ্যেই প্রথম বেজে উঠেছিল দেশের প্রোলেটেরিয়েটের উদ্ধারণ মন্ত্র। 'নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে? মুক্তিকামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। দেখছিস না নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্যে তা করতে পারবি নে? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর-আমার মত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কী আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভালো।'

সখারাম গণেশ দেউস্কর এক পাঞ্জাবি বন্ধু নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আশা ছিল বেদান্ত নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু স্বামীজি শুধু দরিদ্রের উদ্ধারের কথাই বলতে লাগলেন, কী করে তাদের এই পাপপাশ মোচন করা যায়!

পাঞ্জাবি বন্ধু ভারি হতাশ হল। বেদান্তের কথা কিছুই হল না। বিরস মুখে বললে, 'আজকের দিনটা বৃথাই গেল।'

স্বামীজি গর্জে উঠলেন: 'যতদিন আমার জন্মভূমির একটা কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে ততদিন তাকে আহার দানই আমার একমাত্র ধর্ম। তা ছাড়া বাকি আর যা কিছু—সব অধর্ম।'

আর অরবিন্দের মুখেই তো সেদিন প্রথম 'কুইট ইণ্ডিয়া'-মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। সহজ সাধারণ কথা, একটি বিনম্র ন্যায্য অনুরোধ —দয়া করে সরে পড়ো—কিন্তু ইংরেজের বুকে গিয়ে বাজছে একটা বুলেটের মত। কুইট ইণ্ডিয়া।

লিখছে অরবিন্দ: 'যদি কোনো ইংরেজ লেখে যে ইংল্যাণ্ড ফর ইংলিশমেন, অর্থাৎ ইংরেজদের জন্যই ইংলণ্ড, তবে কি তা অপরাধ

হবে, না রাজদ্রোহ হবে, না, বে-আইনি হবে? কিছুই হবে না। প্রত্যেক ইংরেজ বলবে, ইংরেজদের জন্যেই তো ইংলণ্ড—এ তো খুবই ঠিক কথা। আবার প্রত্যেক ইংরেজই বলবে, ভারতবাসীর জন্যে ভারতবর্ষ—এ অতি ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহসূচক বেআইনি কথা। এটা কোন যুক্তি? এটাও ন্যায্য বৈধ কথা, ভারতবাসীর জন্যেই ভারতবর্ষ, আর এ কথার সঙ্গে চলে আসে আরেক কথা—ইংরেজের জন্যে ভারতবর্ষ নয়। নয়, কদাচ নয়।'

এই বাংলাদেশেই 'কুইট ইণ্ডিয়ার' প্রথম উদ্যোগ। আর তাকে উদ্দেশ করেই রবীন্দ্রনাথের বিজয়বন্দনা:

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।...
বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষার
অখণ্ড বিশ্বাসে।'

সেই অরবিন্দও চলে গেল ঈশ্বরসন্ধানে।

কবে স্ত্রী মৃণালিনীকে লিখেছিল: 'পাগল তো পাগলামির পথে ছুটবেই ছুটবে, তুমি তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তোমার চেয়ে তার স্বভাব অনেক বেশি বলবান। তবে তুমি কি শুধু কোণে বসে কাঁদবে, না, তার সঙ্গে ছুটবে? পাগলের উপযুক্ত পাগলী হবার চেষ্টা কোরো, যেমন অন্ধরাজমহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বেঁধে নিজেই অন্ধ সাজলেন। হাজার ব্রাহ্ম স্কুলে পড়ে থাকো, তবু তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে। আমার সন্দেহ নেই তুমি গান্ধারীরই পথ ধরবে।'

আবার সেই অরবিন্দই লিখলে: 'প্রিয়তমা মৃণালিনী, হিন্দুধর্মে

বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে ভগবান সাক্ষাৎ করবার পথ আছে। সেই সব নিয়ম পালন করতে আরম্ভ করেছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করতে পেরেছি হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যে নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলেছে সমস্ত উপলব্ধি করছি।'

আরো লিখলে : 'যে কোনোমতে ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করতে হবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কোনো না কোনো পথ থাকবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাবার দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়ে যাই।'

আর মৃণালিনীকে এই বুঝি অরবিন্দের শেষপত্র :

'প্রিয় মৃণালিনী, আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই। যেখানে ভগবান আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে পুতুলের মত আমাকে যেতে হবে। যা করাবেন তা পুতুলের মত করতে হবে। তোমার স্বামী।'

চন্দননগরে যাবার আগে অরবিন্দ সস্ত্রীক এসেছিল 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমা সারদামণির সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর আশীর্বাদ নিতে। দুজনেই মাকে প্রণাম করল। মা অরবিন্দের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, 'আমার বীর ছেলে। এইটুকু মানুষ একেই গভর্নমেন্টের এত ভয়।'

তখন সেখানে গৌরীমা ছিলেন, তিনিও অরবিন্দের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করলেন, স্বামীজির কবিতার দুটি ছত্র আবৃত্তি করলেন :

'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক, এ জগতে নাহি তব স্থান ॥'

শশীভূষণ দে সি-আই-ডির কর্মচারী, যোগীন-মার নাতি। সে খবর পেয়েছে শামস্থল আলমের খুনের মামলায় অরবিন্দকে জড়িয়ে ওয়ারেন্ট বেরুবে। শশী সে খবরটা যোগীন-মার কানে দিল। যোগীন-মা জানাল স্বামী সারদানন্দকে। সারদানন্দ বললে গণেন

মহারাজকে, যাও, অরবিন্দকে খবর দাও। গণেন মহারাজ যখন খবর দিতে গেল অরবিন্দ লিখছে। শুনুন, আপনাকে পুলিস ধরতে আসছে, আপনি পালান। অরবিন্দ লেখার থেকে মাথা তুলে বললে, 'আগে কাজ—পরে আর সব।' সে কী, পুলিস যে পিছু নিয়েছে। তা নিক। অরবিন্দ হাসল, বললে, তুমি নিবেদিতার কাছে যাও, তাকে জিজ্ঞেস করো সে আমার হয়ে 'কর্মযোগিন'-এ লিখবে কিনা। যদি নিবেদিতা রাজি হয়, আমার কাজের ভার নেয়, তা হলেই আমি পালাব। গণেন মহারাজ ছুটল নিবেদিতার বাড়ি। নিবেদিতা বলতে না বলতেই রাজি হয়ে গেল। বললে, অরবিন্দকে লুকোতে বলো, এবং প্রচ্ছন্ন থেকেই সে অন্যান্যের মাধ্যমে অনেক কাজ করবে। নিবেদিতার সম্মতি পেয়েও সারাদিন ধরে লিখল অরবিন্দ, তারপর, কোথায় আর যাবে, নিবেদিতারই বাসায় গেল, পর দিন, প্রায় সমস্ত দিন কাটাল নিবেদিতার সঙ্গে। রাত্রে বাগবাজারের ঘাটে নৌকো এসে লাগল। বোস পাড়ায় নিবেদিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ সেই নৌকোয় উঠল। নৌকো চলল চন্দননগর।

অরবিন্দ বললে, 'নিবেদিতার ভিতর থেকে মা কালী আমাকে বললেন, আত্মগোপন করো।'

সুভাষ জানে এ অরবিন্দের পলায়ন নয়, এ অরবিন্দের মহৎ-যোগসাধন। তপস্যা প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপুল শক্তি-সঞ্চার।

কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ইংরেজকে তাড়াবে কে? কে চীরবাসা রুক্ষকেশী বন্ধনবেদনাহতা মায়ের দুঃখ ঘোচাবে? কে বলবে বন্দেমাতরম, লিখবে বন্দেমাতরম, গাইবে বন্দেমাতরম?

'মা গো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম বলে।

বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?
যায় যেন জীবন চলে ॥'

না, সন্ন্যাসে পলায়ন নয়, আত্মগোপনও নয়, সুভাষের মনে হল, দেশমুক্তির জন্যে প্রকাশ্য সংগ্রামই বুঝি তার জন্যে নির্ধারিত তপস্যা। তারই আয়োজনে, যজ্ঞের সমিধ-সংগ্রহে এই প্রারম্ভ থেকেই ব্যাপৃত হওয়া যাক। সাধুসন্ত ছেড়ে দিয়ে সুভাষ আবার পড়ার টেবিলে মন দিল। ডুব দিল বইয়ের সাগরে। সামনেই ম্যাট্রিকুলেশন।

জানকীনাথ ও প্রভাবতী আশ্বস্ত হলেন। ছেলে এবার পড়ার বইয়ে মনঃসংযোগ করেছে। বিপুলবিভবদাত্রী সৌভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।

এগারো

উনিশ শো এগারো সালে মোহনবাগান শিল্ড পেল। বঙ্গভঙ্গ রদের পর এ যেন আরেক জয়। যেন শুধু খেলার মাঠের জয় নয়, রাজনৈতিক জয়। মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড়ের ছবি ছাপিয়ে বিক্রি হতে লাগল—ছবির নিচে লেখা ঃ অমর এগারো জন। আখ্যান দেওয়া হল—'পলাশীর প্রতিশোধ।' যেন মোহন-বাগানের মোহন স্বয়ং সেই মোহনলাল। 'গর্জিলা মোহনলাল নিকট শমন।'

উনিশ শো বারো সালে তেইশে ডিসেম্বর দিল্লিতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা পড়ল। হাতিতে চড়ে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল, তখন এই কাণ্ড। মাহুত মারা গেল, বড়লাট ও তার স্ত্রী আহত হল। পরে বড়লাট সামলেছিল বটে কিন্তু তার স্ত্রী আর ফিরল না।

কৃতকৃত্য কে ?

রাসবিহারী বসু। তার ডান হাত বসন্ত বিশ্বাস।

দেরাদুনে ফরেস্ট অফিসের হেডক্লার্ক রাসবিহারী। বোমা ফেলেই রাসবিহারী দেরাদুনে ফিরল। ফিরেই বড়লাটের উপর বোমা ফেলার ব্যাপার নিয়ে সভা ডাকল আর সেই সভায় সে তীব্র ভাষায় বোমা ফেলার নিন্দা করল। অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক এমন দাবি করতেও তার বাধল না।

পুলিস ধাপ্পায় ভুলল। রাসবিহারীকে স্পর্শও করল না।

যতীন মুখুজ্জে, বাঘা যতীনও, সরকারী চাকুরে ছিল। তার বস্ ছিল হুইলার। যতীনকে খুব ভালোবাসত হুইলার। যখন হাওড়া

ষড়যন্ত্র মামলায় যতীনকে ধরল তখন পুলিস কমিশনার ঠাট্টা করে বলেছিল হুইলারকে, তোমার যতীন-হুইলারও গ্যাং কেসে পাকড়াও হয়েছে। হুইলার খেপে উঠল, টেবল চাপড়ে বললে, 'ননসেন্স! যতীন নির্দোষ। আমি বলছি সে ঠিক বেরিয়ে আসবে।'

যতীন ঠিক ছাড়া পেল। উনিশ শো ছয় সালে প্রায় খালি হাতে বাঘ মেরেছিল সে। সেই থেকে সেই শূরশার্দুলের নাম বাঘা যতীন।

আরেক যতীন ছিল যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, নাম নেয় নিরালম্ব স্বামী। নিরালম্ব ডাকাতির বিরুদ্ধে, তার কথা ছিল সশস্ত্র বিপ্লব।

লম্বা-চওড়া শরীরের এক বাঙালি, এক হাতে লাঠি আরেক হাতে লোটা, একদিন বরোদায় অরবিন্দের বাসায় এসে উপস্থিত হল।

কী নাম?

'যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যস, এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। বাড়ি কোথায়, সংসারে কে কে আছে, কী উদ্দেশ্যে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি জানতে চাইবেন না। জিজ্ঞেস করলেও কিছুই বলতে পারব না।'

'আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?' স্থির চোখে তাকাল অরবিন্দ।

'বরোদার ফৌজে যদি আমাকে ঢুকিয়ে দেন। আমার বড় সৈন্য হবার ইচ্ছে।'

যতীনের চোখের মধ্যে অরবিন্দ কী এক আগ্নেয় ইঙ্গিত টের পেল। প্রথমে গোয়েন্দা ভেবেছিল—না, গোয়েন্দা নয়, এ যেন কোন এক তীব্রবিষ দীপ্তজিহ্ব ভুজঙ্গ, পরার্থলুব্ধ ইংরেজের ঠিক মর্মমূলে দংশন করতে উন্মুখ।

বাঙালি শুনলে ফৌজে নেবে না তাই যতীন তার উপাধির 'বন্দ্য' ছেড়ে দিল। সাজল যতীন্দ্র উপাধ্যায়। যেমন দেখাচ্ছে তেমনি শোনাচ্ছেও কাঠখোট্টা।

লেফটেনাণ্ট মাধবরাও যাদবের শরণ নিল অরবিন্দ। বন্ধুস্থানীয় লোক, অরবিন্দের কথা মাধবরাও ফেলতে পারল না। আর ফেলবেই বা কী করে? দৃশ্য-শ্রুত সমস্ত পরীক্ষাতেই তো যতীন্দ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ।

যতীন্দ্রের কাজ হল সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়ানো।

অরবিন্দ তাকে পাঠিয়ে দিল সরলা দেবীর কাছে। অভিসন্ধি গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করা। যতীন্দ্র সরলা দেবীর লাঠি-তলোয়ারের আখড়ায় এসে ঢুকল।

যুবকদের দলভুক্ত করার কৌশলই হচ্ছে লাঠি-তলোয়ার শেখানোর আখড়া খোলা। চলে এস সাজোয়ানের দল। কুস্তি শেখ, বক্সিং শেখ, জুজুৎসু শেখ। গীতা আর তলোয়ার ছুঁয়ে দীক্ষা নাও। অনলসঙ্কাশ হয়ে ওঠো।

'সমস্ত ভারত ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে তৈরি।' দলভুক্ত যুবকদের কাছে বলত উপাধ্যায়ঃ 'সমস্ত প্রদেশ তো বটেই এমন কি করদ রাজ্যগুলোও। লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলোয়ার শানাচ্ছে। এমন কি গারো নাগা ভীল কোল অসভ্য জাতিদেরও হাজার হাজার লোক পাঁয়তারা কষছে। খালি বাংলাদেশই তৈরি নয় বলে সমস্ত অভ্যুত্থান আটকে বসে আছে। কামান বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের কোনো ভাবনা নেই। জেনারেল ক্যাপ্টেনও তৈরি কিন্তু বাঙালি কই। কই বাঙালি জেনারেল, বাঙালি ক্যাপ্টেন? তোমরা দলে দলে এগিয়ে এস। যে আগে যোগ দেবে সেই ক্যাপ্টেন-কমাণ্ডার হতে পারবে।'

কৌশল যাই হোক, কত বড় কথা, কত বড় স্বপ্ন। শুধু ডাল-পালা কাটলে কি গাছকে নিষ্ক্রিয় করা যায়? একেবারে ওটার মূলে সসমারোহ আঘাত করো। শুধু খুচরো খুনে আর ডাকাতিতে ঐ মহীরুহের অঙ্গচ্ছেদ করে কিছু হবে না। একেবারে সামগ্রিক সশস্ত্রতায় তুমুল আক্রমণ করো, ও সমূলে উৎপাটিত হবে।

সেই যতীন্দ্র ব্যানার্জিও সন্ন্যাসী হয়ে গেল। সমস্ত দেশকে নিরালম্ব করে হয়ে দাঁড়াল নিরালম্ব স্বামী।

প্রত্যক্ষে আরেকবার হুঙ্কার দিয়েছিল যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'সন্ধ্যা' যায়-যায় হয়েছিল। নিরালম্ব স্বামী 'সন্ধ্যার' সম্পাদক হয়ে বসল, বসেই লিখল : 'মরি নাই, আমি আসিয়াছি।'

ব্রহ্মবান্ধব খৃস্টান। আবার সন্ন্যাসী। আবার অমিততেজা ব্রাহ্মণ। স্বদেশ প্রেমে জ্বলিতবজ্র। আকুমার ব্রহ্মচারী আবার উপবীতধারী হিন্দু।

ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গোড়ায় কেশব সেনকে ধরে ব্রাহ্ম হয়েছিল। সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়ে খৃস্টান। প্রথমে রোমান ক্যাথলিক, পরে প্রোটেস্টাণ্ট, শেষে বেদান্তে অনুরাগ হল। মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করে গলায় উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণ হয়ে গেল।

উনিশ শো দুই সালের পাঁচুই জুলাই সকালে হাওড়া স্টেশনে খবর পেল গত রাত্রে স্বামীজি দেহ রেখেছেন। তখুনি ছুটল বেলুড় মঠে। স্বামীজির নশ্বর দেহের দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মবান্ধব অন্তরে একটা প্রেরণা পেল ইংরেজ-বিতাড়নের ব্রত উদযাপন করো। ব্রহ্মবান্ধব ঠিক করল বিলেত যাবে।

মুখের কথা যা শপথও তাই। তিন মাসের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব বিলেত রওনা হল। কে বিশ্বাস করবে, পকেটে সম্বল মাত্র সাতাশ টাকা।

বিলেতে কতগুলি বক্তৃতা দিয়ে দেশে ফিরল।

কোনোদিন বোমা ছোঁড়ে নি বটে কিন্তু 'সন্ধ্যায়' যে সব প্রবন্ধ তা প্রত্যেকটাই পুলিশের উপর অশনিসম্পাত। শুধু পরিহাসের প্রহার বা, বলা যায়, চাবুকের চাতুরি। এ জ্বালা হৃদয়ভেদী।

শেষ পর্যন্ত ধরল উপাধ্যায়কে। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তার পক্ষে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই বললে, এ মামলায় আমার মক্কেল

কোনো অংশ নেবে না যেহেতু এটা বিদেশীর আদালত। আমার মক্কেল ইংরেজের আদালত, বিদেশের আদালত, মানে না, তাই সে সম্পূর্ণ নীরব থাকবে।

'আপনার মক্কেল দোষ স্বীকার করবে?'

'দোষ স্বীকার করবে না, কেননা দেশের স্বাধীনতার জন্যে লেখনীচালনা অপরাধ নয়। তবে আমার মক্কেল পত্রিকার ও তাতে এই লেখা ছাপানোর দায়িত্ব তার একলার নিজের বলে মেনে নিচ্ছে। এর বেশি আর কিছু সে বলতে চাইছে না। কেননা একটা বিদেশী আদালতের কাছে সে জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নয়।'

আদালতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্তও এই নতুন, এই প্রথম।

সাক্ষীদের একতরফা জবানবন্দি হল, আসামী পক্ষ থেকে তার কোনো জেরা নেই।

চিত্তরঞ্জনকে উপাধ্যায় বললে, 'তুমি আমার জন্যে ভেবো না, ইংরেজের সাধ্য নেই আমাকে জেলে দেয়।'

কত দিন কোর্টের পর চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে চলে এসেছে উপাধ্যায়। বাড়ি ফেরার সুবিধে করে উঠতে পারে নি। কী কতটুকু খেয়েছে কি না খেয়েছে, এখন শুতে চাইছে ভূমিশয্যায়। সে কী, বাড়িতে খাট আছে, বিছানা আছে, সেখানে আরাম করে শোন।

না, ভূমিতল্ থাকতে আমার শয্যায় কী দরকার? বালিশ লাগবে না, বাহুই আমার স্বাভাবিক উপাধান, মাটিতে শুয়েই ঘুমুল উপাধ্যায়।

উপাধ্যায়ের কথাই ঠিক হল। মোকদ্দমা শেষ হবার আগেই ক্যাম্বেল হাসপাতালে সে মারা গেল। ইংরেজের জেলখানায় তাকে ঢুকতে হল না।

'সে সুখের দিন কবে বা হবে, টিকটিকির পূর্ণ লাহিড়ি ওয়ারেণ্টো হাতে দেবে?' এ উপাধ্যায়ের গান। কিংবা 'কারাগার স্বর্গ মানি, মা বলে টানব ঘানি।'

আর ছিল লিয়াকত হোসেন আর তার বালকসেনার দল। রাস্তায় রাস্তায় তুলল বন্দেমাতরম্‌-এর উচ্চনাদ। 'যাদের ভয় আছে তারা গোড়াতেই সরে পড়ো। এর পর যারা ভাগবে তাদের মানুষ বলে স্বীকার করব না, তাদের কুকুর-বেড়াল মনে করব।'

জেলে যাওয়াটা লিয়াকতের কাছে জল-ভাত, তাই কোনো কিছুতে তার দুঃখও নেই ভয়ও নেই। দুঃখ করলেই দুঃখ, ভয় করলেই ভয়। লিয়াকত ভয়শূন্য তো বটেই, লিয়াকত ভয়ত্রাতা।

ভূপেন বোস সরকারকে মুচলেকা দিয়ে এসেছিল রাখীবন্ধনের দিন সভায় কেউ লাঠি নিয়ে যাবে না আর রাজদ্রোহের বক্তৃতা দেবে না। কে কার কথা শোনে। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকের হাতে লাঠি। ওরা আছে থাক, লিয়াকত এক দঙ্গল বালকবাহিনী নিয়ে সভায় ঢুকল, তাদের হাতে লাঠি, মাথায় লাল ফেজ। মুখে বন্দেমাতরম্‌।

এবার ধরল লিয়াকতকে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করবার দরুন তার জেল হল ছ মাস। হাসিমুখে দণ্ড ভোগ করল লিয়াকত, আইন-ভঙ্গকে মহিমান্বিত করে তুলল। যে আইন স্বেচ্ছাচারী তাকে ভঙ্গ করে যে দণ্ড সে তো বিষ নয় সে পীযুষ।

আরো কত কাণ্ড ঘটে গেল।

ডিটেকটিভের কনস্টেবল শ্রীশ চক্রবর্তীকে সিকদার বাগান স্ট্রিটে তার বাড়ির কাছে গুলি করা হল। অন্ধকার গলি, কে মেরেছে, কারুর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। মেডিকেল কলেজে যেতে না যেতেই শ্রীশ শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

মরল রাজকুমার রায়, ডিটেকটিভের সাব ইনস্পেক্টর, ময়মনসিংহে প্রায় তার থানার কাছাকাছি। মেরে কে যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার নিশ্বাসের চিহ্নটুকুও কেউ খুঁজে পেল না।

না, না, এসব ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই—সুভাষ একান্ত-চিত্ত হয়ে পড়ায় মন দিয়েছে, তাই সে এখন সাধন করুক।

নইলে এমন খবর তো আরও আছে।

গোয়েন্দা মনোমোহন দে খুন হল রাত্রে, তার বাড়িতে, তার বিছানায়। ঢাকা ষড়যন্ত্র ও ময়মনসিং বোমার মামলায় সরকার পক্ষের জাঁদরেল সাক্ষী মনোমোহন। বিপ্লবী আসামীদের কৃতান্ত। সর্ব চেষ্টায় অযাত্রা, ওকে না সরালে বাঞ্ছিতার্থ লাভ হচ্ছে না। সুতরাং হাতে হারিকেন লণ্ঠন, পথ চিনে চিনে তার বাড়ি এসে পৌঁছেছে বিপ্লবীরা। মনোমোহনের নাম ধরে ডেকেছে বাইরে থেকে। ডাক শুনেও মনোমোহন বিছানা ছাড়ে নি, কে কী জানে, নিশির ডাক হয়তো। কিন্তু না, বাইরে থেকে ডেকে ওকে বার করা যাবে না। দরজা ভেঙে বিপ্লবীরা ঘরে ঢুকল। কী, আপন জনের বিরুদ্ধে আর সাক্ষ্য দেবে, তাদের বাঁচবার পথে, বাড়বার পথে কাঁটা দেবে? তুমি তো ব্রিটিশের মনোমোহন, কই, তোমার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ডাকো। তিন-তিনটে গুলি সরাসরি বিদ্ধ করলো মনোমোহনকে। তিন-তিনটে হ্যারিকেন নিবে গেল অন্ধকারে। কে যে সেই ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কেউ খোঁজ পেল না।

নোয়াখালির সারদা চক্রবর্তী দল ছেড়েছে। শুধু দল ছেড়েই ক্ষান্ত হয় নি, দলের বিরুদ্ধে বলাবলি শুরু করেছে। অতএব এ বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা যায় না। ফলে সারদা চক্রবর্তীর মাথা তার ধড়ের থেকে আলাদা হয়ে গেল। মাথাটা হাতে করে বয়ে নিয়ে যাবার মত এমন কিছু মূল্যবান নয়, সোজা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল পুকুরে। ধরো কাকে ধরবে। কোথাও এতটুকু চিহ্ন রেখে যায় নি।

বিপ্লবীদের হাত পাকছে ক্রমশ।

তারপর এক রাত্রে তিন শত্রু সাবাড়। বিপ্লবীদের আনন্দ দেখে কে! এ আনন্দ তো প্রকাশ্যে জানানো যাবে না, এ শুধু প্রচ্ছন্নে সম্ভোগ করতে হবে।

রসুল দেওয়ান আর আমির দেওয়ান বিক্রমপুর সোনারং গ্রামের

দুই দফাদার। আর ওদের সাকরেদ কালীবিনোদ। তিনজনে মিলে সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বিপ্লবীদের জেলে পাঠিয়েছে। জেলের বাইরে আছে আরো বিপ্লবী—দাঁড়াও, কৃতকার্যের ফল খাওয়াই।

সন্ধের পর রসুলকে কে ডাকল বাড়ির বাইরে। রসুল বাইরে বেরুতেই তাকে গুলি করা হল। গুলি মেরেই আততায়ী ছুটে চলল। কী কুমতি হল রসুলের, বলে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি।' আততায়ী দাঁড়াল, ফিরে এল, কাছে এসে আরো কটা গুলি পর-পর উপহার দিল রসুলকে। কবে আর চিনবে, কাকে বা চেনাবে, রসুল লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আমির দেওয়ানও গুলি খেল।

কিন্তু কালীবিনোদের কী হবে? ও তো এককালে দলে ছিল, এখন পুলিসের কোলে গিয়ে বসেছে, ওর অপরাধ তো আরো জঘন্য। কিন্তু ওদিকে রিভলভারে যে আর গুলি নেই। না থাক, ছুরি আছে। ছুরিই কালীবিনোদের যোগ্য উত্তর।

এ সব হচ্ছে হোক, যদি এতে ব্রিটিশ রাজত্বের বনেদ নড়ে তো নড়ুক, এ সবে এখনো মন দেবার সময় আসে নি সুভাষের।

কিন্তু আন্দামান জেলে কয়েদী ইন্দুভূষণের মৃত্যুর কাহিনী বড় করুণ। এ কি করে ভুলে থাকা যায়?

আঠারো বছরের ছেলে, আলিপুর বোমার মামলায় সাজা পেয়ে আন্দামানে এসেছে। নির্দয় জেলব তাকে জেলের বাইরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়েছে। কী একটা আন্দমানি গাছ আছে, তার থেকে ছাল ছাড়িয়ে আঁশ বের করার কাজ। বিশ্রী কাজ! গাছের আঠার বিষে হাতের আঙুলে ঘা হয়ে গেছে, তবু তার রেহাই নেই। একদিন ইন্দু রুক্ষ কণ্ঠে জমাদারকে বললে, সবার মতন আমাকে জেলের মধ্যে কাজ দাও না! এই কথা! কাজের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি? ইন্দুর হাতে-পায়ে বেড়ি পরানো হল। যাও জেলের মধ্যেই কাজ কর গে।

তাই ভালো। তবু জেলের মধ্যে চেনা মানুষের মুখ আছে, চোখে আছে সমবেদনার স্নিগ্ধতা, তাই যথেষ্ট শাস্তি। কিন্তু না, দুদিন পরেই আবার হুকুম হল, জঙ্গলে যাও।

যাব না। রোক করে ঘাড় বাঁকালো ইন্দু।

লাভ হল এই, জেল-শৃঙ্খলা ভাঙার অপরাধে উলটে শাস্তি হল। জঙ্গলে তো যাবেই, আগে যা করছিলে তার চেয়ে আরো বেশি খাটতে হবে।

দু হাতে বিষাক্ত ঘা হয়ে গেল ইন্দুর। জেলরকে গিয়ে বললে, 'আমাকে অন্য কাজ দিন।'

জেলর বললে, 'অসম্ভব।'

'এই দেখুন আমার হাত।'

জেলর তাকিয়েও দেখল না।

'ঘায়ের জন্য আমি ভাত পর্যন্ত খেতে পারছি না।'

'বাঁ হাত দিয়ে খাও।'

'দুই হাতেই ঘা। আমাকে অন্য-কোনো কাজ দিন স্যার। অন্তত যদ্দিন ঘা না সারে—'

'বেশ, অন্য কাজ দিচ্ছি। কাল থেকে তুমি ঘানি টানবে।' জেলর উঠল গর্জন করে।

'ঘানি!' ইন্দুর চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল: 'এই হাতে ঘানি টানব? যন্ত্রণায় দু হাত টনটন করছে।'

ও সব বাজে আবেদনে কান দিতে রাজি নয় জেলর। হুকুম হুকুম।

'এ হাতে ঘানি টানতে গেলে মরে যাব স্যার।'

গেলে যাবে—এমনি একটা নিঃসাড় ভঙ্গি করল জেলর।

সেল-এ গিয়ে ইন্দু তার গায়ের কুর্তাটা ছিঁড়ল। ফালি-ফালি করল। তাই দিয়ে দড়ি পাকাল। সেই দড়ি গলায় বেঁধে আত্ম-হত্যা করল।

এত অত্যাচার এত বর্বরতা এত হৃদয়হীনতা এ বুঝি সহ্যের বাইরে।

উপরালারা তদন্তে এল। জেলর বললে, 'সব সময়ে একটা আতঙ্কের ছবি দেখত অন্য কয়েদীরা তাকে খুন করবার চক্রান্ত করছে। সেই অশরীরী আতঙ্কেই আত্মহত্যা করেছে।'

না, ইন্দু রায়ের আত্মহত্যা নিয়ে মাথা ঘামানোরও এখন সময় নেই। যা হয় পরে হবে।

ঐ যে গান হচ্ছে না জানি কোথাও:

ঐ যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার তো নয় একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক গ্রাসের মালিক নয়
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এ দেশ তোদের নয়॥'

এও পরে শুনব।

কিন্তু পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে একটু দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' পড়তে দোষ কি? বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ছে সুভাষ:

'রাণা অমর সিংহ। কিন্তু আমি দেখছি যে আর একটি যুদ্ধ করলেই হবে না, এ সংগ্রামের অন্ত নেই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্বজয়ী দিল্লির সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অবিমিশ্র উন্মত্ততা।'

সত্যবতী। উন্মত্ততা রাণা? উন্মত্ত না হয়ে কেউ কোনো কালে কোনো মহৎ কাজ করতে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্যবতী। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয়—অধীনতা কি মৃত্যু! মরবার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেব? আর এ যে সে রত্ন নয়, আমার যথাসর্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতি-

স্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনামূল্যে শত্রুকরে সঁপে দেব? নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলের নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে প্রাণটা কি চিরকাল রাখতে পারবেন?'

'সেই রাণাই আবার বলছে সত্যবতীকে,' সুভাষ পড়তে লাগল: 'সত্যবতী, বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ আর শক্তসিংহ। তার সঙ্গে-সঙ্গে দেখ এই মহাবৎ খাঁ আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কিনা? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কিনা? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও সত্যবতী, আমি সৈন্য সাজাই।'

কিন্তু এ জায়গাটা কী সুন্দর বলছে! সুভাষ পিছনের পৃষ্ঠায় সরে গেল। পড়লে: 'বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় যে দেশের বীর মরে। দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।'

তারপর 'আনন্দমঠও একটু-আধটু নাড়তে-চাড়তে হয়।

'শোনো, মা কী ছিলেন! সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী। কী হয়েছেন? অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্যে নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পায়ের তলায় পিষছেন। তার পর মা কী হবেন তাই দেখ। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা নানাপ্রহরণধারিণী বিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। এস আমরা মাকে প্রণাম করি।' সুভাষ যুক্তকরে প্রণাম করল।

কাকে প্রণাম করল? দুর্গাকে না দেশমাতাকে? যে দেশমাতা সমস্ত দুঃখদুর্গবিঘাতিনী সেই দেশমাতাকে।

'যাও যাও সমরক্ষেত্রে—নাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা॥'

বারো

উনিশ শো তেরো সাল, জুলাই মাস। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে জানকীনাথ বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ঢুকেই হাঁক দিলেন: 'ওগো শুনছ কলকাতা থেকে শরৎ টেলিগ্রাম করেছে। সুবি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে।' কাছেই সারদা-ঝিকে পেয়ে বললেন, 'যাও তোমার মাকে ডাকো।'

পরীক্ষা, টেলিগ্রাম, সুবি, সব মিলে একটা আনন্দের খবর, বুঝতে দেরি হল না সারদার। স্নেহে আর সুখে বিগলিত মুখে সলজ্জ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'আমার সুবি পাস করেছে?'

'হ্যাঁ গো সেকেণ্ড হয়েছে।'

'কী বলছ, ফাস্টো হয় নি?'

'না।'

'কী বলছ', প্রভাবতী ঘরে ঢুকলেন। আতঙ্কিত মুখে বললেন, 'ফার্স্ট ডিভিশন হয় নি?'

'ডিভিশন ফার্স্ট বই কি—' হাসলেন জানকীনাথ।

'তবে তখন যে বললে ফাস্টো নয়?' সারদা আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে পড়ল: 'আমার সুবি ছাড়া আর কে ফাস্টো হবে? তাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।'

প্রভাবতী বুঝলেন ব্যাপার কী। সুভাষের খোঁজ করতে বেরুলেন।

প্রথম হয়েছে কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশান থেকে প্রমথনাথ সরকার আর তৃতীয় হয়েছে চাইবাসা স্কুল থেকে প্রিয়রঞ্জন সেন।

এখন সুভাষ কী করে, কোথায় পড়ে ?,

মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা, আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত দেখলে তুমি সুখী হবে ? জজ, ম্যাজিস্ট্রেট না ব্যারিস্টার ? যদি খুব ধনী হই, লোকের মান্য-গণ্য হই, অনেক গাড়িবাড়ি করি, অনেক চাকর-চাকরানী খাটাই, তা হলেই কি তুমি সুখী হও ? কিংবা যদি গরিব হওয়া সত্ত্বেও খাঁটি মানুষ বলে গুণিজনের কাছে স্বীকৃতি পাই তা হলে কি তুমি সুখী হও না ? তোমার কী ইচ্ছে বলো না মা ?'

মা বলেন, 'আমি তো বুঝি ঠিক-ঠিক শিক্ষা পেয়ে তুমি মানুষ হয়ে ওঠো।'

'আমার তো মনে হয় মা, আসল শিক্ষাই হচ্ছে ভগবানে ভক্তি। যে শিক্ষায় ঈশ্বরের নাম নেই সে শিক্ষা অসার। আর বর্তমান শিক্ষায় আমরা কি মানুষ হচ্ছি, আমরা একেকটি বাবু বনছি। সবল দেহ থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রমের কাজকে ছোটলোকের কাজ বলে ভাবছি, আমাদের গতি কী হবে! পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই আমাদের নাস্তিক আর বিধর্মী করে ফেলছে।'

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল সুভাষ। অঙ্ক লজিক আর সংস্কৃত নিলে। ম্যাট্রিকে অঙ্কে পেয়েছে একশোতে একশো আর সংস্কৃতে পঁচানব্বুই। প্রেসিডেন্সি কলেজ তখন সরগরম। অধ্যাপকদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ, ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা পি. সি. রায়। কানাই দত্তের ফাঁসির পর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিল, 'কানাই শিখিয়ে গেল হে। এবার থেকে ইংরিজি shall আর will-এর ব্যবহার করতে আর কারু ভুল হবে না।'

ছোট মফস্বল শহর ছেড়ে বিরাট রাজধানীতে এসে পড়েছে সুভাষ, প্রকাণ্ড জনজাগরণের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে, সে নিদারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। কলেজের প্রথম ছুটি হতেই ছুটল সে কৃষ্ণনগর, বন্ধু হেমন্ত সরকারের উদ্দেশে।

'আমি এলাম।' হেমন্তর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল সুভাষ।

'ভালো করেছ। আমাদের গুপ্ত সমিতির সুরেশদা যুগলদাও আছেন।'

সুরেশদা অর্থ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর যুগলদা অর্থ ডাক্তার যুগোলকিশোর আঢ্য।

'আর কে আছেন?'

'অমূল্য আছে, গুরুদাসও আছে।'

'সবাই যাবেন তো একসঙ্গে?'

'সবাই যাবেন।'

'প্রথমেই কিন্তু পলাশী। তারপরে মুর্শিদাবাদ।'

'তাই তো সুবিধে।' হেমন্ত হাসল: 'যদি সুবিধে হয় পলাশীতে আমরা বন্দুক ছোঁড়া প্র্যাকটিস করব।'

'হ্যাঁ, চলো সেই যুদ্ধক্ষেত্র দেখব।' সুভাষ বললে, 'সেই আম্রবন।'

হেমন্ত বললে, 'সেই আম্রবন আর নেই। এখন সেখানে আখের খেত।'

'তবু সেই যুদ্ধক্ষেত্রই আমাদের তীর্থ। সেখানেই তো মোহনলাল আর মিরমদনের সৈন্যেরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছিল—'

'আর আছে ইংরেজের তৈরি বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতিস্তম্ভ।'

'চলো।'

সবাই মিলে পায়ে হেঁটে এল সেই পলাশীর মাঠে।

'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি॥'

হেমন্ত বললে, 'এই সেই যুদ্ধক্ষেত্র।'

'আর এই সেই স্মৃতিস্তম্ভ।' সুরেশ হেমন্তকে লক্ষ্য করল, 'এই, খড়ি এনেছিস?'

'এনেছি। এই যে—' পকেট থেকে খড়ি বের করল হেমন্ত।

সুরেশ খড়ি নিল, বললে, 'দাঁড়া, স্তম্ভের গায়ে লিখে দি—মনুমেণ্ট অফ গ্লেয়ারিং ট্রেচারি। জ্বলন্ত বিশ্বাসঘাতকতার স্তম্ভ।'

জগৎশেঠের বাড়িতে পঞ্চবীর বসেছে ষড়যন্ত্রে—রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। সিরাজ দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর, কামকুট, তাকে সিংহাসনচ্যুত না করলে দেশের মঙ্গল নেই। সিরাজের রক্ত ছাড়া দেশময় কলঙ্কের কালিমা কিছুতে ধুয়ে যাবে না। কিন্তু কী করে তার পতন ঘটাবে? ইংরেজ সৈন্য দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের ডেকে আনি, তাদের সাহায্য কিনে নি। তারাই আমাদের হয়ে সিরাজকে অপসারিত করবে। কিন্তু তাদের সৈন্য তো মুষ্টিমেয়। হোক মুষ্টিমেয়, কিন্তু আমি মিরজাফর, সিরাজের সেনাপতি, কথা দিচ্ছি, সিরাজ আক্রান্ত হলে আমি আমার অধীনস্থ সেনাবল নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকব, ইংরেজকে বাধা দেব না, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না। দুর্দান্তকে ভ্রষ্টরাজ্য করা নিয়েই কথা, কী উপায়ে সেটা করা হচ্ছে সেই জিজ্ঞাসা অবান্তর।

সকলে একবাক্যে মিরজাফরকে সমর্থন করল।

'রানীর কী মত?' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাটোরের রানীভবানীকে জিজ্ঞেস করলে।

'রানীর কী মত!' রানীভবানী গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে ঋজু হয়ে বসল। ঋজু কণ্ঠে বললে, 'আমার মত হচ্ছে আপনারা নিজেরা বিদ্রোহী হয়ে সম্মুখ সমরে আহ্বান করুন নবাবকে। এভাবে ইংরেজকে ডাকতে যাবেন না। ওরা বাণিজ্য করতে এসে রাজ্য বিস্তার করতে বসেছে। দেখা যাচ্ছে ওদের রাজ্যই বাণিজ্য। ওদের প্রশ্রয় দেবেন না। ওদের বিশ্বাস করবেন না। ওরা সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করেই শান্ত হবে না, বরং রাজ্যপিপাসায় উন্মত্ত হবে। রক্তের স্বাদ পেয়ে

বাঘ যেমন ক্ষিপ্ত হয় তেমনি দুর্বার হয়ে উঠবে ওরা। বঙ্গের সিংহাসনে ওরাই রাজা হয়ে বসবে, কেউ আর সহজে পারবে না ওদের হটাতে।'

রানীর মত, রমণীর মত কে আর গ্রহণ করে? কিন্তু, প্রশ্ন করি, সিরাজ দূর হয়ে যাবার পর কে বসবে মসনদে?

কে আবার! মিরজাফর বসবে। সকলে এক কণ্ঠে রব তুলল।

মিরজাফর! মিরজাফরও বুঝি সেই স্বপ্নেই রঙিন ছিল। কিন্তু পরপিণ্ডপ্রত্যাশী ইংরেজ যে কত বড় প্রবঞ্চক তা তার তখন জানা ছিল না।

'আরেকটা মিথ্যার স্তম্ভ ড্যালহৌসি স্কোয়ারের হলওয়েল মনুমেণ্ট।' সুভাষ বললে দৃঢ় কণ্ঠে: 'বলে কিনা অন্ধকূপ হত্যা। দাসত্বের পঙ্কে ফেলে সমস্ত দেশকে অন্ধকূপ করে তিল-তিল করে যারা হত্যা করছে তাদের কলঙ্কের ইতিহাসটা তো মিথ্যে নয়, সেটা তো একেবারে চোখের উপর প্রত্যক্ষ। সুরেশদা, তুমি দেখো,' সুভাষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'আমি এই হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে দেব।'

সুরেশ হেমন্তকে ডাকল: 'নে, পলাশীর যুদ্ধ থেকে আবৃত্তি কর।'

হেমন্ত উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল:

দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ
যদি ভঙ্গ দেও রণ'—
গর্জিলা মোহনলাল—'নিকট শমন॥'
সেনাপতি! ছি ছি এ কি। হা ধিক তোমারে
কেমনে বল না হায়
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?

ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয় ?
মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি কহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়
কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ॥'

সুভাষের চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল।

সবাই মিলে চলে এল মুর্শিদাবাদ।

'এই খোসবাগ।' বললে হেমন্ত, 'এই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সমাধি!'

'যিনি একদিন বাংলা বিহার উড়িষ্যার সম্রাট ছিলেন, ইংরেজ বেনেদের উচ্ছেদ করবাব জন্যে প্রাণপণে লড়েছিলেন এই তাঁরই ধূলিশয্যা।' সুভাষ মমতানিবিড় চোখে তাকিয়ে রইল।

মিবজাফর বলো, ইয়ার লতিফ বলো, রাজবল্লভ বলো, সবাই নবাবীর জন্যে ব্যস্ত—রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে নয়, দুর্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্যে নয়, প্রজার শান্তির জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে।

সিরাজ বলছে তার মন্ত্রীদের, 'আমাকে শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি শত্রুই হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাংলার শত্রু নই। যদি আপনাদের বিসর্জন দেওয়া আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্তে আমি আর কোনো বাঙালিকেই রাজকার্য প্রদান করব। অর্থাৎ আপনাদের কোনো আত্মীয়স্বজন স্বদেশীই নির্বাচিত হবে। বাঙালির পরিবর্তে বাঙালিই রাজকার্য পাবে।'

মিরমদনকে বলছে সিরাজ, 'মিরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো হিন্দু-মুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়,

উচ্চ স্বার্থে চালিত হয়ে, সাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে নিজের মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা বিদ্বেষ নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশ-বাসীর অপমান নিজের অপমান জ্ঞান করে, তবেই আশা, নতুবা সব নিষ্ফল।'

সুরেশ বললে, 'আর এই লুৎফার সমাধি। সেই লুৎফা—যে প্রতি সন্ধ্যায় সিরাজের সমাধির উপর দীপ জ্বেলে দিত, দুটি ফুল এনে রাখত।'

'দাঁড়ান, আমি ফুল এনে দিচ্ছি।' সুভাষ গেল ফুলের অন্বেষণে।

হেমন্তকে 'পলাশীর যুদ্ধ' আচ্ছন্ন করে রেখেছে। থেকে-থেকে টুকরো-টুকরো লাইন সে আবৃত্তি করে চলেছে:

'আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ-আশা গেল পরিহরি।'

কটি বনফুল তুলে এনেছে সুভাষ। ফুল কটি রাখল সে সিরাজ আর লুৎফার সমাধির উপর।

বেলা ঢলে পড়েছে। সূর্য যাই-যাই করছে।

হেমন্ত আবার আবৃত্তি শুরু করল:

'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।
এ বিষাদ অন্ধকারে নির্মম অন্তরে
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন।'

সুরেশকে লক্ষ্য করে বললে, 'ফেরবার সময় কিন্তু নৌকো নেব সুরেশদা।'

সুভাষ হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলে, 'এ সমস্তর প্রতিকার কী?'

হেমন্ত তখনো পলাশীর যুদ্ধ থেকেই আবৃত্তি করছে:

'প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর।'

কিন্তু আসলে বোধহয় সুভাষকে অপোগণ্ড মনে করেছে। তাই নৌকো করে ফেরবার সময় সে সুরেশকে বললে, 'সুরেশদা, কিছু খেয়ে গেলে হত, সুভাষের খিদে পেয়েছে।'

সুভাষ লজ্জিত মুখে তাড়াতাড়ি বললে, 'মোটেই খিদে পায় নি।'

'জানেন সুরেশদা, ছেলেবেলায় খিদে পেলে সুভাষ মুখ ফুটে কখনো তা বলত না, হাতের বুড়ো আঙুল চুষত। সারদা-ঝি বুঝতে পেরে তখুনি খাবার নিয়ে আসত। দেখুন ও এখন আঙুল চুষছে। ওর খিদে পেয়েছে।' হেমন্ত হাসতে লাগল।

'মোটেই আঙুল চুষি নি। খিদে পায় নি।' সুভাষ করুণ মুখে বললে।

'খিদে পায় নি তো একটা গান গাও।'

'এই কথা? বেশ গাইছি, কিন্তু তুমি?'

'আমি পরে গাইব।'

গঙ্গার উপরে প্রাণ-ঢালা জ্যোৎস্না পড়েছে। কী বিরাট শান্তি—স্তব্ধতা। ছপ ছপ করে দাঁড় পড়ছে। নৌকো চলেছে। যেন কোন এক উদার উদয়-পথে যাত্রা করেছে তারা।

সুভাষ গান ধরল:

> 'দূরে হের চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত গঙ্গা
> ধায় মত্ত হরষে সাগর পদ পরশে
> কূলে কূলে করি পরিবেশন কল্যাণময়ী বরষা
> শ্যাম ধরণী সরসা॥'

এ যেন জীবনের আরেক দিক, আরেক সুর। পার্থিবের নয় আকাশের। সমস্ত দ্বন্দ্ব দ্বেষ শোষণ শাসন অপমান অত্যাচারের বাইরে এ যেন গভীর কোনো প্রসাদ বা প্রশান্তির আশ্রয়। জীবনে যখন কিছুই পাওয়া যায় না, কিছুই হয়ে ওঠে না, তখন একমাত্র আকাশই বলে আমি আছি। আকাশই তো এক মূর্ত মহান অস্তিত্ব। যদি বিশ্বে ধ্রুব বলে কিছু থেকে থাকে তবে তা

আকাশ। সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে আছে বলেই এত অপরূপ। সমস্ত দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ক্ষমা, সমস্ত যন্ত্রণার উর্ধ্বে শান্তি, সমস্ত সংগ্রামের উর্ধ্বে নির্বেদ, বৈরাগ্য।

কী হবে এসব হানাহানির মধ্যে গিয়ে? সমস্ত অসার, অনিত্য। জীবনের আসল বৈভব বৈরাগ্য।

গান গাইতে গাইতে নিজেই কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল সুভাষ। কোথায় পলাশী, কে বা সিরাজ! আকাশ বলছে উদয়-বিলয়ের উর্ধ্বে শাশ্বত হয়ে যে প্রকাশিত তারই সন্ধান করো। সমস্ত ইতিহাসের চেয়েও বড় সেই মহাকাল, সেই মহাকবি।

কিন্তু দেশের এই ডাক এই কান্নার কাছেও বা কী করে বধির হয়ে থাকি?

উনিশ শো তেরো সালে আরো কতগুলো বিপ্লবকাণ্ড ঘটে গেল। মৌলভী বাজারের এস. ডি. ও. গর্ডন আই. সি. এস. ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছিল। সিলেটের যোগেন চক্রবর্তী ঠিক করল ওকে শেষ করবে। সন্ধেয় সার্কিট হাউসে ডিনার আছে, সেখানে নিশ্চয়ই গর্ডন আসছে এই ভেবে যোগেন গেল সার্কিট হাউসে। তার জামার এক পকেটে বোমা আরেক পকেটে রিভলভার। গিয়ে শুনল গর্ডন সেখানে নেই, এখনো পৌঁছয় নি। তবে, যোগেন বিবেচনা করল, তাড়াতাড়ি তার বাংলোতে পৌঁছুতে পারলেই কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। একা গর্ডনকেই তো সে মারতে চায়, ডিনার টেবিলে বোমা ছুঁড়লে দু-চারজন নিরীহও অকারণে জখম হতে পারে। নিরীহকে মেরে আনন্দ নেই। তাড়াতাড়িই চলল যোগেন। তাড়াতাড়িই চাইল গর্ডনের বাংলোর বেড়া টপকাতে। আর বেড়া টপকাতে গিয়েই পড়ে গেল মাটিতে। আর পড়ে যেতেই পকেটের বোমা দারুণ শব্দে ফেটে গেল। প্রাণ হারাল যোগেন।

নিরীহকে মারতে নিয়তির এতটুকু বাধল না।

অত্যাচারী কি কেবলই ফসকে যাবে? না, পুলিস ইনস্পেক্টর

নৃপেন ঘোষের সহচর হেড কনস্টেবল হরিপদ দে খুন হল। কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে যেখানে-যেখানে যুবকদের জটলা সেখানে-সেখানে সে ঘোরাফেরা করছিল আর নজর রাখছিল। তাকে দিতে হল তার নজর রাখবার নজরানা। হঠাৎ তিনটি ছেলে একেবারে তার গায়ের উপর এসে পড়ল, আর তার উপর তিন-তিনটে গুলি মারল। এক জনই তিনটে মারল, না, তিন জনেই একটা করে, তা কে বলবে। যাও তোমার নৃপেন ঘোষকে খবর দাও গে। আর খবর! হরিপদ চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। আততায়ী ধরা পড়ল না।

ময়মনসিঙে পুলিশ ইনস্পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরির উপর বোমা ফেলা হল। অনেক যুবককে গয়া পাঠাবার বন্দোবস্ত করে সন্ধ্যান্তে বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় বসে হুঁকো টানছিল—তামাকের আরামে চোখ স্তিমিত হয়ে এসেছিল বোধহয়—দুর্দান্ত বোমা ফাটল পায়ের কাছে। উড়ে গেল বঙ্কিম। আততায়ী নিরুদ্দেশ। হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা বৃথা গেল।

কিন্তু নৃপেন ঘোষের বেলায় ধরা পড়ল নির্মলকান্ত রায়। হ্যাঁ, দুর্ধর্ষ নৃপেন ঘোষও লোকান্তরিত।

উনিশ শো চোদ্দর উনিশে জানুয়ারি। রাত আটটা বেজে আট মিনিট। চিৎপুর আর গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে পুলিসপুঙ্গব নৃপেন ঘোষকে কে গুলি করলে। সি আই.ডিদের খাস আস্তানা স্বর্গ-বীথিতে, অর্থাৎ ইলিসিয়াম রো-তে। সেখান থেকে কর্তব্যশেষে বাড়ি ফিরছিল নৃপেন, ট্রাম থেকে নামতেই একেবারে তার খুলির উপর গুলি পড়ল, এক গুলিতেই সমাপ্ত।

পুলিসের লালবাজার বিষাদে কালো হয়ে গেল আর বিপ্লবীদের নৈরাশ্যপাণ্ডুর মুখ উৎসাহে লাল হয়ে উঠল।

লোকে লোকারণ্য জায়গা, গাড়িঘোড়ায় ছয়লাপ, তবু পুলিস আততায়ী বলে ধরল একজনকে। তার নাম নির্মলকান্ত রায়।

হাতেনাতে আততায়ী ধরা পড়েছে, পুলিসের তখন এই গর্ব। বিচারের আগেই দরবার হয়ে গেল গড়ের মাঠে। যে পুলিসের লোক ধরেছে ও পথচারী যারা পুলিসকে ধরতে সাহায্য করেছে, দরবারে তাদের সবাইকে সরকার পুরস্কার দিলে। পুরস্কার বিতরণ করলেন স্বয়ং লাটসাহেব, লর্ড কারমাইকেল।

এ শুধু পরোক্ষে জুরিকে উচ্চনাদে জানিয়ে দেওয়া, দেখ, চিনে রাখো কে সত্যি আততায়ী।

কিন্তু বিচারে কী হল? হ্যাঁ, হাইকোর্টে দায়রা-বিচার, জুরির বিচার। জুরি নির্মলকান্তকে নির্দোষ বললে।

নির্মলকান্তের পক্ষে সি আর দাশ, জে এন রায়, লোকেন পালিত—সর্বোপরি নর্টন। আলিপুর বোমার মামলায় যে নর্টন সরকারপক্ষে কৌঁসুলি ছিল সে এ মামলায় আসামীর পক্ষে। উকিলের যখন যেমন তখন তেমন। আইনের ভেজালে বার করে আনলে আসামীকে।

জুরি নির্দোষ বললেও জজের গোসা যায় না। জুরি বাতিল করে দিয়ে সে অন্য জুরি নিয়ে পুনর্বিচারে বসল। পুনর্বিচারেও নির্দোষ।

হৈ-হৈ ব্যাপার। পুরস্কৃত পুলিস কাঁদতে বসল বিজনে।

শেষকালে সরকার মামলা তুলে নিলে। নির্মলকান্ত অমলকান্তই রইল।

আলিপুর বোমার মামলার পর নর্টন দিবারাত্র পুলিস-পাহারায় থাকত। কিন্তু এ মামলায় কোথায় পুলিস, কিসের পাহারা, নর্টন জনগণের চক্ষের মণি বক্ষের হার হয়ে উঠল। কালকের ফকির আজকে একেবারে আমির হয়ে বসল মনের সিংহাসনে।

রাসবিহারী বোস কী বলছে—এই বোমার আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে বারে বারে দেশের জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া কী মর্মান্তিক পরাধীনতায় তারা বাস করছে, কী লজ্জাকর অপমানের

মধ্যে, কী অসহায় পঙ্কিলতায়! যত বোমা তত পীড়ন তত লাঞ্ছনা।
আগুন দেখে-দেখে তারাও নিশ্চয়ই একদিন আগুন হয়ে উঠবে।
জ্বলতে জ্বলতে উন্মুক্ত বিদ্রোহে তারাও নিশ্চয় লেলিহান হয়ে উঠবে।

ধর্মের ভরা ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়। সুভাষ ভাবে ব্রিটিশের এ পাপের ভরা তল যাবে কবে?

তেরো

প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে সুভাষ এক নতুন বন্ধু পেল। দেখতে রাজপুত্রের মত। লেখা-পড়ায়ও কৃতী। আর কত বড় বাপের ছেলে! ছেলের সঙ্গে আলাপ হবার আগেই তাঁর কত গান সুভাষের মুখস্থ—কণ্ঠধৃত।

'দিলীপ! দিলীপ!' দিলীপের থিয়েটার রোডের বাড়িতে বন্ধ ঘরের দরজায় ঘা মারছে সুভাষ।

দিলীপ তো দরজা খুলে অবাক। 'এ কী, তুমি, সুভাষ? এই সকালে? বোসো, বোসো। কিসে এলে?'

'দিব্যি পায়ে হেঁটে।' চেয়ারে বসে মিষ্টি করে হাসল সুভাষ: 'আমাদের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তোমার এই থিয়েটার রোডের বাড়ি আর কতদূর?'

'উঃ, তা হলে কোন সকালে উঠেছ! তা মতলব কী? আজ কলেজে যাবে না?'

'কলেজে যাব বলেই তো সাত-তাড়াতাড়ি এসেছি, আর সেটা কলেজের প্রয়োজনে। অর্থাৎ কিনা কলেজের প্রয়োজনেই তোমাকে আমার দরকার।'

'বলেই ফেল কী দরকার!' দিলীপ আশ্বাসের হাসি হাসল।

'কলেজে যে ডিবেটিং সোসাইটি বা বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠিত করেছি তাতে তোমাকে আসতে হবে।'

'তোমার বিতর্ক সভার কথা শুনেছি,' এবার দিলীপ হাসল মিষ্টি করে: 'কিন্তু ভাই, ওসব তর্কাতর্কির মধ্যে আমি নেই।'

সুভাষ দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, 'কী বলছ, আমাদের মধ্যে, ছাত্রদের

মধ্যে, তর্কবিতর্কের অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। দেশে এখন বড়-বড় বক্তা আর তর্কযোদ্ধার বিশেষ দরকার। ভালো বক্তা থেকেই বড় নেতার আবির্ভাব হয়। বক্তৃতা থেকেই ব্যক্তিত্ব আসে। এখন আমাদের নেতার দরকার যারা সত্যিকার মুখপাত্র হবে, মুখর মুখপাত্র।'

দিলীপ স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'আমার জন্যে তর্ক নয়, আমার জন্যে বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস, এই বিশ্বাস আনবার জন্যেই তো তর্ক, বাক্‌যুদ্ধ। অযুক্তির খণ্ডন আর সুযুক্তির প্রতিষ্ঠা।'

'কিন্তু যাই বলো কথায় কিছু হবার নয়, কাজ চাই।'

'একশোবার কাজ চাই আর এই কাজের জন্যেই হাজারবার কথা চাই।' সুভাষ দৃপ্ততর হলঃ 'শুধু কথায় শুধু ভাবুকতায় আগুন জ্বালানো যায় না, আগুন জ্বালানো যায় কাজ দিয়ে আর সেই কাজের মধ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। সবচেয়ে বড় দান হৃদয়দান। নইলে তুমি কি মনে করো শুধু কথায়, শুধু বক্তৃতায় শুধু প্রার্থনায় দেশ স্বাধীন হবে?'

'দেশ তবে স্বাধীন হবে কিসে?' দিলীপ উৎসুক হয়ে উঠল।

'সশস্ত্র বিপ্লবে।' বিধূম পাবকের মত জ্বলে উঠল সুভাষ।

হৃদ্যতার আন্তরিক স্বরে দিলীপ জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু তুমি অস্ত্র পাবে কোথায়?'

সুভাষ এতটুকুও দ্বিধা করল না, যেন তার উত্তর বহুদিন থেকে তৈরি হয়ে আছে, তেমনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, 'এদেশে না পাই বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।'

স্বপ্ন—স্বপ্ন দেখছে সুভাষ। কিন্তু যে সত্য চোখের সামনে স্বপ্রকাশ হয়ে রয়েছে তার কথা সে বলছে না কেন? যিনি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি সেই জগজ্জ্যোতি জগৎপতির দিকে তার চোখ পড়ছে না?

'ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন ছাড়ো।' দিলীপ বললে স্বচ্ছমুখে, সানন্দস্বরে, 'যা তোমার সাধ্য, তোমার হাতের কাছে, তাই অর্জন করো।'

'কী সেটা?'

দিলীপ দৃঢ়স্বরে বললে, 'সন্ন্যাস।'

'সন্ন্যাস?' সুভাষ চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হয়ে লোকালয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো।' দিলীপও বুঝি স্বপ্নের ছবি আঁকল: 'কত দিন মনে মনে ছবি এঁকেছি আমি আর তুমি পথে ভিখিরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি—পরনে কৌপীন, গায়ে গেরুয়া, আমরা সন্ন্যাসী, গান গেয়ে পথে চলেছি—কৌপীন-বন্তৌ খলু ভাগ্যবন্তৌ—'

সুভাষ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল: 'গেরুয়া? রাজনীতি নয়, সন্ন্যাস? দেশের মুক্তি নয়, শুধু নিজের মুক্তি?'

দিলীপ গম্ভীর হয়ে বললে, 'ঈশ্বরপ্রেমে কোনো বাজারদর চলে না।'

'ঈশ্বরপ্রেম?' সুভাষ থমকে দাঁড়াল: 'কিন্তু মানুষকে ভালো না বেসে ঈশ্বরকে ভালোবাসব কী করে?'

দিলীপ মধুরতর কণ্ঠে বললে, 'ঈশ্বরকে ভালো না বাসলে মানুষকে ভালোবাসব কী করে?'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তুমি এস তো কলেজে।' সুভাষ বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

রাজনীতি না সন্ন্যাস? দেশের মুক্তি না নিজের মোক্ষ? থিয়েটার রোড থেকে এলগিন রোড শুধু এই চিন্তাই মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কী করি। কী করি! কী করা উচিত।

শুধু রাস্তাটুকু নয়, বাড়ি, কলেজ, অবসর অনবসর, সর্বক্ষণই এই চিন্তা—দেশের মুক্তি না নিজের মোক্ষ? কতবার সে মাকে বলেছে, মা, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও অমূল্য কেননা এই জীবনেই

ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব, কিন্তু আমি কত সময় অকারণে অপচয় করে ফেলেছি, আর বাকি সময়টুকুতে যদি না কুলোয়! শ্রীরামকৃষ্ণও তো বলছেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরলাভ। এ তো আমিও বিশ্বাস করি। তোমাকে মা, কতবার বলেছি, লিখেছি, ঈশ্বরকে না পেলে সব বৃথা—সব বৃথা, মানুষের জীবনই একটা বৃহৎ বিড়ম্বনা, অসহ্য ভার। আর তাঁকে পেতে হলে সাধনা চাই। সন্ন্যাসই ওই সাধনা।

দিলীপ ঠিকই বলেছে, ঈশ্বরপ্রেমে কোনো বাজারদর চলে না। ঈশ্বরের কাছে কোনো দেশ নেই, কাল নেই, বাবা-মা নেই, গৃহ, দেহ, বিত্ত, বিদ্যা কিছু নেই—সে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। তার কোনো বিকল্প নেই, তার বিরহ পূরণ করতে পারে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। এই তো শ্রীঅরবিন্দ ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দে চলে গিয়েছেন পণ্ডিচেরি—আর যা পেলে মানুষের আর কিছু পাবার থাকে না, কোনো আঘাতই বিচলিত করতে পারে না সেই উপলব্ধির আসন থেকে—সেই অমৃতফল আমার কাছে অনাস্বাদিত থাকবে? রবীন্দ্রনাথও তো রয়েছেন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে, ব্রহ্মভূমিতে, সেই ভূমি কি আমিও স্পর্শ করতে পারব না? যার প্রাণ চায় সে দেশের জন্যে লড়ুক, মরুক, আমি চলে যাই ঈশ্বরসাজুয্যে—আমার স্বদেশ ত্রিভুবন এই কথা বলতে।

হঠাৎ বিবেকানন্দের ছবির উপর দৃষ্টি পড়ল সুভাষের। ভারতবর্ষই একমাত্র আরাধ্য দেবতা—দেশমাতাই জগন্মাতা—এই আগ্নেয় মন্ত্র জ্বলে উঠল দিব্য চোখে। সত্যি তো এত যেখানে মানুষের দুঃখ, নিরন্নতা, সেখানে আমার একা-একা রাজভোগ—অমৃতভোগ খাবার কেন এত লালসা? এই যে রোজ বাড়ির সামনে ঐ ভিখিরিনিটাকে দেখি, পরনের ছেঁড়া সামান্য শাড়িটুকু গায়ে জড়াবার নিষ্ফল চেষ্টায় কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ফুটপাথের ধারে পড়ে আছে, তখন মনে হয় ওর এই দুঃসহ দারিদ্র্যের সামনে ঈশ্বরনামক

অবাস্তব অমৃত-আস্বাদে আমার অধিকার কোথায়? আমি যে আমার প্রাসাদোপম বাড়িতে বাস করি, শুধু আমি কেন, যে সব সন্ন্যাসী তাদের আরামরমণীয় মঠে বা শীততাপনিয়ন্ত্রিত সজ্জিত-ভবনে দিন কাটায়—আমরা সবাই ওই ভিখিরিনির বিচারালয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধী। ঐ দারিদ্র্যমোচনের আগে কিসের আমাদের মোহমোচন। সমস্ত দারিদ্র্যের মূল কারণই হচ্ছে পরাধীনতা। এই পরাধীনতা উৎখাত করবার আগে আমার আবার ঈশ্বর কী, কিসের সাধনভজন!

স্বামীজি, পথ দেখাও। ডাক পাঠাও। আলো জ্বালো।

বলো আমি সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে যাব? নিজেকে একটা স্পর্ধিত আত্মতৃপ্তির বিবরে গুটিয়ে ফেলব? মেটারনিটি হোম খুলে প্রসূতি ভর্তির তদারক করব? রাত্রে উঠে শুনব শুধু মাতৃযন্ত্রণার চিৎকার? সরকারের দালাল হয়ে স্কুল আর হাসপাতাল চালাব, এদিক-ওদিক কম-বেশি করে হিসেব লিখব? বলো এই কি তোমার 'আত্মানাং মোক্ষার্থং'-এর চেহারা, না কি এই 'জগদ্ধিতায়'-এর রূপ? আমাকে কি শুধু দীক্ষিত করেই ছেড়ে দেবে, শিক্ষিত করবে না? স্বামীজি, আমাকে এই অশিক্ষিতসাধুত্ব থেকে ত্রাণ করো, আমাকে পথ দেখাও।

কিন্তু দেশের জন্যে সংগ্রাম করেও বা কী করতে পারব আমি? যে সমাজব্যবস্থায় ঐ ভিখিরিনি ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে আর আমি আমার অট্টালিকায় আর সন্ন্যাসী তার বিলাসভবনে, সে সমাজব্যবস্থা পালটাতে পারব আমি? দেশময় যে এত জাতিভেদ, দলাদলি, প্রাদেশিকতা, মতানৈক্য, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা—আমি পারব সংশোধন করতে? পরাধীনতার বোঝা টেনে-টেনে যে মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে, আমার কী সাধ্য তাকে সোজা করি? আমার কী স্পর্ধা যে অন্যের চরিত্রশোধনের ভার নিই?

না, দিলীপ ঠিকই বলেছে, ঈশ্বর দুর্লভ হয়েও সুলভ, সমস্ত

নাগালের ঊর্ধ্বে থেকেও আমার হাতের মধ্যে। ঠিকই বলেছে ঈশ্বরে কোনো বাজারদর চলে না, আর ত্যাগ না করলে সেই অমৃতে অধিকার নেই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব-মানশুঃ'। পিঞ্জর থেকে যেমন কেশরী পালায় তেমনি এই পরিব্যাপ্ত জগৎ-জাল থেকে বেরিয়ে যাব। ঈশ্বর পেয়েছি, সেই সর্বতো-নিরাবরণ প্রশান্ত সুধাব্ধিকল্প পরমানন্দময় মহদাত্মভাবে লীন আছি এ জানলে কেউ কিছু বলতে আসবে না, সমস্ত ন্যূনতার পূরণ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হব।

কৃষ্ণনগরে হেমন্ত সরকারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল সুভাষ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই, হেমন্তকে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেবার আগেই, বলে উঠল, 'আমি সন্ন্যাসী হব ঠিক করেছি। চলো বেরিয়ে পড়ি।'

উদার বন্ধুতায় সুভাষের হাত ধরল হেমন্ত। সহাস্য মুখে বললে, 'আমি তো তৈরি। কিন্তু তোমার বাড়ির লোক জানে?'

'আন্দাজ করবে হয়তো কিন্তু আমাকে পাবে কোথায়? ধরবে কী করে?' সুভাষ নির্মুক্তির আনন্দে বললে, 'আমি মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আর ফিবব না।'

'তা হলে আব দেবি কেন?' হেমন্ত যেন একমাঠ খোলা হাওয়ার সুর আনল: 'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'প্রথমে কোথায় যাব বলো?' সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'হরিদ্বার?'

'আগে ইন্দ্রদাস বাবাজির কাছে চলো।'

'তিনি কে?'

'উদাসী সম্প্রদায়ের শিখ সন্ন্যাসী।' হেমন্ত প্রশংসামুখর হয়ে উঠল: 'চলো দেখবে কেমন নিরাসক্তভাবে আছেন। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাইরে আকাশের নিচে থাকেন। ভিক্ষেয় বেরোন না কোনোদিন। যদি কেউ কিছু ফল-মূল এনে দেয় তো খান, না দেয় তো উপোস করে থাকেন।'

'চলো সন্ন্যাসীর শিষ্য হই গে।' সুভাষের যেন তর সইছে না, বললে, 'কিছু একটা না ধরতে পারা পর্যন্ত স্থির হতে পারছিনে।'

হেমন্ত বললে, 'এই তো ট্রেন থেকে নামলে, এখুনি যাবার কী হয়েছে? পরে, স্নানাহার করে—'

'না, না, এখুনি নিয়ে চলো।'

দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধারে একটা গাছের কাছে এসে থামল হেমন্ত। বললে, 'ঐ দেখ।'

সুভাষ দেখল একজন সন্ন্যাসী মাটিতে শুয়ে আছেন আর একটা সাপ তাঁর গায়ের উপব দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সাধুর তিলমাত্র চাঞ্চল্য নেই। কী যেন বিষঘ্ন গুণ আছে সাধুব যাতে দুষ্টমুখ সাপও নিরীহ হয়ে যেতে পারে।

ক্ষণকালের জন্যে দুই বন্ধু বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সাধু তাদের ইশারায় ডাকল। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই? কোনো বিমাবের ওষুধ?'

হেমন্ত বললে, 'না, ওষুধ দিয়ে আমাদের কী হবে? আমরা আপনাব শিষ্য হতে চাই।'

'শিষ্য হতে চাও?' ইন্দ্রদাস হেসে উঠল: 'শিষ্য হয়ে কী হবে? কী শিখবে?'

এবার সুভাষ এগিয়ে এল। প্রণাম করে বললে, 'আমাদের আপনার মত ভয়বর্জিত হতে শেখান। বিপদেও যেন বিচলিত না হই। আর আপনার মত সমস্ত পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষাকে যেন তুচ্ছ করতে পারি।'

সাধু স্নিগ্ধ চোখে তাকাল। কী প্রশান্ত সদয় চক্ষু। যেন শুধু পরহিতের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভরা। বললে, 'তা প্রথম দর্শনেই কি শিষ্য হওয়া চলে? কদিন আসা-যাওয়া করো, আমার সঙ্গ করো, আমাকে দেখ, আমিও তোমাদের দেখি, বুঝি—পরে শিষ্য হতে চাও, শিষ্য করে নেব।'

'সেই ভালো কথা।'

তবু কতক্ষণ সাধুর সান্নিধ্যে দু বন্ধু বসে রইল নীরবে।

শুক্লারাত্রির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কী আনন্দদায়ক, লোকালয়ের উপকণ্ঠে বনানীসংলগ্ন প্রান্তরগুলি যখন সবুজ ঘাসে ঢাকা পড়ে তখন কী তাদের নয়নরুচিকর শোভা! বিদুৎ-সমাগমে চিত্তে যে নির্মল সুখ পাওয়া যায়, কাব্যে-সাহিত্যে যে কথারস অনুভব করা যায় তাও কত অভিনন্দনীয়। আর কৃত্রিম কোপে অশ্রুবিন্দুশোভিত প্রিয়ামুখচ্ছবিও কত দর্শনসুভগ। জীবনের বিচিত্র গতি-পথে ধরিত্রীর দিকে-দিকে কত রূপ কত রস কত আনন্দ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, তবুও, এখনও সময় আসে যখন এই সব কিছু সম্পর্কেই এক অলঙ্ঘ্য অনিত্যতাবোধ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। তখন মনে হয় কোনো কিছুরই যেন মূল্য নেই, আকর্ষণ নেই।

রম্য হর্মতলে বাস করা সুখকর নিশ্চয়, নিভৃতে অবসর-সময়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রিয়জনসঙ্গে গীতবাদ্য-উপভোগও তৃপ্তিপ্রদ। প্রাণসমা প্রিয়ার সমাগমসুখ যে অতিকাম্য তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু, তবুও, এমনও সময় আসে যখন মনে হয় সব কিছুই অস্থির— যেন রূপমুগ্ধ পতঙ্গের পাখার বাতাসে আন্দোলিত দীপশিখারই একটি ক্ষণিক ছায়া! তাই তো এই অনুভূতির ফলে জীবনের সব আকর্ষণ পিছে রেখে সন্তগণ অতি-জীবনের অনশ্বর সত্য ও পূর্ণতা লাভ করতে গৃহ ছেড়ে অরণ্যের কৃচ্ছ্রকেই বরণ করে নিয়েছেন।

এদিকে সুভাষের তিরোধানে এলগিন রোডের বাড়ি তোলপাড়। সারাদিন আত্মীয়স্বজনদের ব্যস্ত চলাফেরা—সুভাষের খবর নেই। সুভাষ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

প্রভাবতী কাঁদ-কাঁদ মুখে বললেন, 'আমাকে একবার দেওঘরের রামানন্দস্বামীর কথা বলেছিল। তুমি সেখানে টেলিগ্রাম করো।'

জানকীনাথ বললেন, 'আগে তো একবার হরিদ্বারের কথা বললে।'

'সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে—হ্যাঁ, সেখানে টেলিগ্রাম করো।'

'রামকৃষ্ণ মিশন তো কত জায়গায়ই আছে।'

'সব জায়গায়ই টেলিগ্রাম করো। সুবি যে রামকৃষ্ণের খুব ভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তার নিষ্ঠা।'

'তা তো জানি।' জানকীনাথ বিচক্ষণের বুদ্ধিতে বললেন, 'কিন্তু টেলিগ্রাম করে লাভ হবে না। ও জানতে পেরে আবার সেখান থেকে পালাবে। এক, যদি লোক পাঠানো যায়, সে যদি ধরে-বেঁধে নিয়ে আসতে পারে।'

'তবে তাই পাঠাও।' প্রভাবতী আকুল হয়ে উঠলেন।

'সব জায়গায় কি লোক পাঠানো সম্ভব?'

কাঁদতে-কাঁদতে সারদা-ঝি এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তাকে দেখে প্রভাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন: 'এ কী, কী হল? তুই কাঁদছিস কেন?'

'আমি রাস্তাঘাট খুঁজে এলাম—সেই গড়ের মাঠ পর্যন্ত—কোথাও সুবিকে দেখতে পেলাম না।'

প্রভাবতী বিমূঢ় হয়ে গেলেন: 'ওমা কী সর্বনাশ! তুই খুঁজতে বেরিয়েছিলি কী! তুই কলকাতার রাস্তাঘাটের কী জানিস?'

'কিন্তু সুবি বাড়ি নেই', সারদা ঝি আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল: 'আমি যে টিকতে পাচ্ছি না। তাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম—'

'শেষে তুই হারিয়ে যা, তোকে আবার তখন খুঁজতে বেরোক।'

সারদার বুঝি তাতেও আপত্তি নেই, বললে, 'সুবি থেকে আমি হারিয়ে গেলে তো ভালো ছিল।'

বাইরে যারা জটলা করছিল তাদের লক্ষ্য করে জানকীনাথ ডাকলেন: 'শরৎ!' আর শরৎ আসতেই জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কী করতে বলো?'

শরৎ বললে, 'বেলুড় মঠে খোঁজ করতে পাঠিয়েছি, মামা দেওঘর রওনা হয়ে গিয়েছেন, বলেন তো হরিদ্বারে কাশীতে টেলিগ্রাম করি।

কিন্তু আমার মনে হয় খোঁজাখুঁজিতে কিছুই হবে না, যদি ফিরতে হয়, ও নিজের থেকেই ফিরবে।'

'আমিও তো তাই বলি।' জানকীনাথ তাকালেন প্রভাবতীর দিকে : 'কিন্তু তোমাদের মা যে মানেন না।'

ওদিকে ইন্দ্রদাস বাবাজিও মানতে রাজি নন।

কতদিন কত বার তাঁর কাছে সুভাষ আর হেমন্ত যাওয়া-আসা করছে অথচ বাবাজি কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। আজ তুই বন্ধুতে ঠিক করেছে একেবারে সাধুর চরণ চেপে ধরবে, আর ছাড়ানছোড়ান নেই, শিষ্যত্বে দীক্ষা নিতেই হবে জোর করে।

তুই বন্ধু দ্রুতক্ষেপে পা চালাল।

নদীর ধারে সেই গাছের তলায় এসে দেখল বাবাজি তাঁর বিরাট কমণ্ডলু আর সামান্য একটি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন।

'এ কী, আপনি এভাবে বসে আছেন?' সুভাষ জিজ্ঞেস করলে।

'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছেন—সে কী?'

'তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে বলে অপেক্ষা করছি।' বাবাজির স্বর আর্ত।

'কিন্তু চলে যাবার কারণ কী? কিছু হয়েছে?' হেমন্ত এগিয়ে এল।

'কিছু হয় নি।' বাবাজি উঠে দাঁড়ালেন : 'শুধু তোমাদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। এমন মায়া, দেখ, তোমাদের শেষ দেখা না দেখে যেতে পাচ্ছি না। মায়া ভালো না। মায়ার বন্ধন কাটবার জন্যে ঘর ছেড়েছি, আবার পথে বেরিয়ে এই মায়া! আমি তো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আবার মায়া কী! এক বৃক্ষের ছায়ায় তিন দিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই। শেষকালে ঐ ছায়ার মায়ায় মন মজে—'

সুভাষের চোখ ঠেলে অশ্রু আসতে চাইল। বললে, 'আপনি আমাদের শিষ্য করবেন বলেছিলেন—'

ইন্দ্রদাস ম্লান রেখায় একটু হাসলেন: 'দেখলাম আমি গুরু হবার উপযুক্ত নই। তোমাদের গুরু অন্যত্র আছেন—'

কোথায় গুরু? কে তার খবর এনে দেবে?

'সুবির কোনো খবর পেলি?' প্রভাবতী শরতের ঘরে এসে ঢুকলেন।

'কই কিছু পাচ্ছি না তো—'

'আর কোনো খবর চাই না। শুধু সে বেঁচে আছে এই খবরটুকু এনে দে।'

শরৎ বিস্ময়াবিষ্ট মুখে বললে, 'শুধু বেঁচে থাকার খবর?'

'হ্যাঁ, তাই। ও বেঁচে আছে শুধু এই খবরেই সকলে বেঁচে থাকবে। ও না ফিরতে চায়, না ফিরুক, শুধু ও বেঁচে থাক।'

সুদীর্ঘ স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলাম। মায়াকৃত জন্মজরামৃত্যুতে পরিবেষ্টিত হয়ে সংসারারণ্যে কত না ঘুরে বেড়িয়েছি, দিনের পর দিন কত না সন্তাপে ক্লিষ্ট হয়েছি, অহঙ্কার-ব্যাঘ্র কত না আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, হে গুরুদেব, আজ তুমি তোমার অপার কৃপায় আমার সেই গাঢ় মোহনিদ্রা ভেঙে দিলে, বাঁচালে আমাকে।

সুভাষের গুরু কোথায়? কে সে হৃদয়রঞ্জন?

চোদ্দ

হরিদ্বারে এসেছে দুই বন্ধু, সুভাষ আর হেমন্ত। তাদের দুজনের পরনেই গেরুয়া।

অনেক হেঁটেছে দুজনে, যা দেখবার সব দেখেছে। কিন্তু যা পাবার তা এখনো পায় নি। মাঝের থেকে দারুণ খিদে পেয়ে গেছে।

হেমন্ত থামল। বললে, 'এবার খাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

সুভাষ আয়াসলেশহীন মুখে সুন্দর হাসল।

'তোমার তো শুধু সাধু খুঁজে বেড়ানো, গুরু পাওয়া যায় কিনা।' হেমন্ত টিটকিরি দিল: 'কিন্তু যাই বলো খালি পেটে ধর্ম হয় না।'

'না, না, চলো, ঐ—ঐ বুঝি একটা হোটেল দেখা যাচ্ছে।' সুভাষ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

হোটেলের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়াল দুজন।

বৃহদ্বপু ম্যানেজার বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে: 'আপনারা সন্ন্যাসী?'

হেমন্ত বললে, 'হ্যাঁ, দেখছেন না পোশাক?'

'তা তো দেখছি। কিন্তু সন্ন্যাসীরা কি হোটেলে খায়?'

'কেন খাবে না? বাধা কী?' হেমন্ত উদার গলায় বললে, 'তাদের তো কোনো সংস্কার নেই।'

'আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে মানি।' বললে সুভাষ, 'তিনি সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে ছিলেন।'

'আপনারা তো বাঙালি।' ম্যানেজারের কটাক্ষে যেন একটু বিদ্বেষের রেখা পড়ল।

'হ্যাঁ, বাঙালি।'

'আপনারা মাছ খান?'

'খাই।'

'আপনাদের এখানে খাওয়া চলবে না।' ম্যানেজারের স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল।

'চলবে না। কেন?' সুভাষের স্বরও কঠোর শোনাল।

'মাছখেকো বাঙালিদের এখানে খেতে দেওয়া হয় না।'

'আমরা তো আর এখানে মাছ খাচ্ছি না, খেতে চাইও না—'

'তা হলেও না। মাছখেকোদের স্থান নেই এ হোটেলে।'

হেমন্ত রফা করতে চাইল। জিজ্ঞেস করলে, 'যদি এখান থেকে খাবার কিনে নিয়ে খাই?'

'হ্যাঁ, তা কিনে নিতে পারেন কিন্তু এখানে বসে খেতে পাবেন না।' ম্যানেজার বললে নির্দয়ের মত: 'আপনাদের নিজের বাসনে করে নিয়ে খাবেন, আমাদের বাসন ব্যবহার করতে পারবেন না।'

হেমন্ত পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করল। বললে, 'কী আর করা, শালপাতার ঠোঙায় করে কিনেই নিই তবে—'

সুভাষ বাধা দিল। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'না, এ হোটেলের ভাত খাব না।'

আবার রাস্তায় নামল দুজন।

'ভাত তো খেলে না, এখন থাকবে কোথায়?' হেমন্তর রাগ হল।

'চলো, আশ্রম একটা মিলে যাবে কোথাও।' সুভাষ বললে গাঢ় স্বরে, 'সেখানে সাধুসঙ্গও হবে আর ভগবান যদি দয়া করেন গুরুও পেয়ে যেতে পারি।'

'আর গুরু!' হেমন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'খুব হোটেল পেয়েছ, এবার একটা আশ্রম পাও—তবে তো!'

চলতে-চলতে দু'বন্ধু পেয়ে গেল আশ্রম। অনেক সাধুর আস্তানা। এখানেই মিলে যেতে পারে সেই মানুষরত্ন।

'আমরা এখানে থাকতে পাব?' জিজ্ঞেস করল হেমন্ত।

সাধুদের মধ্যে যিনি বর্ষিষ্ঠ, প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা বাঙালি?'

'হ্যাঁ' বলতে যেন কত গর্ব এমনি করেই সুভাষ বললে, 'আমরা বাঙালি।'

'ওরে ব্বাবাঃ।' শুধু বর্ষিষ্ঠ নন কনিষ্ঠ সাধু পর্যন্ত ভয়স্তব্ধ।

'কেন বাঙালিদের ভয় কিসের? তারা মাছখেকো?'

'না, তারা বোমা ছোঁড়ে। তারা বিপ্লবী। ইংরেজকে তাড়াতে চায়।'

'কিন্তু আমরা তো বিপ্লবী নই।' হেমন্ত সাধু সাজল: 'আমরা সন্ন্যাসী।'

'অনেক বিপ্লবী গুলি-গোলা ছুঁড়ে পুলিসকে এড়াবার জন্যে সন্ন্যাসী সাজে।' মঠের সাধু বিরূপ হয়ে রইল: 'তোমরা সেরকম ছদ্মবেশী বিপ্লবী কিনা তা কে জানে।'

'আমরা বলছি আমরা ওরকম নই।' সুভাষের পক্ষে ধৈর্য রাখা কঠিন।

'তবু কে জানে বাপু পুলিস হাঙ্গামা হতে পারে—তোমরা অন্যত্র দেখ।' সাধু নিস্পৃহের মত বললে, 'আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।'

হেমন্ত হাঁক দিল: 'চলে এস সুভাষ।'

আবার দুই বন্ধু রাস্তা ধরল।

হেমন্ত বললে, 'আমাদের সেই ইন্দ্রদাস বাবাজির দশা হল। আকাশ ছাদ, ঘাসেব বিছানা শয়ন আর যদি জোটে তো আহার, না জোটে তো হরিমটর।'

'কিন্তু দেখলে,' সুভাষের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'সন্ন্যাস করতে এসেও বিপ্লববাদের কথা শুনছি।'

'উঃ, এই সমস্ত সন্ন্যাসী যদি সৈন্য হত!'

'আর সমস্ত সৈন্য যদি সাধু হত! ভগবান যাকে যে পথে নেবেন যে পথে ডাকবেন তাকে সেই পথেই যেতে হবে।'

হরিদ্বারে যে নিয়ে যাবে হরিদ্বারে সেই গুরু মিলল না। দুই বন্ধু মথুরায় এসে উপস্থিত হল।

উঠল পাণ্ডার বাড়ি।

দু'বন্ধুর আর কিছু জোটে নি, ঘরে বসে তরমুজ খাচ্ছে।

হেমন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'মথুরায় এসেও এই দশা!'

'নিরুপায়।' সুভাষও হতাশ মুখে বললে, 'পকেট গড়ের মাঠ।'

হঠাৎ একটা বানর ঘরে ঢুকে সুভাষের ক্যাম্বিসের জুতোর এক পাটি নিয়ে গেল।

'নিল, নিল, জুতো নিয়ে গেল।' চেঁচিয়ে উঠল সুভাষ। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল পাশের ছাদে জুতো সমেত বসে আছে বানর। যেন সংসারে কিছুই জানে না অমনি সদাশিবের চেহারা। ঘুরে দাঁড়াল সুভাষ। বললে, 'হেমন্ত, আর নয়, এবার ফিরে চল।'

'দাঁড়াও, এখুনি কী!' হেমন্ত মজা-দেখার মতো করে বললে, 'আগে দিল্লি যাই।'

'তাই চলো দিল্লি চলো।'

গোলমাল শুনে পাণ্ডা এসে উপস্থিত। কী হয়েছে?

হেমন্ত পাশের ছাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ঐ দেখ না তোমাদের পুষ্যিপুত্তুর ঐ বানর আমাদের জুতো নিয়ে গেছে।'

পাণ্ডা বললে, 'ওকে একটু তরমুজ খেতে দিন, এখুনি জুতো ফেরত দিয়ে যাবে।'

'মানে যা সামান্য তরমুজ জুটেছিল তাও তোমাদের পোষ্য-পুত্তুররা কেড়ে খাবে!' হেমন্ত বিদ্রূপ করে উঠল: 'সুন্দর ব্যবস্থা!'

সুভাষ কথা বাড়াতে চাইল না, হেমন্তকে বললে, 'মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই, বাকি তরমুজটা দিয়ে দাও বানরকে।'

পাণ্ডাই হেমন্তর হাত থেকে তরমুজ কেড়ে নিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে ছুঁড়ে মারল। বানর তরমুজ পেয়ে তক্ষুনি জুতো ফেরত দিয়ে গেল।

'জুতো তো পেলে,' হেমন্ত শুকনো মুখে বললে, 'কিন্তু খাবে কী? জুতো তো আর খাওয়া যায় না।'

'দেশের লোক তা বোঝে কই?' সুভাষ এগোতে চাইল: 'চলো বৃন্দাবনে যাই।'

তারপর দুবন্ধু বৃন্দাবনে গেল।

স্টেশনে নামতেই ছেঁকে ধরল পাণ্ডারা। কোথায় যাবেন? আমার কাছে আসুন। আমার সঙ্গে চলুন। ভালো ঘর দেব। খাওয়া ফার্স্ট ক্লাস।

সুভাষ স্পষ্টস্বরে বললে, 'আমরা গুরুকুল যাব।'

পাণ্ডারা সকলে কানে আঙুল দিল। বললে, 'ও নাম শোনাও পাপ। কোনো হিন্দুর সেখানে যাওয়া উচিত নয়।'

'কেন?' দু'বন্ধু তো অবাক।

'ওটা আর্যসমাজীরা করেছে।'

'তাতে কী?'

'আর্যসমাজীরা হিন্দু নয়। ওরা প্রতিমাপূজা মানে না।'

'তাতে কী?' সুভাষের কণ্ঠস্বর এবার রুক্ষ হয়ে উঠল।

'তাতে কি!' পাণ্ডার দল তো বিমূঢ়।

'আমাদের ছেড়ে দাও।' সুভাষ জোর গলায় বললে, 'আমরা গুরুকুলেই যাব।'

পাণ্ডার দল বিড়বিড় করতে করতে সরে পড়ল। তাদের অস্ফুট তর্জনের মধ্যে শোনা গেল বা প্রতিরোধের সংকল্প।

'কী, বৃন্দাবনের সাধ মিটল?' হেমন্ত সুভাষের গায়ে মৃদু ঠেলা মারল।

'পাণ্ডারা যেরকম চটেছে, মনে হচ্ছে মন্দিরে ঢোকা যাবে না।' সুভাষ বললে, 'কিন্তু চলো কুসুমসরোবর দেখে আসি।'

দু'বন্ধু চলেছে কুসুমসরোবরের পথে এক্কা চড়ে। এক্কাওয়ালা গান গাইছে।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্ধন
মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো বৃন্দাবন।

মুগ্ধ স্বরে সুভাষ বললে, 'হিন্দুস্থানী একাওয়ালার গলায় বাঙলা গান—কী মিষ্টি লাগছে!'

হেমন্ত বললে, 'বাঙলার মতো কি ভাষা আছে!' বলেই সেও গান ধরল। আর সুভাষও কণ্ঠ মেলাল সেই সঙ্গে :

'বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক
হে ভগবান।'

বৃন্দাবন থেকে আগ্রা, পরে কাশী, মাঝে গয়া আর গয়ার মঠে এসে পৌঁছুল দুজন। ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে, দলে-দলে পাত পেতে সকলে বসে গেছে খেতে।

তাদের দেখে মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন : 'আপনারা কাশী থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ, কী করে বুঝলেন?' হেমন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলে।

'সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ চিঠি লিখেছেন আমাকে। আপনারাই তো?'

'হ্যাঁ, আমরাই। আমরা ছাড়া আর কে?' হাসল হেমন্ত।

'তা আপনারা এখানেই থাকুন।' আতিথেয়তায় প্রসারিত হলেন অধ্যক্ষ : 'খাবার জায়গা হয়েছে, আপনারা একেবারে বসে পড়ুন। আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত।'

সুভাষ আর হেমন্ত চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে। হ্যাঁ, মন্দ কী।

আরেকজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনারা কী জাত?'

'জাত?' সুভাষ থ হয়ে গেল : 'কেন, তাতে কী দরকার?'

সন্ন্যাসী বললে, 'তার মানে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা এই দিকে আর যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁরা ঐ দিকে।'

হেমন্ত আঁতকে উঠল : 'এ্যাঁ! সন্ন্যাসীদের মধ্যেও জাতিভেদ?'

সুভাষ গম্ভীরমুখে বললে, 'আপনারা তো শঙ্করপন্থী। শঙ্করাচার্য তো সমস্ত ভেদজ্ঞান বর্জন করতে বলেছেন। শঙ্করমতে সমস্ত মানুষই ঈশ্বর, সর্বত্র সমানাধিকার। তবে আপনাদের এখানে শ্রেণীবিভাগ কেন?'

'তা কী করা যাবে!'

'চলে এস।' হেমন্ত সুভাষের হাত ধরে টান মারল।

'আশ্চর্য!' সুভাষ মর্মান্তিক ঘা খেল : 'সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ভেদবুদ্ধি!'

'আর এ ভেদবুদ্ধি শুধু জাত নিয়ে নয়, কাঞ্চন নিয়েও। দেখলে না এরা কাঞ্চন ত্যাগ করলেও, যারা বড়লোক, যাদের বেশি টাকা, তাদের প্রতিই এদের বেশি খাতির। টাকাওয়ালা লোককে বেশি খাতির করা মানেই পরোক্ষে কাঞ্চনকেই প্রশ্রয় দেওয়া।'

'তাই তো দেখলাম। তুমি পায়ে হেঁটে যাও, তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু তুমি একটা মোটর হাঁকিয়ে যাও—'

'একেবারে গাড়ির দরজা খুলে সবিনয় নিবেদনের ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াবে।'

'খুব হয়েছে, চলো। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। কোথাও জল মেলে কিনা দেখি।' সুভাষ পা বাড়াল।

'অন্ন তো খুব জুটল এখন জল!'

হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার ধারে কুয়ো পাওয়া গেল। কুয়ো তো নয়, কূপা।

বালতি-বাঁধা দড়িটা ধরতে যাচ্ছে সুভাষ, একটা গার্ড-মতন লোক ছুটে এল। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কোন জাত?'

সুভাষ পাথর হয়ে গেল। 'কেন?'

'যদি বামুন হোন এ দড়ি ছুঁতে পাবেন—'

'আর যদি না হই—'

'পাবেন না।'

হেমন্ত বললে, 'যারা বামুন তাদেরই শুধু তেষ্টা পায়?'

'তা জানি না।' পাহারাদার রুক্ষ কণ্ঠে বললে, 'আপনারা যখন নন আপনারা সরে দাঁড়ান—'

সুভাষ সরে দাঁড়াল। বললে, 'ভাই আর নয়, বাড়ি চলো।'

'বাড়ি!'

'এ সন্ন্যাস পোষাবে না। এখানেও ছুঁৎমার্গ! এখানেও জাতিভেদ! এখানেও বড়লোক-গরিব, ব্রাহ্মণ-শূদ্র। এখানেও ষোল আনা পাটোয়ারি—' সুভাষ তাকাল শূন্য চোখে: 'এখানে আর গুরু কোথায়?'

দুজনেই ফিরে চলল। হেমন্ত কৃষ্ণনগর আর সুভাষ কলকাতা, এলগিন রোড।

না, আমাদের অন্যপথ, অন্যতীর্থ। আমরা হতোদ্যম রণবিমুখ সৈন্য নই, নই আমরা ক্ষুদ্রচেতা বিরামানন্দ সন্ন্যাসী, স্বাধীনতার পুণ্যযজ্ঞে ঈশ্বর আমাদের ডেকেছেন। আমরা ভারতবর্ষের জন্যেই বলিপ্রদত্ত।

'হেমন্ত, সেই গানটা গাও—' বললে সুভাষ, 'অবনত ভারত চাহে তোমারে—'

হেমন্ত গান ধরল:

'অবনত ভারত চাহে তোমারে এস সুদর্শনধারী মুরারি!
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে কর দীক্ষিত ভারত-নর-নারী।
মঙ্গলভৈরব শঙ্খনিনাদে
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে
সম্মান-শৌর্যে পৌরুষ-বীর্যে
কর পূরিত, নিপীড়িত ভারত তোমারি॥'

এলগিন রোডের মোড়ে ট্র্যাম থেকে নামল সুভাষ। রাস্তাটুকু হেঁটে গিয়ে বুক টান করে বাড়ি ঢুকল। যেন কোথাও কিছু হয় নি, এমনি ফিরে এসেছে ভাবখানা এই রকম।

আরে, এ কে? সুবি না?

সুবি কোত্থেকে এল?

সত্যিই তো—সুবি, সুভাষই তো এসেছে।

সুভাষ—সুভাষ এসেছে! নানা কণ্ঠের কোলাহল উঠল।

ধীরস্থিরমূর্তি, প্রভাবতী এসে দাঁড়ালেন। সুভাষ প্রণাম করতে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'তোমার জন্ম হয়েছে আমার মৃত্যুর জন্যে। আমি এতক্ষণ থাকতাম না, গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিতাম। শুধু মেয়েদের জন্যে পারি নি।'

সুভাষ হাসিমুখে বললে, 'এখন আর তবে কাঁদছ কেন?'

'আবার যদি যাস,' প্রভাবতী বললেন, 'আমি বলে রাখছি, আমিও তোর সঙ্গে যাব।'

জানকীনাথ এসে দাঁড়ালেন। শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর অথচ স্নেহময়। সুভাষ তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি তাকে দু বাহু বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ও কাঁদবেন না ভেবেও কেঁদে ফেললেন। পরে আলিঙ্গন শ্লথ করে দিয়ে বললেন, 'আমার ঘরে আয়।'

জানকীনাথ তাঁর ঘরে খাটে শুয়ে আছেন, সুভাষ পাশে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'সংসার থেকে কি ধর্ম হয় না?' জানকীনাথ তাকালেন ছেলের দিকে।

সুভাষ স্নিগ্ধ-সরল কণ্ঠে বললে, 'কারু কারু হতে পারে, কারু কারু পক্ষে সংসারই আবার বাধা। সকলের তো এক রোগ নয়, তাই ওষুধও এক হতে পারে না। তা ছাড়া রুগীর সামর্থ্যও তো সমান নয়।'

'কিন্তু কর্তব্যত্যাগটা কি ঠিক?'

'বাবা, কর্তব্যটা কি রিলেটিভ—আপেক্ষিক নয়? বড়-র ডাক এলে ছোট কি ভেসে যায় না? ভগবানের ডাক এলে সংসারটা কি আর কর্তব্য থাকে?'

'কিন্তু ত্যাগ যে করবে তার জন্য কিছু অর্জন, কিছু প্রস্তুতি দরকার হবে না?'

'সব সময়ে তা নাও হতে পারে।' বিনয়ে-মাখা অথচ কী রকম ব্যাকুল শোনাল সুভাষের স্বর: 'পারের নৌকোকে প্রস্তুত হতে না দিয়েই ঝড় তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া বাবা, আসল ত্যাগ তো মনে। গেরুয়া কি শুধু বসনে, না, মনে?'

জানকীনাথ নড়ে-চড়ে উঠলেন: 'কিন্তু তোমার অদ্বৈতজ্ঞানটা কি শুধু একটা থিওরি নয়?'

'যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ থিওরি, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করলেই সত্য।'

'তেমন করে কি কেউ উপলব্ধি করেছেন? কী প্রমাণ?'

'প্রমাণ পুরাণপুরুষ ঋষিরা, যাঁরা বলেছিলেন বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আর প্রমাণ এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ। আত্মার মধ্যেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।'

জানকীনাথ বালিশে আবার ঢলে পড়লেন। বললেন, 'কিন্তু এত দিনের মধ্যে ছোট্ট একটা পোস্টকার্ড লিখলিনে কেন? কোথায় আছিস, টাকা পয়সার দরকার কিনা—'

বাবার স্নেহের স্পর্শে করুণমুখে সুভাষ একটু হাসল: 'ফিরেই তো এলাম, পোস্টকার্ড লেখবার দরকার কী। তা ছাড়া, বাবা, তেমন ডাক এলে চিঠির কি আর অবকাশ থাকবে?'

'তেমন ডাক এলে আমরাও তোমাকে আটকাব না।'

দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই সুভাষ দেখল সারদা-ঝি বসে আছে।

'ওমা, তুমি?' সুভাষ চমকে উঠল।

সারদা অশ্রুভরভর চোখে চেয়ে রইল সুভাষের দিকে। বললে, 'সেই কখন থেকে বসে আছি। রোজ বসে থাকি—আমার সুবি কখন ফিরে আসবে।'

'এই তো ফিরে এসেছি।' সুভাষ বললে, 'এবার ওঠো। আর বসে আছ কেন?'

সারদা উঠল। সুভাষের গায়ে সস্নেহ হাত রেখে বললে, 'এর পর আবার যখন যাবি শুধু তোর মাকে নয়, আমাকেও সঙ্গে নিবি।'

পনেরো

উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। দেশের বিপ্লবীরা ভাবল এর কোনো সুযোগ নেওয়া যায় কিনা অর্থাৎ জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনা যায় কিনা। অস্ত্রের প্রাচুর্য না থাকলে বিপ্লবে অবতীর্ণ হবে কী করে? কিন্তু এই তো সময়। শুধু দিশি সৈন্য ভারতে রেখে ইংলণ্ড তার ইংরেজি সৈন্য ঘরে নিয়ে গেছে। আর দিশি সৈন্যদের একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে তারা কোন না অস্ত্র ফেলে ভালোমানুষ সাজবে!

কিন্তু, অস্ত্র পেলেও, সেই ধুরন্ধর বিপ্লবী কই, সেই লোককান্ত সত্তমপুরুষ, কোথায় সে উপায়নিপুণ নেতা যে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে আপন দায়িত্বে চালনা করবে?

বিপ্লবীরা কি প্রস্তুত? সারা দেশময় তুলে দিতে পারবে কি প্রাণযজ্ঞের লেলিহান হোমানল?

রডা কোম্পানির কটা 'মশার' পিস্তলে তাদের কী হবে?

তবু ভাগ্যিস পঞ্চাশটা পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুলি যে অসীম সাহসে সরানো গেছে তার জন্যে শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবুকে পুজো করা উচিত।

হাবু ছিল বউবাজারের বড়লাট। দুর্দান্তপনায় একচ্ছত্র। পাড়ার লোক তাকে তাই হাবু-লাট বলে। কী সূত্রে রডা কোম্পানিতে জেটি-সরকার হয়ে ঢোকে। আপিসে ভাবখানা এমন, তার মত সৎ, দক্ষ, আর ভদ্র কর্মচারী দুটি নেই। মাইনে তিরিশ টাকা, তাতে কী, কোম্পানি তো বড়—আর সে যদি ভালো হয়, কোম্পানিই তাকে বড় করে দেবে।

কোম্পানি হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির কোম্পানি। সে নেপালকে বেচে, কাশ্মীরকে বেচে, আরো নানা করদ রাজ্যে সরবরাহ করে। শুধু জাহাজ থেকে মাল খালাস করে এনে কোম্পানির গুদামে জমা করার ভার হাবুর উপর।

ভাবো কত দীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠতার ফলে হাবু এত বড় বিশ্বাসের অধিকারী হয়েছে। নইলে কলকাতার রাস্তার উপর দিয়ে এক গাড়ি মাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা?

বিপ্লবীদের অস্ত্রসংগ্রহের প্রধান উপায় জাহাজী নাবিক আর লাইসেন্স লাগত না বলে এংলো ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ওরা বিষম দাম হাঁকত আর সে খরচ মেটাতে গিয়ে ডাকাতি না করে পথ ছিল না। কিন্তু এ একেবারে পঞ্চাশ নম্বর 'মশার' পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টোটা মুফত হাতে এসে যাচ্ছে।

এ ছাড়া আরো অনেক-অনেক মাল এসেছে, তা দিয়ে ছ-ছটা গরুর গাড়ি বোঝাই হয়েছে। আসল মাল কায়দা করে বোঝাই করা হয়েছে শেষ বা সাত নম্বর গাড়িতে। গাড়োয়ান আবদুল দোসাদ। তাকে হাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এ গাড়িটা কোম্পানির গুদামের গেটের মধ্যে না ঢুকে সোজা এগিয়ে যাবে, এ রাস্তা ও রাস্তা করে শেষে পৌঁছুবে মলঙ্গা লেনে, বিপ্লবী অনুকূল মুখুজ্জের আস্তানায়।

আবদুল দোসাদকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি শ্রীশ। তাই হরিদাস দত্তকে গাড়ির সঙ্গে পাঠিয়েছে গাড়োয়ানের সহযোগী করে। ঠিক গাড়োয়ানদের মত চুল ছাঁটা, গায়ে গোল গলার গেঞ্জি, গলায় কার বেঁধে তক্তি ঝুলোনো, খালি পা, পরনে দোভাঁজ ময়লা কাপড়, কোমরে গামছা—কে বলবে হরিদাস গাড়োয়ানের সাকরেদ নয়? কিন্তু তার গামছায় বাঁধা লোডেড রিভলভার, বলা আছে, যদি দোসাদ ঠিকমত গাড়ি না চালায় তবে তাকে সরিয়ে দিয়ে হরিদাসই যেন মাল নিয়ে আস্তানায় পৌঁছয়। সরিয়ে দিয়ে, মানে, দরকার হলে গুলিতে সাবাড় করে।

শেড থেকে বার হয়ে সাত-সাতটা গাড়ি পর-পর চলছে। ভ্যান্সিটার্ট স্ট্রিটে কোম্পানির গুদামে ছ-ছটা গাড়ি ঢুকল, সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশও ঢুকল। সব মাল মিলিয়ে তুলে গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সহসা শ্রীশ চিৎকার করে উঠল: 'আরেকটা গাড়ি? মোট সাতটা গাড়ি ছিল তো! বাকিটা কোথায় গেল? কী সর্বনাশ! ওটার মধ্যে যে—'

যেন বাকি গাড়িটার সন্ধান করতে যাচ্ছে এমনি উন্মত্ত ভাব করে ছুটে বেরিয়ে গেল শ্রীশ।

হরিদাসের ইঙ্গিতে গাড়ি মিশন রো, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিট হয়ে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পেরিয়ে চাঁদনি চকের ধার ঘেঁষে তখনকার ওয়াটার ওয়ার্কসকে পাশে ফেলে চলে এল মলঙ্গা লেন।

মাল পৌঁছেছে এ খবরটুকু নিয়ে শ্রীশ সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল আসামে। কোথায় কবে ও কী ভাবে তার জীবনের অবসান হল কেউ জানে না, ইংরেজের টিকটিকিরাও না।

'মশার' পিস্তলের সুবিধে এই, তাকে ভেঙে রিভলভার ও বাড়িয়ে রাইফেল করা যায়। আর এই 'মশার' পিস্তলেই তো চলেছিল বুড়িবালামের যুদ্ধ।

গোয়েন্দাদের বড় কর্তা বসন্ত চাটুজ্জে। কবে থেকে তার অস্ত ঘটাবার চেষ্টা করছে বিপ্লবীরা, নিয়তি নির্ভুল ভাবে প্রতিবারেই বাঁচিয়ে দিচ্ছে। প্রথম চেষ্টা হয়েছিল সেই ১৯১২-তে, ঢাকায়, যখন বুড়িগঙ্গার পারে বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর সে এসে পড়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীর গুলি ছোঁড়া হল, বুদ্ধিমান বসন্ত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালে।

দ্বিতীয় চেষ্টা হল ১৯১৪-র ২৫শে নভেম্বর। মুসলমানপাড়া লেনে বসন্তর বাড়িতেই বোমা পড়ল। তার বাইরের ঘরে বসন্ত কয়েকজন পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিল, কী কাজে হঠাৎ উঠে পড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল, আর তক্ষুনি ঘরের মধ্যে বোমার

দারুণ বিদারণ। নিয়তি আবার বাঁচিয়ে দিল বসন্তকে। অল্পাবস্তর জখম হল পুলিসি মানুষগুলি। শুধু বসন্তর আর্দালি রামভজন সিং সবাসরি মার খেয়ে প্রাণ হারাল।

আহত অবস্থায় অদূরে ধরা পড়ল প্রেসেডিন্সি কলেজের ছাত্র, নগেন সেনগুপ্ত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার ঘায়ের তদারকির ভার পড়ল ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জির উপর। যাদুগোপাল আরেক বিপ্লবী, আরেক বিষবৈদ্য। নগেনকে ড্রেস করে আর গোপনে উৎসাহ দেয়, পুলিসকে যেন কিছু না বলে, দেয় তার মন্ত্রচেতনা।

হাইকোর্টের বিচারে নগেন বেকসুর খালাস হয়ে গেল। বিচারকদের মধ্যে একজন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু এবার—এবার তোমাকে কে বাঁচাবে? বার বার তিন বার।

উনিশ শো ষোল সালের ৩০শে জুন বিপ্লবীরা বসন্তকে পেয়ে গেল সামনাসামনি। বসন্ত তখন সরকারি মোটর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সাইকেল করে যাতায়াত করে, গাড়ির চেয়ে সাইকেল নিরাপদ ভেবে। সেদিনও সে সাইকেলেই ফিরছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট দিয়ে, পিছনে আরেক সাইকেলে তার বডি-গার্ড বিলাস ঘোষ। রাস্তার পাশে ছোট একটা পোড়ো জমিতে ফুটবল খেলছিল ছেলেরা, কে জানত তাদেরই আশেপাশে বিপ্লবীরা অনন্যলক্ষ্য হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বসন্ত নজরের মধ্যে এসে পড়তেই অকাতরে গুলির পর গুলি ছুঁড়ল বিপ্লবীরা, চক্ষের নিমেষে বসন্ত ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। বিলাসকে বেশিক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকতে হল না, তাকেও বিপ্লবীর গুলি মাটিতে ফেললে। বসন্ত আর বিলাস কেউই বাঁচল না, আর, আবার নিয়তির পরিহাস, বিপ্লবীরা পাঁচ-পাঁচজন হলেও একজনও ধরা পড়ল না। এলগিন রোড দিয়ে পিপুলপটি লেনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সি.আই.ডি. ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্যও গুলি খেল ১৯১৫-র জানুয়ারি মাসে, কলুটোলা-কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। ট্র্যাম থেকে নেমেছে অমনি দুটি যুবক রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়াল, একজনের হাতে একটা মশার, আরেকজনের ওয়েবলি। সঙ্কটে নিজের নামটা উচ্চারণ করতেও ভুলে গেল মধুসূদন, খসে পড়ল মাটিতে। প্রতাপ চ্যাটার্জির স্ট্রিট দিয়ে পালিয়ে গেল বিপ্লবীরা।

স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের সুরেশ মুখুজ্জেকে খুন করাটা খুবই রোমাঞ্চকর। দলপতি যতীন মুখুজ্জে হুকুম করেছে সুরেশের রক্ত চাই, তাই দুই সহচর চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী আর নীরেন দাশ-গুপ্ত তৈরি হয়ে রয়েছে। ১৯১৫-র ২৮শে ফেব্রুয়ারি, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবে বড়লাট, তাই পুলিসি ব্যবস্থা দক্ষিণে-উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কটা ছেলে কী সব সলা-পরামর্শ করছে দেখতে পেল সুরেশ মুখুজ্জে। দলের মধ্যে একজন চিত্তপ্রিয়, স্পষ্ট চিনতেও পারল। সহকর্মী বনবিহারী মুখুজ্জেকে বললে, চলো ধরবার চেষ্টা করি। বন-বিহারী বারণ করলে, এখন কাজ নেই। কিন্তু টাটকা শিকারের লোভ ছাড়তে পারল না সুরেশ। আর্দালি শিউপ্রসাদকে বললে, ঐ ছোঁড়াটাকে ধরো। চিত্তপ্রিয় নিজের থেকেই ধরা দিচ্ছে এমনি ভাব করে এগোতে লাগল। এই নিরীহ ছলনাটুকু না করলে বুঝি সুরেশের কাছাকাছি আসা যায় না। নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই সুরেশ অতি আদরে চিত্তপ্রিয়কে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়াল। আর সেই মুহূর্তেই চিত্তপ্রিয় রিভলভার বের করে অসন্দিগ্ধ সুরেশের বুকের উপর গুলি ছুঁড়ল। শিউপ্রসাদ ধরতে চাইল চিত্তপ্রিয়কে, ততক্ষণে নীরেন এসে উদয় হয়েছে। বনবিহারী দে দৌড়। সুরেশ আর শিউপ্রসাদ দুজনেই খতম হয়ে গেল। বনবিহারী হেদোর কোণে এক পানের দোকানের মাচার নিচে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

সুরেশের রক্তে রুমাল ভিজিয়ে নিল বিপ্লবীরা, এ রক্ত দিতে হবে তাদের গুরুকে, পুরুষর্ষভ যতীন্দ্রনাথকে।

সাব-ইনস্পেক্টর গিরীন ব্যানার্জি খুন হল রাত্রে, মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে এক পুলিস অফিসারের বাড়িতে, ১৯১৫-র ২১শে অক্টোবরে। পুলিসবাবুরা পাশা খেলছিলেন, রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেলেও উঠি-উঠি করেও উঠতে পারছিল না গিরীন। কী দুর্জয় সাহস, বিদ্যুজ্জিহ্ব রিভলভার নিয়ে, সেই রাতে পুলিসি গৃহের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিপ্লবীরা। লণ্ঠনের আলোতে খেলছিল বাবুরা, প্রথম গুলিতেই চিমনি ফেটে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আপনিই কি গিরীন ব্যানার্জি? আমরা গিরীন ব্যানার্জিকে চাই। পুলিসবাবুরা, কে জানে, অন্ধকারে গিরীন ব্যানার্জিকে গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে, সরে পড়তে চাইল। ভুল হল না, যখন ফের আলো জ্বালানো হল দেখা গেল গিরীনই পড়ে মরে আছে আর বিপ্লবীরা নিরুদ্দেশ।

এবার শুরু হল মোটর-ডাকাতি। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে এ এক নতুন আঙ্গিক। প্রথম ডাকাতি হল গার্ডেনরিচে, দিনে-দুপুরে। বার্ড কোম্পানির আঠারো হাজার টাকা কেড়ে নিলে। দ্বিতীয় ডাকাতি বেলেঘাটায়, এক চালের আড়তে, আদায় হল কুড়ি হাজার টাকা। তারপর আরেক ডাকাতি কর্পোরেশান স্ট্রিটে, সেই চালের আড়তে, আর এবারের ফসল পঁচিশ হাজার।

ইংরেজ সরকারের সম্ভ্রম খর্ব হতে চলেছে—যতীন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মাথা চাই।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে করতে যতীন তার সঙ্গীদের নিয়ে পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রিটের এক বাড়িতে গিয়ে উঠল। এক কাল্পনিক নামে ভাড়া নিলে। কিন্তু সেখানেও একদিন, ১৯১৫-র ২৪শে ফেব্রুয়ারির সকালে পুলিসের টিকটিকি নীরদ হালদার এসে হাজির। চর তো নয় অপসর্প। সর্বত্র গূঢ়গতি।

'আরে যতীন, তুমি এখানে?' যেন কতদিনের বন্ধু এমনি সহাস্য প্রীতিতে অভিনন্দন করলে।

সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তপ্রিয় লাফিয়ে উঠল রিভলভার নিয়ে। নাও তোমার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর।

নির্মেঘে বিদ্যুৎ দেখল নীরদ। পালাবার জন্যে পিছন ফিরল।

সঙ্গে-সঙ্গেই গুলি। সঙ্গে-সঙ্গেই নিধন।

আরেকবার নিজের দলের লোককেই মারতে উঠেছিল চিত্তপ্রিয়। তখন দলবল আছে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের মেসে। শীতের সাত সকালে দলেরই যাদুগোপাল বাইরে থেকে নানা খবর যোগাড় করে এনেছে, এক্ষুনি তা দলনেতাকে জানানো দরকার। ঘরে ঢুকে যাদুগোপাল দেখল সবাই র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কোনজন যতীন মুখুজ্জে? এই জনই হবেন বোধহয়—চিত্তপ্রিয়র মুখের ঢাকা সরিয়ে ফেলল যাদুগোপাল। সঙ্গে-সঙ্গেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে যাদুগোপালের দিকে রিভলবার লক্ষ্য করল।

একটি স্তম্ভিত মুহূর্ত।

যাদুগোপালের নিজের নাম প্রায় ভুলে যাবার অবস্থা। তবু কোনোরকমে নিজের নামটা সে উচ্চারণ করলে।

তবে সেই তীক্ষ্ণদংষ্ট্রের থেকে সে রেহাই পেল।

কলকাতা ছেড়ে দিয়ে যতীন তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল উড়িষ্যার কপ্তিপদায়, সেখান থেকে নীরেন আর মনোরঞ্জনকে পাঠিয়ে দিল আরেক আস্তানায়, তালদিহিতে। কলকাতা আর এই দুই বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্যে বালেশ্বরে একটা সাইকেল মেরামতির দোকান খোলা হল, নাম ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম।

কত স্বপ্ন আর সঙ্কল্প, উদ্যম আর উন্মাদনা—কিন্তু প্রয়োজন এক, ভারতকণ্টক ইংরেজের উচ্ছেদ।

বালেশ্বরের সাইকেলের দোকানে বাঙালি যুবকদের আনাগোনায়

পুলিসের সন্দেহ এল। যথাকালে উপরালাদের কানে গেল, ভারত সরকারের গোয়েন্দাধিপতি ডেনহাম বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবিকে নিয়ে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে হানা দিল। খানাতল্লাসিতে পেল ছোট একটি কাগজের টুকরো, তাতে নিয়তির হাতে ছোট্ট একটি শব্দ লেখা—কপ্তিপদা। সেটা কী? একটা গ্রাম। সে কোথায়? নীলগিরিতে, ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলের কোলে।

সন্ধের দিকে ডেনহাম বাহিনী নিয়ে চলল কপ্তিপদার দিকে। সঙ্গে কিলবি আর বাংলার স্বনামখ্যাত টেগার্ট। কর্তারা যাচ্ছিল হাতির পিঠে চেপে, হাতির গলার ঘণ্টায় গ্রামের লোক সচকিত হয়ে উঠল। অন্ধকার হয়ে এলে কী হবে একজন ছুটল 'সাধুবাবা'কে খবর দিতে। যতীনই এই সাধুবাবা। গ্রামবাসীরা নাম দিতে ভুল করে নি। পরনে শুধু গেরুয়া বলে নয়, সাধুর মতই সে শোভনহৃদয়, পরোপকারী, ভগবৎ-ভক্ত। 'বাবা এসে দেখুক কী এলাহিকাণ্ড, হাতির পিঠে চড়ে সাহেব এসেছে!

যতীন তো পলকে বুঝে নিয়েছে কী ব্যাপার। সে পালাল না, কুড়ি মাইল দূরে তালদিহির দিকে চলল সঙ্গীদের খবর দিতে। সেখানে আবার জ্যোতিষ পাল এসে গিয়েছে।

কপ্তিপদার মণীন্দ্র চৌধুরীই যতীনের আশ্রয়দাতা। রাত্রে তার ঘরের জানলায় টোকা মারল যতীন: 'দাদা, একটা কথা শুনুন।'

চেনা গলার আওয়াজ শুনে মণীন্দ্র জানলা খুলে হতভম্ব হয়ে গেল: 'একি, এখনো পালাও নি?'

'না, পালাব না, যুদ্ধ করব।' দীপ্ততেজ নিরাতঙ্ক যতীন বললে, 'আপনার বন্দুকটা আমাকে দিন।'

কী ভেবে মণীন্দ্র বন্দুক দিয়ে দিল। যতীন কিছু চাইবে আর তাকে তা কেউ দেবে না এ যেন ভাবনাতীত।

অন্ধকারে হানা দিতে সুবিধে হবে না, তাই কর্তারা কপ্তিপদার ডাকবাংলোয় রাত কাটাল। সকালে সাধুবাবার ডেরায় গিয়ে দেখল

কিছু ছাই-ভস্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু ডাকাতরা পালাবে কোথায়? চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেল। যেখানে যত বেরুবার ফাঁক আছে সব অবরুদ্ধ করে দাও।

হ্যাঁ, ডাকাত—গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র করে দাও, জার্মান ডাকাত, বাঙালি ডাকাত ঢুকেছে উড়িষ্যায়। ওদের যারা ধরিয়ে দিতে পারবে তাদের প্রত্যেককে দুশো করে টাকা দেওয়া হবে।

তালদিহি থেকে সঙ্গীদের নিয়ে যতীন চলল বালেশ্বরের দিকে, স্টেশন পেরিয়ে চলে গেল হরিপুর। হরিপুর পেরিয়ে গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরেই নদী আর সেই নদীর নামই বুড়িবালাম।

পঞ্চজন—যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন আর জ্যোতিষ এসে দাঁড়াল নদীর পারে। অনেক কষ্টে একটা নৌকো পাওয়া গেল। ঝুলিঝোলা নিয়ে সকলে পার হয়ে গেল নিরাপদে। কিন্তু ওরা পার হয়ে সিধে না গিয়ে জঙ্গলের দিকে যায় কেন? তাতে গ্রাম-বাসীরা বলাবলি শুরু করল এরাই সেই বাঙালি ডাকাত নয় তো? একজন যাও, দফাদারকে গিয়ে খবর দাও।

লোক পিছু নিয়েছে মনে হচ্ছে। মনোরঞ্জন ফাঁকা আওয়াজ করল। লোকগুলো হটল বটে কিন্তু চম্পট দিল না। আবার দানা বাঁধল।

তখন পঞ্চজন চলে এসেছে দামুদ্রায়। গ্রামের মাতব্বর রাজু মহান্তি সাহস করে ধরতে গেল একজনকে। মনোরঞ্জন এবার জ্যান্ত গুলি ছুঁড়ল। রাজু পড়ে গেল মাটিতে।

আর যায় কোথা। গ্রামের লোক জড়ো হল, দল বেঁধে লাগল অনুসরণ করতে। একজনের এত সাহস, একেবারে যতীনকেই জাপটে ধরল। পলক ফেলতে হল না, লোকটা গুলিতে খতম হয়ে গেল।

আর বুঝি গ্রামবাসীদের সাহসে কুলোল না। যা করতে হয় এখন পুলিসে করুক। গুলির খবর তো দফাদারকে পৌঁছে দেওয়া

হয়েছে। আমরা আর মরি কেন? আমাদের পুরস্কার পাওয়া বরাতে নেই।

চলতে চলতে পঞ্চজন এসে পড়ল চাষখন্দের সীমানায়। সেখানে আবার নদী। পারঘাটে নৌকো নেই। ঝুলিঝোলা মাথায় বেঁধে নদী পার হয়ে গেল পঞ্চজন। একটা উই-টিবির পাশে গিয়ে বসল। এবার বোধহয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে। দিনেরাতে কম হাঁটে নি, কম লড়ে নি মূল্য-না-বোঝা জনতার বিরুদ্ধে। সেই কখন একটা ময়রার দোকান থেকে কিছু কিনে খেয়েছিলাম। তার পর আর কিছু পেটে পড়ে নি। জননী জন্মভূমি, তুমি আমাদের শক্তি দাও, আমাদের শত্রুঞ্জয় করো।

টিবির আড়ালে বসাটা মন্দ হল না। আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না অথচ আমরা চারদিক সব দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ দূর পাল্লা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। যতীন বুঝল শত্রুপক্ষ এবার একেবারে ফৌজ নিয়ে এসেছে। আসুক, আসতে দাও। আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রজ্বলিত।

প্রতিপক্ষ বোঝাতে চাইল, তোমাদের যখন দূর-পাল্লার বন্দুক নেই তখন রঙ্গ রেখে বেরিয়ে এস আড়াল থেকে। আত্মসমর্পণ করো।

যতীন তার সঙ্গীদের বললে, চুপ করে থাকো। ওদের এগিয়ে আসতে দাও।

প্রতিপক্ষ এগিয়ে এল। এল মশার পিস্তলের এলাকার মধ্যে। তবে আর কথা কী। ফায়ার!

এ যে রঙ্গ নয়, এ যে রণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে প্রথম সম্মুখযুদ্ধ।

ফৌজদাররা ভেবেছিল ওরা বুঝি আতঙ্কেই স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এ যে দেখি দুর্মদ বীরত্ব। এ যে দেখি ইংরেজ সৈন্যই ভূপতিত। এ যে দেখি ইংরেজ সৈন্যই আহত হয়ে পলায়ন করে। স্বয়ং রদারফোর্ডই ঘরমুখো।

আরো ফৌজ আনো, আরো অস্ত্রসম্ভার। দেখি উইয়ের ঢিবি কত বড় দুর্গ।

দুর্গ আমাদের বিশাল বক্ষতট। গীতার পরমগৃহে আমরা বাস করি, যেখানে পীড়া নেই পাপ নেই ভয় নেই পরাভব নেই।

দু ঘন্টার উপর যুদ্ধ চলল। শেষকালে বীরদলের গুলি ফুরিয়ে গেল। চিত্তপ্রিয় সমরাঙ্গনেই নিহত হল। যতীন আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেহ ছাড়ল। ধরা পড়ল জ্যোতিষ, নীরেন আর মনোরঞ্জন।

বিচারে নীরেন আর মনোরঞ্জনের ফাঁসি হল, জ্যোতিষের চোদ্দ বছরের দ্বীপান্তর।

'আয় আজি তোরা মরিবি কে ?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির নিশীথ শ্মশানে পিশাচ অধীর
থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?
মরার মতন না লভি মরণ সাধকের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
অসুরনিধনে কিসের তরাস পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস ?
না গনি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ তরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?'

কং ঘাতয়তি হন্তি কম ? ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ন মে কর্মফলে স্পৃহা। তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং।

আত্মবান পুরুষ, সাধক পুরুষ, গীতা-পুরুষ যতীন্দ্রনাথ। শরীরে মনে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমান বলবান। ঈশ্বরস্থিত, ঈশ্বরসমর্পিত। সর্বাবস্থায় তাই সমত্ববুদ্ধি। জীবন-মৃত্যু একই বাদ্যকরের করতাল।

কৃষ্ণনগরেই সুভাষ হেমন্তর কাছে শুনেছিল যতীন্দ্রনাথের কথা। বলেছিল, 'মুক্তপুরুষ না হলে বিপ্লবনেতা হওয়া যায় না। যিনি গীতার মূর্ত বিগ্রহ তিনি মুক্তপুরুষ নন তো কী।'

সাত্ত্বিক কর্তাই মুক্তপুরুষ। তিনি নিরাসক্ত, তিনি অনহংবাদী, তিনি ধৈর্য ও উৎসাহসমন্বিত, তিনি সিদ্ধিতে-অসিদ্ধিতে নির্বিকার, হর্ষবিষাদশূন্য।

সুভাষ মনে মনে যতীন্দ্রনাথকে প্রণাম করল।

'শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়াচরণে নম্রশির,
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর।
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির॥'

ষোল

ইণ্টারমিডিয়েটে সুভাষের ফল ভালো হল না। প্রথম বিভাগে পাস করলেও গুণানুসারে স্থান হল একশো চব্বিশজনের নিচে। যাক, বিগতকে নিয়ে শোক করে লাভ নেই, বি-এতে দেখে নেব। শান্ত মনে পড়াশুনো করব। দর্শনে প্রথম হয়ে মুছে ফেলব এ কালিমা।

কিন্তু তাকে শান্তিতে পড়তে দিচ্ছে কে ?

হিন্দু হস্টেলের ঘরে ছাত্রদের সভা বসেছে। কোলাহল উঠল : সুভাষ এসেছে। সুভাষকে ডেকে আনি।

একজন ছাত্র বলে উঠল : 'এ আমাদের হিন্দু হস্টেলের ছেলেদের সভা, এতে সুভাষকে ডাকবার কী দরকার! সুভাষ তো আর এই হস্টেলে থাকে না।'

'তাতে কী!' আরেক ছাত্র বললে, 'সুভাষ তো আমাদের ক্লাস রিপ্রেজেণ্টেটিভ।'

'আর এ এমন একটা ব্যাপার প্রত্যেক ছাত্রেরই এতে যোগ দেওয়া উচিত।'

কাউকে ডাকতে হল না, সুভাষ নিজের থেকেই চলে এল। কী ব্যাপার ?

'এই যে সুভাষ। এই যে নিজের থেকেই এসে গেছে।'

'কেন, ব্যাপারখানা কী ?'

'শুনেছ নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্ট বঙ্গ-আমার-জননী-আমার গানটা বন্ধ করে দিচ্ছে। ওতে নাকি রাজদ্রোহের গন্ধ আছে। আমাদের হস্টেলে যে বার্ষিক অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে ও গান আমরা গাইব।'

'নিশ্চয়ই গাইবে।' সুভাষ বললে শান্ত স্বরে, 'ওই তো একমাত্র গান।'

'আমাদের সাইকোলজির প্রফেসর খগেন মিত্তির মশাইকে বলব আমাদের লিড করতে। উনি তো খুব ভালো গাইয়ে।'

'সভাপতি কে হবে?'

'আমাদের হিস্ট্রির প্রফেসর মিস্টার ওটেন।'

'খুব ভালো হবে। আরো সব প্রফেসররা আসবেন তো?'

'ইংরেজির প্রফেসর প্রফুল্ল ঘোষ, সায়েন্সের মিস্টার পিক—আরো কেউ কেউ নিশ্চয়ই আসবেন।'

সভা ঠিকমতই হল। খগেন মিত্র লিড করলেন ও ছেলেরা তারস্বরে গান ধরল: 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।'

ওটেন অস্বস্তি প্রকাশ করছিল, কিন্তু বক্তৃতায় সে শোধ তুললে। বক্তৃতা আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করার পরই বলে উঠল: 'ইউ বেঙ্গলিজ আর বার্বেরিয়ান্স—'

ছাত্রদের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ শুরু হল। খগেন মিত্র বেরিয়ে গেলেন সভা ছেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও।

ছেলেদের বিক্ষোভটা চাপা না থেকে মুক্ত শিখায় জ্বলে উঠল। আবার ডাকো সুভাষকে।

'ক্লাসে তো ছেলেদের অপমান করছেই, এ একেবারে বাঙালি জাতি ধরে অপমান।'

'অসহ্য!' সুভাষ বললে, 'এর প্রতিবিধান হওয়া দরকার।'

'যেন চিরকাল নীরবে সমস্ত অপমান সহ্য করে থাকতে হবে! অসম্ভব।'

'কিন্তু কী করা!' আরেকজন ছাত্র এগিয়ে এল।

'আমি বলি, আগে প্রিন্সিপ্যাল জেমসের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানাই আমাদের মনস্তাপ। তিনি কী বলেন। তারপর দেখা যাবে।'

'তবে তাই।'

সুভাষকে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে পাঠিয়ে বাইরে ছেলেরা ভিড় করে আছে। কী খবর নিয়ে আসে তারই প্রতীক্ষায়।

কতক্ষণ পরে সুভাষ বেরিয়ে এল। মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

'কী হল? কী হল?'

'কিছু হল না। প্রিন্সিপ্যাল উলটো কথা বলছেন। বলছেন, আমাদেরই নাকি ওটেনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

'দোষ করল ওটেন আর ক্ষমা চাইব আমরা?' এক ছাত্র বলে উঠল।

'ওটেন যে সাহেব, সাহেবের চোখে সাহেবের দোষ নেই।' আরেক ছাত্র টিপ্পনী মারল।

'এর এখন প্রতিকার কী?' রোখা ছাত্র মুখিয়ে এল।

সুভাষ প্রশান্ত মুখে বললে, 'ধর্মঘট।'

ছাত্রদল উত্তেজিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলল: 'ধর্মঘট।'

সুভাষ গম্ভীরস্বরে বললে, 'শোনো, এভাবে উত্তেজিত হওয়া নয়। বেশ ধীরে সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্ত আঁটঘাঁট বেঁধে কাজে নামতে হবে। একটা প্ল্যানড য়্যাকশান চাই। এলোমেলো হয়ে কাজ করা নয়। প্রথমে একতা চাই, দল বাঁধা চাই, চাই সংগঠন —সঙ্ঘশক্তি।'

'তুমি যদি নেতৃত্ব নাও আমরা দেখাব সঙ্ঘশক্তি।'

অনেক চেষ্টা হল সুভাষকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু সুভাষ টলল না, একবার যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তখন আর বিরতি নয়, পশ্চাদপসরণ নয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করছে সুভাষ। সঙ্গে আরো কজন ছাত্র। কলেজ করতে আসা ছাত্ররা বই-খাতা হাতে গেটের কাছে এগুচ্ছে কিন্তু সুভাষকে দেখে ভিতরে যেতে আর সাহস পাচ্ছে না।

একটি ফিটফাট করে সাজা খুঁটির জোরওয়ালা বড়লোক ছেলে

আকাশ-থেকে-পড়ার মতন মুখ করে বললে, 'এ কি, পিকেটিং? প্রেসিডেন্সি কলেজে পিকেটিং?'

সুভাষকে উদ্দেশ করেই বলা তাই সে উত্তর দিল: 'কেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে মানুষ নেই? মানুষ হয়ে তারা তাদের মনুষ্যত্বের অপমান সহ্য করবে?'

যেন কথাটা নতুন শুনছে বড়লোক ছাত্র এমনিধারা মুখ করল: 'মনুষ্যত্বের অপমান!'

'সমস্ত বাঙালি জাতিকে বর্বর বলা আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান করা নয়?'

বড়লোক ছাত্র ঢোঁক গিলল। বললে, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে কি পারবে?'

সুভাষ হেসে বললে, 'চেষ্টা করে দেখা যাক না। তুমিও এ চেষ্টায় সাহায্য কর না আমাদের।'

'মিছিমিছি পরকালটা ঝর্ঝরে করবে।'

'আগে ইহকালটা সামলাই, পরে পরকাল ভাবা যাবে।'

একটি ছাত্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে কলেজের ভিতর থেকে এল। আতঙ্কিত স্বরে বললে, 'এই, স্যার জে সি বোস তোমাকে ডাকছেন।'

'আমাকে?' একটু কি ঘাবড়াল সুভাষ? জিজ্ঞেস করলে, 'কেন ডাকছেন?'

'তা তো জানি না।'

ধীর পায়ে একটু বা চিন্তিত মনে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর কক্ষ-প্রান্তে এসে দাঁড়াল সুভাষ। বাইরে কোনো চাপরাশি নেই। নিজেই ঢুকে পড়ল সাহস করে। দু হাত তুলে নমস্কার করল। নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করল: 'আমাকে ডেকেছেন?'

জগদীশচন্দ্র কী পড়ছিলেন, চোখ তুলে সস্নেহে তাকালেন। 'তুমি—'

'আমি সুভাষচন্দ্র বসু।'

'ও তুমি—তোমরা ধর্মঘট করেছ ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'শোনো। এগিয়ে এস।'

সুভাষ মুগ্ধের মত এগিয়ে গেল।

গলা নামিয়ে গাঢ়স্বরে জগদীশচন্দ্র বললেন, 'তোমরা ঠিক করেছ।'

চকিতে সুভাষের ম্লান চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জগদীশচন্দ্র বললেন, 'চালিয়ে যাও ধর্মঘট। যতদিন না দুঃখ প্রকাশ করে। তোমাদের কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।'

হ্যাঁ, চালিয়ে যাও ধর্মঘট।

অগত্যা প্রিন্সিপ্যাল দলনেতা সুভাষকে ডেকে পাঠাল। ওটেনের সঙ্গে মোকাবিলা হোক।

প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে আসতেই ছাত্রদল সুভাষকে ঘিরে ধরল : 'কী হল ?'

সুভাষ হাসল। বললে, 'ওটেন দুঃখ প্রকাশ করেছে।'

ছাত্রদল উল্লসিত হয়ে উঠল : 'করেছে ? করেছে ? তবে আর কথা কী!'

সুভাষ বললে, 'হ্যাঁ, আর তবে ধর্মঘট নয়। চলো ক্লাসে যাই।'

একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলে : 'কিন্তু ওটেন কথাটা কী বলল ?'

'বলল, 'সরি'।'

'শুধু—'সরি' ? আর কিছু নয় ?'

'তাই যথেষ্ট।' বললে সুভাষ, 'ওটুকু যে বলাতে পেরেছি, উদ্ধত ভঙ্গিটাকে যে নত করতে পেরেছি তাতেই আমাদের জয়।'

'চলো ক্লাসে চলো।' হৈ-হৈ করতে করতে ক্লাসের দিকে চলল ছাত্রেরা।

সর্বশেষ ছাত্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুহাত চিৎ করে বললে, 'সরি!'

কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে। নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। কদিন পরেই ওটেন আবার এক কাণ্ড করে বসল।

ক্লাসে ওটেন পড়াচ্ছে, পাশের বারান্দা দিয়ে চটি ফটফট করতে করতে একটি ছাত্র, কমল বসু, চলে গেল।

একে চটি তায় ফটফট। ওটেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল একবার চটির দিকে। শব্দটা অস্পষ্ট হয়ে এল। পড়ানোয় আবার মন দিল ওটেন।

কমল যেন কাকে খুঁজছে। তাই আবার সে ফিরল বারান্দা দিয়েই। আবার চটি, আবার ফটফট। ওটেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দুহাতে কমলকে প্রবল ধাক্কা দিল। কমল পড়ে গেল ছিটকে। আরো একটি ছাত্র আসছিল কমলের সাহায্যে, কমলকে তুলতে, তাকেও ওটেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

কী হল, কী হল, বলতে বলতে ছেলেরা বেরিয়ে এল ক্লাস থেকে। কমলকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কেউ বা দ্বিতীয় ছাত্রটিকে।

সুভাষ বললে, 'এবার আর ধর্মঘট নয়। এবার অন্য ব্যবস্থা।'

প্রেসিডেন্সি কলেজের সিঁড়ির নিচে ছেলেদের জটলা চলেছে।

এই চুপ! ওটেনের চাপরাশি।

ওটেনের চাপরাশি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি একা? তোমার সাহেব কোথায়?'

'ঘরে।'

'বাড়ি যাবে না?'

'এইবার যাবে।' চাপরাশি চলে গেল।

আবার উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

সুভাষ বললে, 'তোমার সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।'

চাপরাশি শুনেও শুনল না।

একটু পরেই সিঁড়ির মুখে দেখা গেল ওটেনকে। ছাত্রের দল চকিতে সিঁড়ির কাছ থেকে দুভাগে আলাদা হয়ে গেল যাতে ওটেন যাবার পথ পায়। আর যেই ওটেন নেমেছে ছেলেরা দুদিক থেকে

ঘন হয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল। কোলাহল উঠল--এই যে—'হিয়ার হি কামস।' সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে বেদম মার শুরু হল। কে বা কারা যে মারল স্পষ্ট বোঝা গেল না। ওটেন মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেরা হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টলে উঠল!

প্রিন্সিপ্যাল জেমস ওটেনের চাপরাশিকে ডেকে পাঠাল। তার ঘরে আরো অনেক প্রফেসর।

'তুমি মারের সময় ছিলে?'

'না, হুজুর।' চাপরাশির মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

'তুমি মার দেখ নি?'

'না, হুজুর।'

'কে মেরেছে বলতে পারো না?'

'কী করে বলব?'

'তুমি কিছুই জানো না?'

'এই শুধু জানি একজন জিজ্ঞেস করেছিল তোমার সাহেব কখন বাড়ি যাবে—তোমার সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।'

জেমস যেন সমুদ্রে কুটো ধরতে পেল: 'তাকে তুমি সনাক্ত করতে পারবে?'

'পারব।'

'আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের আইডেন্টিফিকেশান প্যারেড করাচ্ছি তুমি সেই ছাত্রটাকে চিনিয়ে দেবে?' প্রফেসর নিবারণ ভটচাজের দিকে তাকাল জেমস: 'দয়া করে আপনি প্যারেডটা করান আর চাপরাশি দোষী ছাত্রটাকে চিনিয়ে দিক।'

জেমসের আশা পূর্ণ হল না। চাপরাশি চেনাতে পারল না। না ইচ্ছে করেই চেনাল না?

ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। কেউ মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর করে রেখেছে, কেউ বা ক্রুদ্ধ, কারু বা মুখে বিকৃতি বা ভ্রূকুটি,

কারু কারু বা স্পষ্ট ভয়। এই ছেলেটা কি সুভাষের মত দেখতে, না, কি সুভাষ দাঁড়ায় নি প্যারেডে? চাপরাশি ছুঁই-ছুঁই করেও কাউকে ছুঁল না।

নিবারণ ভটচাজ চাপরাশিকে জিজ্ঞেস করলে, 'কী, চিনতে পারলে?'

'না, হুজুর।'

'আরেকবার দেখ।'

চাপরাশি আরেকবার দেখল। আরো একবার ধরি-ধরি করে কাউকে ধরল না।

'কী, পারলে চিনতে?' নিবারণ মিহিস্বরে প্রশ্ন করল।

চাপরাশি মুখ হতাশ করে ঘাড় নেড়ে বোঝালে, পারে নি।

কিন্তু দলনেতা, আন্দোলনের অধিপতি বলে সুভাষকে চিহ্নিত করতে বাধা কী। অন্তত সে তো থার্ড ইয়ার আর্টসের ক্লাস-রিপ্রেজেণ্টেটিভ। তাই জেমস সুভাষকে ডেকে পাঠাল।

'তুমি তো থার্ড ইয়ার আর্টসের ক্লাস রিপ্রেজিণ্টেটিভ?' বাঁকা চোখে তাকাল জেমস।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তুমি মিস্টার ওটেনকে মেরেছ?'

'না, স্যার।'

'মারের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে?'

'ছিলাম।'

জেমস বোধহয় আশান্বিত হল। রুক্ষ ভঙ্গিটা একটু মোলায়েম করে আনল। বললে, 'তা হলে বলো তো কে মেরেছে, তাদের নাম কী?'

সুভাষ দৃঢ়তর হল। বললে, 'মাপ করবেন, পরের নাম বলে বেড়ানো আমার অভ্যেস নয়।'

এ বুঝি জেমস মার খেল। মুহূর্তে রূঢ় হয়ে উঠল : 'তা হলে বলো ক্লাস রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিসেবে তুমি দোষী না নির্দোষ ?'

'তা আমি কী করে বলি ?'

'আমি বলছি তুমি দোষী।' জেমস প্রায় গর্জন করে উঠল : 'আমি তোমাকে সাসপেণ্ড করলাম।'

'ধন্যবাদ।' সুভাষ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছেলেদের কেন সংঘর্ষ এ নিয়ে গভর্নমেন্ট এক কমিশন বসিয়েছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার সভাপতি আর দুই সভ্য ডি-পি-আই হর্নেল আর প্রফেসর সুবোধ মহলানবিশ। এখন প্রশ্ন উঠেছে যখন একবার কমিশন বসেছে তখন তার সিদ্ধান্তের আগে প্রিন্সিপ্যাল জেমস সুভাষকে দোষী সাব্যস্ত করে সাসপেণ্ড করতে পারে কি না।

মেজদা শরৎচন্দ্র বললে, 'আমার মতে পারে না। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা সবিস্তারে দেখবার জন্যে কমিশনকে ভার দেওয়া হয়েছে, সে অবস্থায় প্রিন্সিপ্যালের সাসপেণ্ড করার এক্তিয়ার কোথায় ?'

'আমারও তাই মনে হয়।' সুভাষ উৎসুক কণ্ঠে বললে, 'আচ্ছা একবার ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের সঙ্গে দেখা করতে যাব ? দেখি না তিনি কী বলেন।'

'আমার তো মনে হয় আমি যা বললাম তাই বলবেন।'

প্রভাবতী ঘরে ঢুকে সুভাষকে লক্ষ্য করে সস্নেহে তিরস্কারে বলে উঠলেন : 'তোর শাস্তি তো শুধু মোড়লি করবার জন্যে। কী দরকার ছিল মোড়লি করার ?'

সুভাষ বললে, 'না মা, এ মোড়লি নয়, এ হচ্ছে আত্মসম্মানের জন্যে লড়া। আত্মসম্মানের জন্যে যদি স্বার্থত্যাগ করতে হয় তাতে মহৎ আনন্দ আছে। ত্যাগ ছাড়া আবার জীবন কী !'

মাকে আশ্বাস দেবার জন্যে শরৎ বললে, 'বিচার এখন কমিশনের হাতে। দেখি কমিশন কী রায় দেয়।'

সুভাষ বললে, 'যদি কলেজ থেকে তাড়িয়েই দেয় অন্য কাজে লাগা যাবে। কাজের অভাব হবে না। সাফল্য শুধু কলেজে পড়ে পরীক্ষা পাস করে বড় চাকরি করার মধ্যেই নয়, মা, আরো অনেক তার রূপ আছে।'

'না বাপু, ভালোয়-ভালোয় বিপদ কেটে যায়, সব দিক উদ্ধার হয় তবেই বাঁচি।' আশিস-মাখানো দৃষ্টিতে প্রভাবতী তাকালেন ছেলের দিকে : 'কী এক সর্দার ছেলে হয়েছে আমার!'

সুভাষ হেসে বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলেছেন জানো মা? যে শিরদার সেই সর্দার।'

ফাঁসি হবার আগে নীরেন দাশগুপ্ত তার মাকে চিঠি লিখল : 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ বিষণ্ণ হয়ো না। আমরা হিন্দু, শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মৃত্যু ঘটে না।'

আর চিত্রপ্রিয় লিখল : 'মৃত্যু আমার শিয়রে বসে আছে, আমার তাতে ভয় নেই। দেশ স্বাধীন হবার আগে যদি মরি আমি আবার জন্মাব, আবার ইংরেজকে উচ্ছেদ করবার জন্যে যুদ্ধ করব।'

সবাই সেই গীতা-পুরুষ যতীন্দ্রনাথের শিষ্য। আর যতীন্দ্রনাথ লিখল তার দিদিকে : 'ভগবান যাই করেন তাই আমি তাঁর আশীর্বাদ বলে নতমস্তকে মেনে নেব। তিনি যা করেন সমস্ত শুভপ্রদ। আমাদের অজ্ঞানের জন্যেই বিপরীত দেখি। মৃত্যুর মাঝে অন্ধকার নেই, আছে তাঁর অমৃতের স্পর্শ।'

যে শিরদার সেই সরদার।

সতেরো

চিত্তরঞ্জন দাশ রাত্রে ডিনার খাচ্ছেন স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে, বেয়ারা এসে সাহেবের হাতে একটা চিরকুট দিলে। বললে, 'কে এক সুভাষ বোস নামে ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'সুভাষ বোস!' দাশসাহেব চিরকুটটা হাতে নিয়ে পড়লেন: 'থার্ড ইয়ার, প্রেসিডেন্সি কলেজ।' খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়লেন।

বাসন্তী দেবী অবাক মানলেন: 'সে কি, উঠলে কেন? খাওয়াটা শেষ করে যাও। ছেলেটা ততক্ষণ বসুক।'

'না, কেন এসেছে জেনে আসি।'

'এত কী জরুরি?'

'জানো না এ সেই আশ্চর্য তেজী ছেলে যে কলেজের প্রফেসর উদ্ধত ওটেনকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।'

'কেন ওটেন কী করেছিল?'

'কী করেছিল! ছাত্রদের সঙ্গে বন্য ব্যবহার করেছিল, তাদের দেশবাসীদের অপমান করেছিল—'

বাসন্তী দেবী বুঝলেন ব্যাপারটা নিঃসংশয় জরুরি।

দাশসাহেব বৈঠকখানায় এসে দেখলেন একটি গৌরতনু সবল সুন্দর যুবক দাঁড়িয়ে আছে—পবিত্রতার বিধূম পাবকশিখা। ক্ষণকাল তিনি যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তারই মধ্যে সেই যুবক নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে নিয়েছে।

'তুমিই সুভাষ?' দাশসাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: 'তুমিই ওটেনকে শিক্ষা দিয়েছ?'

সুভাষ একটু বুঝি কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমি দলে ছিলাম, আমি কিন্তু তাই বলে—'

'তুমি সত্যি-সত্যি মেরেছ কিনা তাই আমি জিজ্ঞেস করেছি? তুমি দলে ছিলে তার মানেই তুমি দলপতি ছিলে। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ যার চেহারা সে দলপতি না হয়েই যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল কী?'

'প্রিন্সিপ্যাল আমাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' নির্মল মুখে সুভাষ বললে।

'তাড়িয়ে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ, এই নিয়ে আইনের একটা প্রশ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কী প্রশ্ন?'

'প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার হবার আগেই গভর্নমেণ্ট একটা কমিশন বসিয়েছে এ ব্যাপাবে চূড়ান্ত বিচার করবার জন্যে। প্রশ্ন হচ্ছে কমিশন যখন বসে গেছে তখন প্রিন্সপ্যালের কি অর্ডার দেবার আর অধিকার আছে? প্রিন্সিপ্যালই যদি অর্ডার দিল তা হলে আর কমিশন কেন?'

'তোমার পয়েণ্টটা ভালো।' দাশসাহেবের স্বরে যেন আত্মীয়তা ফুটে উঠল: 'আগে দেখা যাক কমিশন কী রায় দেয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত যদি তোমার অনুকূলে হয় তখন প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার নাকচ করা যায় কিনা দেখব আর কমিশনের সিদ্ধান্ত যদি—'

সলজ্জ মুখে হাসল সুভাষ। বললে, 'তা তো ঠিকই। আচ্ছা, আজ তবে আসি।' বলে আবার প্রণাম করল।

'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

সুভাষ চলে যাচ্ছিল ফিরে তাকাল। বুকভরা আশা নিয়ে ফিরে তাকাল। হ্যাঁ, ভগবান করুন আবার যেন দেখা হয়।

এই সেই চিত্তরঞ্জন দাশ যে আলিপুর বোমার মামলায় দায়রা

কোর্টে অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। খালাস করে নিয়েছিল অরবিন্দকে।

এই সম্পর্কে কী বলছে অরবিন্দ? বলছে:

'দায়রা আদালতে মামলা এলে আমি আমার কৌঁসুলিকে লিখে-লিখে উপদেশ পাঠাচ্ছিলাম, আমার বিরুদ্ধে কোন-কোন উক্তি নির্জলা মিথ্যে আর কোন-কোন উক্তি সম্পর্কে কী জেরা করতে হবে। সহসা একদিন দেখলাম আমার সেই পুরোনো কৌঁসুলি আর নেই, তার পরিবর্তে এক নতুন কৌঁসুলি এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে যারা আমার পক্ষ সমর্থনে উকিল ব্যারিস্টার নিয়োগে ভারপ্রাপ্ত ছিল বুঝলাম এ তাদেরই মনোনয়ন। দেখে মন-প্রাণ ভরে উঠল। ভাবলাম একেও লিখিত উপদেশ পাঠাই। তক্ষুনি অন্তর থেকে আদেশ হল এই সেই লোক যে তোমাকে চক্রান্তপাশ থেকে মুক্ত করবে। তাকে আর তোমাকে উপদেশ পাঠাতে হবে না, তোমার ও সব চিরকুট ছিঁড়ে ফেল। তাকে যা উপদেশ দেবার আমি দেব, তুমি নয়। সেই থেকে আমি আর একটিও কথা বলি নি, পাঠাইনি একছত্র উপদেশ। পরে দেখেছি আমি যা উপদেশ দেব বলে ভাবতাম তা কত ভঙ্গুর কত অসার। আমি আমার সর্বস্ব আমার সেই কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাশের হাতে সমর্পণ করে দিলাম। আর কী একান্তচিত্ততায়, সমস্ত প্র্যাকটিসে জলাঞ্জলি দিয়ে চিত্তরঞ্জন, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস খালি ভেবেছে আর লড়েছে আমি কী করে বাঁচব, জেলের বাইরে থাকব। আর ভাবতে-ভাবতে, লড়তে-লড়তে, কী বলব, তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল।'

অরবিন্দের হয়ে আদালতকে বলছে চিত্তরঞ্জন: 'যদি এ দেশের আইন এই হয়, যে স্বদেশের স্বাধীনতা-প্রচার অপরাধ, তবে আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক। তার জন্যে সাক্ষ্য সাজাবার প্রয়োজন নেই। এর জন্যেই আমি আমার

জীবনের সমস্ত পার্থিব আশা বিসর্জন দিয়েছি, এই আদর্শ নিয়ে বাঁচবার ও খাটবার জন্যেই চলে এসেছি কলকাতায়। আমি জানি আমার দায়িত্ব—সে আর কিছুই নয়, আমার দেশবাসীকে সচেতন করে দেওয়া যে জগৎসভায় তারও এক মহৎ ব্রত উদযাপন করবার আছে—'

'কিন্তু বোমা ছোঁড়া?' বিচারক বিচক্রফ্‌ট জিজ্ঞেস করলে চিত্তরঞ্জনকে: 'ইংরেজের উপর বোমা ছোড়া? সমর্থন করে আসামী?'

চিত্তরঞ্জন বললে, 'যদি কেউ বোমা নিয়ে এসে অরবিন্দকে বলে যে-ইংরেজটাকে প্রথম দেখব তারই উপর ছুঁড়ব এটা, তা হলে অরবিন্দ প্রশ্ন করবে, তাতে কি দেশ স্বাধীন হবে? সুনিশ্চিত উত্তর হবে, না, তা হবে না। সেই উত্তর শুনে অরবিন্দ বলবে, তবে ছুঁড়ো না।'

'কিন্তু যদি উত্তর হয়,' বিচক্রফ্‌ট সুচতুর প্রশ্ন করলে, 'হ্যাঁ, ছুঁড়লে দেশ স্বাধীন হবে, তা হলে অরবিন্দ কী বলবে?'

'বলবে ছোঁড়ো।'

সমস্ত আদালত বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কিন্তু মনে রাখবেন—'ছুঁড়লে দেশ স্বাধীন হবে' এ প্রত্যয়টা অকপট হওয়া দরকার।' চিত্তরঞ্জন বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন: 'যদি গভর্নমেণ্টের ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের ফলে দেশের লোক একতাবদ্ধ হয়ে ওঠে আর তাদের আয়ত্তে এমন রণসম্ভার থাকে যে তা দিয়ে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লড়তে পারে, তা হলে অরবিন্দ নিশ্চয়ই সে যুদ্ধের সমর্থন করবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নয়—'

চিত্তরঞ্জন কি সেদিন সুভাষের আজাদহিন্দ ফৌজের পূর্বাভাস পেয়েছিল?

তারপর বক্তৃতার শেষভাগে চিত্তরঞ্জন কী চমৎকার বললে।

বললে : 'আদালতের কাছে আমার এই নিবেদন যে এই আসামী, শুধু এই আদালতের বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, এ ইতিহাসের উচ্চতম আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী। এসব তর্কবিতর্ক ও কলকোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবার অনেক পর, হয়তো বা এই আসামীর তিরোধানেরও পর, এই ব্যক্তিই দেশপ্রেমের জীবনকবি বলে অভিনন্দিত হবে। অভিনন্দিত হবে জাতীয়তার মহাপুরুষ ও মানব-প্রেমিক বলে। এর তিরোধানের বহুদিন পর এর বাণী শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাই বলছি এ শুধু এ আদালতে বিচায়ের জন্য দাঁড়ায় নি, এ দাঁড়িয়েছে ইতিহাসের বিচারালয়ে।'

'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায় ?
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে দেশের উদ্ধার।'

কিন্তু এখন সুভাষকে কে উদ্ধার করে ?

কমিশন তলব করল সুভাষকে। কমিশন বলতে মাঝখানে স্যার আশুতোষ আর দুপাশে হর্নেল আর মহলানবিশ। সুভাষ কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

কমিশন কি তাকে নির্দোষ বলবে ? যেরকম সব গম্ভীর চেহারা, মনে হয় না।

আশুতোষের কি মনে আছে তিনিও একদিন ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন ?

হাইকোর্টের জজ নর্টন শালগ্রামশিলাকে কোর্টে হাজির করার হুকুম দিল। এই আদেশ চরম বর্বরতার দৃষ্টান্ত—এই কথা ঘোষণা করল সুরেন্দ্রনাথ। ফলে সুরেন্দ্রনাথের আদালত অবমাননার দায়ে দু মাসের জেল হয়ে গেল। আর সেই অবিচারের বিরুদ্ধেই ছাত্রবিক্ষোভের নেতৃত্ব করেছিল আশুতোষ।

প্রেসিডেন্সি কলেজেও তো এ একটা ছাত্রবিক্ষোভ। কিন্তু বিচারসমাসীন আশুতোষের প্রাণে কি দয়াদাক্ষিণ্য আছে?

'তোমাকে একটা সরাসরি প্রশ্ন করি, মিস্টার ওটেনকে যে ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে মার দিল তা তুমি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করো?'

সুভাষ বললে, 'সমর্থনযোগ্য হয়তো নয় কিন্তু ছাত্ররা কী রকম প্ররোচিত হয়েছিল তা বিচার করে দেখা দরকার। প্রেসিডেন্সি কলেজে গত কয়েক বছর ধরে ইংরেজ প্রোফেসররা কী অনাচার অত্যাচার করেছে তা যদি আমাকে বলতে দেন দেখবেন ছাত্ররা নিরুপায় ছিল কি না—'

কমিশন শুনল, লিখল, রায় দিল।

'অই যে জগৎ জাগে, স্বদেশ অনুরাগে
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন, নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে।
ভাঙবে নাকি এ কাল নিদ্রা রইবে এ ভাব যুগে যুগে।
পেয়ে পরের প্রসাদ যায় কি বিষাদ
এ অবসাদ কোন বিরাগে।
থাকতে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ, দাগা বুলায় পরের দাগে।
করে গৃহশূন্য পরের জন্য লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে॥
সমুন্নত সর্বজাতি আমরা কেবল অধোভাগে,
এবার মন্ত্রসাধন করেছি পণ ছাড়ব না তা প্রাণবিয়োগে।
প্রাণে যখন আবেগ আসে শত্রু ভাষে হুজুগ চাগে।
বিশারদ কয় সেই ত সময় কার্য সারো সেই সুযোগে॥'

এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষের দাদারা আলাপ-আলোচনা করছে। অদূরে সুভাষ বসে আছে। শরৎচন্দ্রের হাতে কমিশনের রিপোর্ট।

শরৎ বললে, 'ছাত্রদের সম্পর্কে একটাও ভালো কথা লেখে নি।'

বড়দা সুরেশ জিজ্ঞেস করলে, 'আর সুভাষ?'

'নাম ধরে একমাত্র ওর কথাই তো পাঁচ কাহন বলা হয়েছে।'

'ওর সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা কী?'

শরৎ বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল যে অর্ডার দিয়েছে তারই সমর্থন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কার।'

সুভাষ উঠে পড়ল। ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'তার মানেই রাস্টিকেশন।'

'হয়তো ওরকম কিছু নয়, দেখি—' শরৎ আশ্বাস দিতে চাইল।

'আমি এখন তবে কী করব?' উপদেশ চাইল সুভাষ।

'আমি বলি কী, কটক চলে যা।' বললে শরৎ, 'বাবার অসুখ শুনে মা চলে গিয়েছেন, এখন তাঁরা দুজনেই তোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন, তোকে কাছে পেলে অনেকটা সামলে উঠতে পারবেন। তা ছাড়া—'

সুরেশ গম্ভীর মুখে বললে, 'সেইটেই আসল কারণ।'

'তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছিস না পুলিস কেমন কলকাতায় ধর-পাকড় শুরু করে দিয়েছে।' শরৎ বললে বুঝিয়ে, 'তোর উপর তাদের আক্রোশ। যখন দেখবে কলেজ থেকে নামকাটা হয়ে চুপচাপ বসে আছিস তোকে ঠিক য়্যারেস্ট করবে। তুই যা বাবা-মার কাছে কটক চলে যা।'

সুভাষ বিনীতস্বরে বললে, 'তাই যাব।'

পুলিস আর পুলিস! পুলিস কেন ধরিয়ে দেয় বিপ্লবীদের? পুলিস কি ভারতবাসী নয়? পুলিস কি চায় না ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক, ইংরেজ চলে যাক তড়িঘড়ি? তবে তারা বিপ্লবকে কেন বিধ্বস্ত করতে ব্যস্ত? তারা কি চায় তাদের গোলামি বংশানুক্রমিক অব্যাহত থাকুক? চাকরি—চাকরির কথা বলো তো, দু কুড়ি সাত ফোঁটা বজায় রেখে খেলা রাখতে পারে না? কেন অমানুষিক উৎসাহে মারধোর করে, অপমান করে? এটাও চাকরি? পুলিস হলে কি মায়াদয়া থাকতে নেই?

তারপরে সৈন্যদল? পরশাসনকে বাঁচিয়ে রাখতেই তাদের

জীবনধারণ? দেশের মুক্তির জন্যে তারা একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে পারে না?

বিপ্লবী মোহনলাল বর্মায় এসেছে বর্মা থেকে ভারত-আক্রমণের তোড়জোড় করতে। সৈন্যদলে সে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করল। গোপনে তাদের সঙ্গে দেখা করে বক্তৃতা দিল, বোঝাল: 'কে তোমাদের ইংরেজ? ইংরেজ তো বিধর্মী, বিদেশী, তোমাদের দেশকে শুধু পশুবলে পদতলে রেখেছে? এ যন্ত্রণা তোমরা তোমাদের শরীরের রক্ত চলাচলে অহর্নিশ অনুভব কর না? সেই পরলোভী ইংরেজের জন্যে প্রাণ দেবে? মাতৃভূমির জন্যে প্রাণ দেওয়াই কি বীরের কর্তব্য নয়?'

বেশি দিন পারল না বক্তৃতা দিতে। সৈন্যবিভাগের এক জমাদার মোহনলালকে ধরিয়ে দিল। মোহনলাল সে বিশ্বাসঘাতকতায় বিমূঢ় হয়ে গেল। জমাদারকে গুলি করবার জন্যে রিভলভার তুলল না, নিজেও চেষ্টা করল না পালাতে। শুধু বললে, 'ভাই হয়ে ভাইকে ধরিয়ে দিলে!'

মনে করো প্রফুল্ল চাকীর কথা। নন্দলালকে বললে, আপনি বাঙালি হয়ে বাঙালিকে ধরলেন?

'সরকার সেলাম!' কী বর্বর নিয়ম! সরকারী কোনো কর্মচারী জেলে পরিদর্শনে এলেই কয়েদীকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, সরকার সেলাম!

বলব না, বলতে পারব না। মোহনলাল ঘাড় সোজা করে রইল। যতই অত্যাচার চালাও না, আমি তোমাদের কাউকে নয়, শুধু আমার নিজের বীর্যবান মানুষসত্তাকে নমস্কার করব।

মৃত্যুদণ্ডে ভূষিত হল মোহনলাল। জেলে বর্মার লাটসাহেব এল তাকে বোঝাতে, ক্ষমা চেয়ে একটা প্রার্থনাপত্র পাঠাও।

মোহনলাল বললে, 'আপনি আপনার কাজ করুন, আমাকেও আমার অন্তিম কর্তব্য সম্পাদন করতে দিন।'

রাজপুত বিপ্লবীদের নেতা প্রতাপ সিং রাসবিহারী বসুর ডান হাত। একুশ বাইশ বছরের যুবক, তেজে-গরিমায় মনে হয় যেন সেই ঐতিহাসিক প্রতাপ সিং। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করে পুলিস তাকে জেলে পুরল। তারপর শুরু করল অকথনীয় অত্যাচার। দিল নানা দুর্মন্ত্রণা। অর্থের বিপুল প্রলোভন দেখাল। শুধু দলের লোকদের নামগুলো বলে দাও। অসম্ভব। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, আমাকে তিল-তিল করে দগ্ধ করলেও আমি ভ্রষ্ট হব না। আমি অধৃষ্য, অপরাজেয়। আমি অখণ্ডনিশ্চিন্ত।

শঠশিরোমণি পুলিস তাকে ছেলেভুলুতে চাইল। 'তোমার মা কত কাঁদছেন তোমার জন্যে। তুমি যদি বলে দাও, কথা দিচ্ছি, এক্ষুনি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দেব।'

প্রতাপ সিং বললে, 'আমার মা, শুধু একটি মা-ই কাঁদুন। এক মার কান্না থামাতে গিয়ে আরো অনেক মাকে আমি কাঁদাতে পারব না।'

পুলিসের অত্যাচারে প্রতাপ সিং জেলের মধ্যেই মারা গেল।

ট্রেনে করে কটক চলেছে সুভাষ। বাঙ্কে শুয়ে আছে আর গুনগুন করে গাইছে:

'কত কাল পরে বল ভারতরে, দুখসাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদহিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, এ কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজবাসভূমে পরবাসী হলে, পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে, বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে, পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে
তুমি অন্ধ হয়ে পরস্বর্গসুখে, তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে।
পর ভাষণ আসন আনন রে, পর পণ্যে ভরা তনু আপণ রে
পর দীপশিখা নগরে-নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে॥'

বাড়িতে ঢুকেই বৈঠকখানায় জানকীনাথকে দেখে প্রণাম করল সুভাষ।

'তুই ? কী খবর ?' জানকীনাথ উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

সুভাষ স্থির স্বরে বললে, 'কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইলেন জানকীনাথ। জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না ?'

'অন্য কলেজে ভর্তি হবার অনুমতি চেয়ে ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করেছিলাম, সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নি।'

'আমি জানতাম তাই হবে।' জানকীনাথ হতাশ মুখে বললেন, 'নেতৃত্ব করতে গেলে এই পুরস্কার।'

সুভাষ বললে বিনম্র কণ্ঠে, 'একজনকে তো নেতা হতেই হবে।'

'এখন তবে কী করবে ?'

প্রভাবতী ছেলের সাড়া পেয়ে ব্যাকুল হয়ে চলে এলেন। 'ওরে সুবি এলি ? কখন এলি ? কী হল ?'

জানকীনাথ কঠিন মুখে বললেন, 'ওকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তা ও কী করবে !' প্রভাবতী ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়ালেন : 'সকলের হয়ে লড়তে গিয়েছে আগ বাড়িয়ে তাই ওরই উপরে কোপ পড়েছে। এখন কদিন আর বাড়ি থেকে কোথাও বেরুনো নয়। শুধু বিশ্রাম।'

'তোমার এ ছেলে বিশ্রাম বলে কিছু জানে নাকি ?' জানকীনাথও ছেলের প্রতি স্নেহপ্রশ্রয়ান্বিত হয়ে উঠলেন : 'দেখবে কোথাও বসন্ত বা কলেরা লেগেছে, তারই সেবায় বেরিয়ে পড়েছে। তারপর যোগযাগ আছে না ? সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়া ?'

সুভাষ দু পা কাছে এগিয়ে এল। বললে, 'বাবা, আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিন না, সেখানে গিয়ে পড়ি।'

'তার আগে এই রাস্টিকেশনের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হও।' জানকীনাথ সুভাষের মুখের দিকে তাকালেন : 'একটা রাস্টিকেটেড ছেলে বিদেশের কলেজে গিয়ে মুখ দেখাবে কী করে ?'

সুভাষের মুখ বেদনার্ত হয়ে এল।

জানকীনাথ পরমুহূর্তেই কথায় স্নেহ ঢাললেন: 'আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডিগ্রি আদায় করো, তারপর বিলেত।'

সুভাষ ভাবলে, এখন উপায় কী। ভাবলে সরাসরি একবার গিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। স্যার আশুতোষের সঙ্গে নয় শুধু আশুতোষের সঙ্গে। যে আশুতোষ বাঙালি, যে আশুতোষ বদান্য, শিবভদ্র, বিশালস্নেহ। এবং উদারধী। দেখি না কী হয়। কী বলেন! মহতের কাছে যেতে ভয় কিসের? যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।

সরাসরি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল সুভাষ। ঘরে ঢুকে আশুতোষকে প্রণাম করে দাঁড়াল। বললে, 'আমি আপনার কাছে এলাম।'

আশুতোষ চমকে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। 'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, আমি ইউনিভার্সিটির কাছে আসি নি, হাইকোর্টের কাছেও আসি নি, আমি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এসেছি।'

আশুতোষ যেন চিনতে পারলেন। 'তুমি—তুমি সুভাষ না?'

সুভাষ নীরবে সম্মতি দিল।

আশুতোষ জিজ্ঞেস করলেন: 'এতদিন কী করছিলে?'

'বসেছিলাম। ইউনিভার্সিটি বাধাটা সরিয়ে না নিলে কোনো কলেজে ভর্তি করছেনা।'

'তুমি ম্যাট্রিকুলেশানে স্ট্যাণ্ড করেছিলে?'

'সেকেণ্ড হয়েছিলাম।'

'আই-এতে?'

'আই-এতে রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল। কিন্তু বি-এটা দিতে দিন ফিলসফি অনার্স নিয়ে, ঠিক ফার্স্ট ক্লাস পাব।'

আশুতোষ তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন: 'কী করে জানলে পাবে?'

সুভাষ অপ্রতিভ হল না। বললে, 'আমার অন্তরপুরুষ বলছে, আমি ঠিক বেরিয়ে যাব, আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

আশুতোষ স্বর গম্ভীর করলেন: 'বাধা তুলে নিলে কোন কলেজ তোমাকে নেবে?'

'স্কটিশচার্চ নেবে আর স্বয়ং আর্কুহার্ট সেখানে ফিলসফি পড়ান।'

'ফের গোলমাল বাধাবে না তো?'

কথায় বুঝি একটু স্নেহের টান পেল সুভাষ, তাই সাহস করে বললে, 'আমি বুঝি মিছিমিছি গোলমাল বাধাই!'

আশুতোষ প্রসন্ন মুখে বললেন, 'বেশ, আমি বাধাটা সরিয়ে নেব। কিন্তু—তাই তো জিজ্ঞেস করেছিলাম এত দিন কী করছিলে?'

'এত দিন!'

'হ্যাঁ, প্রায় দুবছর তো পিছিয়ে পড়লে! বলছিলাম আরো আগে আস নি কেন?'

সুভাষ আরো একটু এগিয়ে এল, বললে, 'বললামই তো আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাইসচ্যান্সেলারকে দেখেছিলাম, তার ভেতরের আশুতোষকে চিনতেই দেরি হয়ে গেল।'

'এমন সুন্দর একটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুমি নষ্ট করে দিতে বসেছিলে?' আশুতোষ আশীর্বাদ ভরা চোখে তাকালেন: 'কিন্তু মনে থাকে যেন শুধু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নয়, সত্যিকার মানুষ হওয়া চাই।'

'মেবার পতনে'র সেই শেষ গান সুভাষের মনে পড়ল:

'কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ॥'

আঠারো

স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হল সুভাষ আর পড়াশোনায় মন দিল।

কিন্তু শুধু কলেজী জীবনের একঘেয়েমি নিয়ে তার মন পরিতৃপ্ত হতে চায় না। আগে আগে জনসেবার উদ্দেশ্যে অনাথ ভাণ্ডারের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করেছে, কত প্রত্যক্ষ সেবা করেছে কলেরা আর বসন্ত রুগীদের। লজ্জা নেই ভয় নেই ঘৃণা নেই—মানুষকে সেবা করতে পারছে এই তার আনন্দ—আত্মোৎসর্গের আনন্দ। বাড়ির লোকদের জানতেও দেয় নি যে সে ভিক্ষে করে, জানতেও দেয় নি কলেরার ইনজেকশান বা বসন্তের টিকে না নিয়েই সে ঐ দুই ভয়াবহ রোগের সম্মুখীন হয়। রুগীর ঘর থেকে ফিরে এসে কাপড় চোপড় বদলাবার কথাও সে মনে রাখে না, হাতও ঠিক মত ধোয় কিনা তার ঠিক নেই। সেবাব এমন উন্মাদনা যে নিজের স্বাস্থ্যই বিপন্ন হচ্ছে কিনা গ্রাহ্য করে না। দেশ তো মাটি নয়, দেশ মানুষ। মাটি পেলাম অথচ মানুষ মরে গেল সে স্বাধীনতার দাম কী? স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, ক্ষুধার থেকে মুক্তি, রোগের থেকে মুক্তি অজ্ঞানের থেকে মুক্তি, সংশয়ের থেকে মুক্তি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে সর্বাগ্রে চাই পরাধীনতা থেকে মুক্তি, কিন্তু সেইখানেই তপস্যার শেষ নয়। তপস্যার আরম্ভও মানুষে, শেষও মানুষে, মানুষের মহত্তম মঙ্গলে। আদ্য-অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথকে মনে করো।

'হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল থেকে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত

নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করে এতক্ষণে ঘরে ফিরেছে, তাকে সম্ভাষণ কর, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরিয়ে এনেছে তাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হয়েছে তাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে যে মুসলমান নমাজ পড়ে উঠেছে তাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বেয়ে ব্রহ্মপুত্রের কূলউপকূল দিয়ে একবার বাংলা-দেশেব পূর্ব-পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করে দাও—আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এত-ক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢেলে দিয়েছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকালে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম' গীতধ্বনি এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে যাক—একবার করজোড় করে নতশিরে বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর ঃ

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান।'

কলেজে ঢুকে সুভাষ খবর পেল ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সে বিশ্ব বিদ্যালয়কে একটা ছাত্রবাহিনী গড়ে তুলতে গভর্নমেণ্ট অনুমতি দিয়েছে। সুভাষ ঠিক করল এই বাহিনীতে ঢুকবে। আগে এক বার খোদ বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে ঢোকবার জন্যেই সে দরখাস্ত করেছিল। শরীরের আর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চোখের দোষেব জন্যে সে বাতিল হয়ে গেল। এবার স্বাস্থ্যপরীক্ষায় বোধহয় তত কড়াকড়ি হবে না। তার আগে ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করি। উনি ইচ্ছে করলে চোখ বুজেই আমাকে নিয়ে নিতে পারেন।

'কাকে চাই ?' ঘরে আগন্তুক ঢুকতেই সর্বাধিকারী উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'আমি ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীকে চাই।'

'আমিই ডাক্তার সর্বাধিকারী। কেন, কী দরকার ?'

ভেবেছিলেন কোনো অস্ত্রোপচারের কেশ হয়তো, কিন্তু এ ছেলের মুখে একেবারে নতুন কথা।

'নমস্কার।' সুভাষ বললে স্নিগ্ধকণ্ঠে, 'আমি স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এ পড়ি। আমি ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সের ইউনিভার্সিটি ইউনিটে যোগ দিতে চাই।'

সর্বাধিকারী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: 'বা, বেশ ভালো কথা। আমি তো বরাবর বাঙালি ছেলেদের বলছি মিলিটারি ট্রেনিং নিতে। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না।'

'আমারো সেই মত।'

সর্বাধিকারী পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন সুভাষকে। কী রকম দৃঢ় দৃপ্ত বীর্যবন্ত চেহারা। আর কেমন তেজস্বী কণ্ঠস্বর। এতটুকুও দ্বিধা বা জড়িমা নেই।

'বেশ তো তা হলে ভর্তি হয়ে যাও।'

'আমার স্বাস্থ্যটা পরীক্ষা করে দেখুন।' সুভাষ এগিয়ে এল ত্বপা: 'যদি ফিট সার্টিফিকেট দেন, তা হলে আমি ইউনিটে ঢুকে পড়ি।'

'তোমাকে তো বেশ সুস্থ-সবলই দেখাচ্ছে। আর জানো, সর্বাধিকারী মৃত্থ হাসলেন: 'শরীরের যা কিছু রোগ আছে মিলিটারি পোশাক পরলেই তা দূর হয়ে যায়।' এক মিনিটে মন স্থির করে ফেললেন: 'দেখতে হবে না আমি দিচ্ছি তোমাকে ফিট সার্টিফিকেট। ইংরেজই আমাদের আনফিট করে রেখেছে। আমার মনে হয় যে ছেলে কাঁধের উপর বন্দুক তুলতে পারবে সেই ফিট।'

সুভাষ ভর্তি হয়ে গেল ইউনিটে।

ইউনিফর্ম পরে প্যারেড করছে। কী মুক্তচ্ছন্দ আনন্দ এই পদক্ষেপে—শুধু এগিয়ে চলা, পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে চলা, যত দৈন্য আর ভীরুতা, জাড্য আর জড়তাকে নিষ্পেষিত করে, যত ব্যথা বাধা আর ব্যাঘাতকে বিচূর্ণ করে, যত স্তূপীভূত অশিব জঞ্জালকে ভস্মীভূত করে—শুধু এগিয়ে চলা—আমি অগ্রগ, আমি অযোধ্য, আমি অবার্য। দুঃখের খন্তায় জীবনের কঠিন পাথর কেটে সোনার খনি আবিষ্কার করতে চলেছি। সেই সোনার খনির নাম স্বাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা. মানুষের স্বাধীনতা।

'আমি ভয় করবনা, ভয় করবনা।
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না
কান্নাকাটি করব না॥
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না
ঘবেব কোণে সবব না॥'

বেলঘরিয়ায় গিয়ে চাঁদমারি অভ্যেস করছে, মক-ফাইট করছে, শিবায়-শিবায় অনুভব করছে রাজসিক উত্তেজনা, তেজের বহ্নিপ্রবাহ। সেই যে বন্ধু হেমন্তকে লিখেছিল একবার, 'চাই শিরায় শিরায় রজোগুণ, চাই লম্ফের দ্বারা পর্বত উল্লঙ্ঘন'—সেই কথা মনে পড়ছে।

শ্রীতে ও শক্তিতে সমন্বিত কী সুন্দর দেখাচ্ছে সুভাষকে। সমস্ত রূপ ছাপিয়ে চরিত্রেব বিমলজ্যোতি দিব্য লাবণ্য এঁকে দিয়েছে।

সেই কথাই সেদিন বললে এক সতীর্থ, 'তোকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে সুভাষ।'

লোকমনোহর হাসি হাসল সুভাষ। বললে, 'কোথায় আগে একদিন সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলাম, আজ আবার সৈন্য হতে চলেছি। সন্ন্যাসী আর সৈনিক দুজনকেই মেলাব একসঙ্গে। শুধু সন্ন্যাসী

হয়ে আত্মসুখ আত্মমোক্ষ চাইব না, আবার শুধু সৈনিক হয়ে পার্থিব ভোগেই আবদ্ধ থাকব না। যোগ আর যুদ্ধকে একসঙ্গে মেলাব। চাই সন্ন্যাসীর ত্যাগ সৈনিকের কর্মিষ্ঠতা। চাই সন্ন্যাসীর নির্বেদ সৈনিকের দুঃসাহস। আমি সন্ন্যাসী, সৈনিক-সন্ন্যাসী।'

বন্ধু হেমন্তকে লিখেছিল: একদিকে ভগবৎ-তন্ময়তা অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—কর্মময়তাই জীবন। একদিকে শান্ত ও সমাহিত আত্মদর্শন, আরেকদিকে পাশ্চাত্ত্যদের প্রকাণ্ড লেবোরেটরিতে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত বিজ্ঞান দর্শন। ইচ্ছে করে ওদের দেশে গিয়ে জ্ঞানার্জনে মজে যাই, জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেবার আগে জগৎটাকে একবার দেখি—যে কিছু দেখে নি সে মায়া বলে কী করে? যে কিছু অর্জন করে নি সে ত্যাগ করবে কী! দান যে করব সঞ্চয় কোথায়? তখন মনে হয় একবার ওদের কর্মের স্রোতে ঝাঁপ দিই, তারপর দেখি—সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সেই স্রোতকে চালিত করতে পারি কিনা।

না, পরীক্ষার পড়ায় অবহেলা করে নি সুভাষ, বি-এতে দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে প্রেসিডেন্সির সত্যেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুবছর দেরি হয়ে গেল সুভাষের। কোথায় ১৯১৭তে বি-এ পাস করবে, তা নয়, ১৯১৯ হয়ে গেল।

কিন্তু বাবা—বাবা ডাকছেন কেন?

'আমাকে ডেকেছেন বাবা?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

'খবরটা শুনেছ?' জানকীনাথ স্মিতপ্রসন্ন চোখে তাকালেন ছেলের দিকে।

'শুনেছি। পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছি।'

ভেবেছিল বাবা বুঝি এবার ফার্স্ট না হওয়ার জন্যে অনুযোগ দেবেন, কিন্তু একী অভিনব প্রস্তাব! জানকীনাথ প্রশ্ন করলেন: 'বিলেত যেতে চেয়েছিলে না? যাবে?'

সারা শরীরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল সুভাষ : 'যাব।'

'আই. সি. এস পড়ে পাস করে ফিরতে হবে :'

সুভাষ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে গেল : 'আই. সি. এস! ইংরেজদের অধীনে চাকরি।'

'হ্যাঁ, চাকরির মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাকরি।' জানকীনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'সমস্ত বাঙালি সমাজের সুখস্বপ্ন! দেখ ভেবে দেখ।'

সুভাষ নতনেত্রে চুপ করে রইল।

'চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি।' বসে ছিলেন উঠে পড়লেন জানকীনাথ। বললেন, 'যদি পড়তে রাজি থাকো, যত শিগগির সম্ভব বেরিয়ে পড়তে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। বিলেতে পৌঁছে পড়ে পরীক্ষাব জন্যে তৈরি হতে মাস আষ্টেকের মত সময় পাবে। তাই শুভস্য শীঘ্রং। দেখ ভেবে দেখ।' জানকীনাথ চলে গেলেন।

শরৎচন্দ্র এক ধাবে বসে খবরেব কাগজ পড়ছিল, তাকে উদ্দেশ করে সুভাষ জিজ্ঞেস করল : 'মেজদা, যাব?'

'বা, যাবি বই কি।' শরৎ মুখের থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে নিল : 'এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে?'

'আট মাসের মধ্যে পারব?'

'না পারলে না পারবি।' বিষয়টা সহজ করে দিল শরৎ : 'তোর বিষয় মেণ্টাল মর‍্যাল সায়েন্সে ট্রাইপস নিয়ে আসবি।'

'আর যদি পারি?'

'তখনকাব কথা তখন।' আরো সহজ করে দিল শরৎ।

'মেজদা,' আরো যেন একটু সন্নিহিত হবার চেষ্টা করল সুভাষ : 'জালিয়ানওয়ালাবাগে কী সব কাণ্ড ঘটে গেছে শুনছি।'

'ভাসা-ভাসা খবর আসছে।' শরৎ খবরের কাগজটা একটু নাড়ল চাড়ল : 'পাঞ্জাবে মার্শ্যাল ল জারি হয়েছে তাই খবর ঠিক মত আসছে না।'

'ভাসা-ভাসা কী শুনছ?'

'একটা পাঁচিল ঘেরা জায়গার মধ্যে সমবেত স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর উপর উদ্দাম গুলি চালিয়েছে। সভায় লোক যখন আসে তখন বাধা দেওয়া হয় নি, এসে জমায়েত হবার পরও বলা হয় নি যে চলে যাও, চলে না গেলে গুলি চালাব। কাউকে কিছুমাত্র সতর্ক না করেই সোজাসুজি গুলি বর্ষণ শুরু করে দিল। তা—' শরৎ মধ্য পথে সংযত হল: 'তোমার এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি ছাত্র, তোমার এখন অধ্যয়নই তপস্যা।'

'ঠিক।' সুভাষ চকিতে মন স্থির করে ফেলল। বললে, 'যাই বাবাকে বলি গে। আই. সি. এস. পড়তে বিলেত যাব।'

উনিশশো আঠারো সালের নভেম্বরে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল আর পরের বছর মার্চ মাসেই পাস হয়ে গেল রাউলাট য়্যাক্ট। যুদ্ধ-বিজয়ের কী পরম পারিতোষিকই ইংরেজ গভর্নমেণ্ট উপহার দিল ভারতবর্ষকে। কী-সব প্রাণারাম বিধান! সন্দেহ হলেই পুলিস যে কাউকে গ্রেপ্তার করে ইচ্ছামত নির্বাসনে পাঠাতে পারবে। সন্দেহের ভিত্তি কী, তা প্রকাশ করবারও তার দায় থাকবে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো উকিল দিতে পারবে না আসামী। আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না। চলবে না সমালোচনা। ক্রূরকর্মা পুলিসেরই ইন্দ্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাউলাট কে? এক হাইকোর্টের জজ যে সিডিশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। জজের নাম দিয়েই আইন প্রণয়ন হল, যেন কত সুবিচারের সৌরভ ছড়িয়ে আছে এর ছত্রে-পত্রে। বিচারের নামে বর্বরতার চূড়ান্ত। গভর্নমেণ্টকে সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে সমালোচনা করলেও রাউলাট, কোনো ধর্মীয় কলহ হলেও রাউলাট। যখন যেমন সুবিধে, মুখর কণ্ঠকে স্তব্ধ করো, উদ্যত আয়োজনকে বিধ্বস্ত করে দাও। অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ো।

'শাসন-সংযত কণ্ঠ, জননি, গাহিতে পারি না গান
তাই মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।

সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার
কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার।
তবু হাসিমুখে বলি বার বার
'সুখী কেবা আর মোদের সমান।
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর
হায় হায় এ কী কঠোর বিধান॥'

না, এই কঠোর বিধানকে প্রতিরোধ করতে হবে। তারই জন্যে তৈরি হল মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ। ছয়ুই এপ্রিল সমস্ত ভারতময় হরতাল ঘোষিত হল।

কিন্তু কদিন আগেই, ৩০শে মার্চ, হরতাল এসে গেল দিল্লিতে। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে একটা ভেণ্ডরকে খাবার বিক্রি করতে বারণ করার থেকেই বেধে গেল হাঙ্গামা। তিল থেকে তাল, শুরু হয়ে গেল পুলিসে-জনতায় সংঘর্ষ। পুলিস গুলি চালাল, জনতার আট জন মারা গেল, আব আহত হল অনেকে।

আন্দোলনে এই প্রথম জনতা জাগ্রত হল। আর কে না বোঝে, সার্থক বিপ্লব জাগ্রত জনতার দ্বাবাই সম্ভব। আর এই জনতাকে জাগাবার জন্যেই তিল তিল কবে জনে-জনে দিতে হয়েছে রক্তবীজ। জন ছাড়া জনতা কোথায়?

কী আশ্চর্য, এই দিন জেনাবেল ডায়ার সস্ত্রীক দিল্লিতে ছিল। জনতার চিৎকার শুনে ভেবেছিল কোনো উৎসব বোধ হয়। ভিড়ের জন্যে গাড়ি থেমে পড়েছিল, থামতেই দুটো লোক গাড়ির পিছন দিকে উঠে পড়ল, বললে, নেমে এস, আজকের দিনে সাহেবদের গাড়ি চড়া নেই। একটা ঘোড়সওয়ার পুলিস এসে তাড়া করল লোক দুটোকে, তারা পালাতেই ডায়ার ড্রাইভারকে বললে, ছোটো। যথাসম্ভব বেগে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার। জলন্ধরে তার গাড়িতে

টিল পড়ল, পথে আবার কে কাঠ পেতে রেখেছে যদি গাড়িটা ওলটায়। ডায়ার বোধ হয় মনে মনে হাসছিল আর বলছিল, প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কী করছে, কাকে খোঁচাচ্ছে।

ছয়ুই এপ্রিল লাহোরের হরতাল নিদারুণ সফল হল, সব দোকানপাট বন্ধ, সমস্ত অফিস-আদালত পক্ষাহত। কালো নিশানধারী মিছিল চলল সারাদিন। মুখে শুধু এক বুলি, 'কিং জর্জ মরে গেছে।' আর সাহেব দেখলেই গালাগাল। গুলিগোলা নেই, গালাগালই গুলিগোলা।

গান্ধি তখন বম্বেতে, দিল্লি কেন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে হিংসাত্মক কাজ করল, কেন নিষ্ক্রিয় থাকল না, তলিয়ে দেখবার জন্যে বম্বে থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলেন। গান্ধিকে যেতে দিলে গভর্নমেন্টের ভালোই হত, দিল্লির বিক্ষুব্ধ জনতাকে তিনি অনায়াসে শান্ত করতে পারতেন, কিন্তু ইংরেজের কী দুর্মতি হল, পাঞ্জাবের ছোট লাট মাইকেল ওডায়ার গান্ধির গতিরোধ করলে। পালওয়াল স্টেশনে তাঁর উপর হুকুমজারি হল, দিল্লিতে যেতে পারবে না, অবিলম্বে বম্বে ফেরত যাও। সত্যাগ্রহী গান্ধিকে ফেরত যেতে হল।

এটাও একরকম গ্রেপ্তার ছাড়া আর কী। সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়ে গেল গান্ধিজি গ্রেপ্তার হয়েছেন।

খবর পেয়ে আমেদাবাদ খেপে গেল, খেপে গেল লাহোর, কসুর, অমৃতসর। আর অমৃতসরই তীর্থোত্তম।

অমৃতসরে ৬ই এপ্রিল নিরুপদ্রবে কাটল। কাটল ৭ই, ৮ই। নয়ুই হিন্দুদের রামনবমী, মুসলমানের দেওয়া জল হিন্দু তৃষ্ণার্তরা অঞ্জলি ভরে পান করছে, দেখে ইংরেজ শাসকদের চক্ষু ছানাবড়া। এ যে 'ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল'-এর কাটান মন্ত্র প্রয়োগ করা হল। হিন্দু-মুসলমান যদি পৃথক না রাখা যায় তবে ইংরেজের থাবা জোরদার হয় কী করে? এ কাটান মন্ত্র কাদের? কিচলু আর সত্যপালের। দুজনেই ডাক্তার। তাই অভিনব দাওয়াই বের

করেছে দুজনে। ভারতবর্ষে এ ওষুধ ধরলে একদিনেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান।

সুতরাং ও দুজনকে বন্দী করো। এমনি সাড়ম্বর উদ্যোগ করে প্রকাশ্যে ওদের গ্রেপ্তার করলে জনসাধারণ খেপে যাবে। তার চেয়ে ওদেরকে নেমন্তন্ন করে ফুসলিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় নিয়ে এস, তারপর গাড়ি করে ওদের পাঠিয়ে দাও দূর অন্তরীন আবাসে।

ডেপুটি কমিশনার আরভিং সকাল আটটায় নেমন্তন্ন পাঠাল যেন বেলা দশটায় ডাক্তাররা তার বাংলোয় আসে, দেশের স্বার্থে কী এক জরুরি কথা আছে। ছলনা না বুঝে সরল বিশ্বাসে সত্যপাল আব কিচলু যথাসময়ে বাংলোয় এসে পৌছুল, আবভিং তাদের বললে, গাড়ি প্রস্তুত, এই মুহূর্তে তাদেব অমৃতসব ত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, এই দেখুন, পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের হুকুম।

সত্যপাল আর কিচলুকে আলাদা গড়িতে চড়িযে নিয়ে গেল পুলিস।

খবব ছড়িয়ে পড়তে দেবি হল না। অমৃতসর আগুনের সরোবর হয়ে উঠল। সকলের মুখে এক বুলি : বেইমান কোথাকার! বাড়িতে নেমন্তন্ন কবে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করে! চলো ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি চলো। আমাদের নেতাদের ফিবিয়ে দিক। নইলে, চলো, ওটাকে আমরা কচুকাটা করব।

মুসলমানেব জন্যে হিন্দু বলছে, হিন্দুর জন্যে মুসলমান।

জনতা চলল বাংলোব দিকে। চিৎকার ছাড়া যাদের এখনো কোনো অস্ত্র নেই, সেই নিবীহ জনতাব উপব গুলি চালাল পুলিস।

আব দেখতে হল না, আগুনের সবোবব আগুনের সমুদ্র হয়ে উঠল।

জনতা পুড়িয়ে দিল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ম্যানেজার আব এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজাব, যথাক্রমে স্টুয়ার্ট আর স্কটকে খুন কবলে। ফার্নিচারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ওদের দেহ দুটোকেও পুড়িয়ে মারল। এলায়েন্স ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জি. এস টম্পসন রিভলভার খুলে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল, তাকে দোতলার বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ফেলে

দেওয়া হল নিচে, আর কেরাসিন ঢেলে আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে সুন্দর সংকার করলে। ব্যাঙ্কের দালানটা পোড়াল না কেননা ওটার মালিক ভারতীয়। চাটার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জে.ডবলিউ. টম্পসনের খোঁজ পেল না জনতা, কেননা তাকে তার ব্যাঙ্কের কেরানিরা সরিয়ে দিয়েছে।

'গুলি খেয়েছে ঠিক হয়েছে।' জনতাকে উদ্দেশ করে এ কথা, আর কেউ নয়, একজন ইংরেজ মহিলা বললে। জেনানা হাসপাতালের ডাক্তার, মেরি ইসডন, ভয়ে কোথায় ইঁদুরের গর্ত খুঁজবে, তা নয়, দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলছে, 'ঠিক করেছে গুলি মেরেছে।' আর যায় কোথা! জনতা দাবি করে বসল, ওকে ফেলে দাও নিচে, ঠিক করা কাকে বলে ওকে দেখিয়ে দি। ইসডন তখন ভয় পেল, আরেক মেয়ে-ডাক্তারের ঘরে গিয়ে লুকোল। এদিকে হাসপাতালের গেট ভেঙে জনতা উঠে এল দোতালায়— ইসডন কোথায়? নেলি বেঞ্জামিন, আরেক মেয়ে-ডাক্তার, যার ঘরে ইসড়ন লুলিয়েছিল, কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, বললে, বিশ্বাস করো ইসডন হাসপাতালে নেই। জনতা বিশ্বাস করল, ছেড়ে দিল বেঞ্জামিনকে, ইসডনের জন্যে বসে থাকল না।

কিন্তু কতগুলো দুর্বৃত্ত মার্সেলা শেরউডকে মারলে। সিটি মিশন স্কুলের লেডি সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট, সাইকেল করে যাচ্ছিল স্কুলের দিকে, কতগুলো লোক তাকে তাড়া করল। তাকে ফেলে দিল সাইকেল থেকে। ছুটে ঢুকতে যাচ্ছিল একটা বাড়িতে, সেই বাড়ির দরজা তার মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তায় মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল শেরউড। তারই এক পাঞ্জাবি ছাত্রীর বাবা রাতের অন্ধকারে তাকে তুলে নিয়ে গেল বাড়িতে ও লুকিয়ে রাখলে।

আর এ সমস্তেরই নির্দয়তম প্রতিশোধ জালিয়ানওয়ালাবাগ।

আরো আছে ইংরেজের কলঙ্ক। যেখানে শেরউডকে আক্রমণ করা হয়েছিল সেখানে মিলিটারি মোতায়েন হল। আদেশ হল যে

এখান দিয়ে যাবে তাকে পশুর মত চার পায়ে মানে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সাহেব দেখলেই সেলাম করতে হবে। আদেশ অমান্য করলেই বেত।

শেরউডকে মেরেছে সন্দেহ করে কত লোককে ধরে এনে যে এ প্রকাশ্য স্থানে বেত মেরেছে তার লেখাজোখা নেই। বিচারের একটা আবরণ পর্যন্ত নেই, সন্দেহের উপরেই খোলাখুলি বেত। আর কখনো-কখনো সে বেত উলঙ্গ করে।

এর কোনো উপায় নেই? কোনো প্রতিকার নেই? কেউ কিছুই করতে পারবে না? কোনো উত্তর দিতে পারবে না?

উত্তর দিলেন, দিতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশশো উনিশের তিরিশে মে তিনি তাঁর নাইটহুড ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বড় লাটকে লিখলেন:

'কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করবার উপলক্ষ্যে পাঞ্জাব গবর্নমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করেছেন তার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পেয়ে ভারতীয় প্রজার নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবিদের যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তার অপরিমিত কঠোরতা ও দণ্ডপ্রয়োগবিধির বিশেষত্ব সমস্ত সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনারহিত। যখন চিন্তা করা যায়, যে-প্রজাদের উপর এরূপ বিধান করা কয়েছে, তারা কত নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল ও যাঁরা এরূপ বিধান করেছেন তাঁদের লোক-হননব্যবস্থা কী নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন এ কথা আমাদের জোর করেই বলতে হবে যে এমন বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়ে নিজের সাফাই গাইতে পারে না। পাঞ্জাবি নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করেছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করেও তার খবর ভারতের দূর দূরান্তে ব্যাপ্ত হয়েছে। সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাময় ধিক্কার জেগেছে আমাদের কর্তৃপক্ষ তাকে উপেক্ষা করেছেন এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা

করে তাঁরা আত্মশ্লাঘা বোধ করছেন যে এতে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হল।...যখন দেখা গেল আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হয়েছে, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমাদের গভর্নমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করেছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্নমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কাজ ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণ-কামনায়, আমি এইটুকু মাত্র করবার সঙ্কল্প করেছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গিয়েছে তাদের আপত্তিকে বাণীদান করবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করব। আজকের দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলো চারদিকের জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করে প্রকাশ করছে। অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলতে পারি, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাদের অকিঞ্চিৎকরতার জন্যে লাঞ্ছিত হয়ে মানুষের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করবার অধিকারী বলে গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করে আমি তাদেরই পাশে নেমে দাঁড়াতে ইচ্ছে করি।'

'আজি এ ভারত লজ্জিত হে
হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে,
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা
কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে
সকলি ব্রহ্ম-বর্জিত হে।
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পলকে সজ্জিত হে॥'

উনিশ

শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে এসে পৌঁছুল সুভাষ: একে মন্থর জাহাজ, তাতে ইংলণ্ডে কয়লা-ধর্মঘটের জন্যে সুয়েজ-এ পৌঁছে জাহাজ বন্ধ হয়ে গেল। লঙ্কায় রাবণ মরলে বেহুলার কী আসে যায়? ইংলণ্ডে ধর্মঘট হলে সুয়েজ খালের স্রোত বন্ধ হতেই হবে, জাহাজে কয়লা নেই।

লণ্ডনে পৌঁছেই সুভাষ কেমব্রিজে ছুটল, সেখানে ভর্তি হবার আশা আছে শুনে। ফিটজ উইলিয়ম হলে জায়গা পেল। আর ঘরে ঢুকল কিনা সব চেয়ে প্রত্যাশিত বন্ধু দিলীপকুমার।

'আরে দিলীপ, এস এস।' সুভাষ লাফিয়ে উঠল।

'তারপরে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল?' দিলীপ বসল একটা চেয়ারে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক, ভর্তিও হতে পারলে আর থাকবার জায়গাও মিলে গেল।'

'উঃ, কটা দিন কী ধকল গেল!' সুভাষ প্রীতিস্নাত মুখে বললে, 'তোমার সাহায্যে থাকবার জায়গা পেলাম আর সত্যেন ধর—আমাদের কটকের সত্যেন ধর—সেই আমাকে ভর্তি হতে সাহায্য করল। নিয়ে গিয়েছিল প্রভোস্ট রেডএওয়ের কাছে।'

'রেডএওয়ে কী বললে?'

'ভর্ত্তি করতে চায়না। বললে, তোমার দেরি হয়ে গেছে। চলতি টার্ম দুসপ্তাহ আগেই শুরু হয়ে গেছে। তুমি এখন তা ধরবে কী করে?'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম, আমার দেরির জন্যে আমি দায়ী নই,' হাসল সুভাষ: 'তোমরা দায়ী, তোমাদের দেশ দায়ী।'

'সে কী? কী করে?'

'রেডএওয়েও এমনি প্রশ্ন করেছিল। বললাম, 'আমাদের জাহাজ সুয়েজে এসে আটকে রইল, কয়লা নেই। কয়লা নেই কেন? ইংলণ্ডে কয়লাখনিতে স্ট্রাইক হয়েছে। তাই তো আমার জাহাজ আসতে দেরি করল। তাই এই দেরির দোষ আমার নয়, তোমাদের।'

'রেডএওয়ে কী বলল?'

'হাসল বটে কিন্তু নরম হল না।'

'তবে নরম হল কিসে?' দিলীপ কৌতূহলী হল।

'নরম হল যখন বললাম আমার মিলিটারি ট্রেনিং আছে। বললে, 'বটে! তুমি মিলিটারি ট্রেনিং নিয়েছ? তা হলে আর কথা নেই।' বিজয়ীর হাসি হাসল সুভাষ: 'ভর্তি করে নিল।'

'ও কী ভাবল?'

'ভাবল বোধহয় ওদের হয়ে যুদ্ধ করব। ওদের জন্যে ভারতবর্ষের পরাধীনতা চিরস্থায়ী করে রাখব।'

দিলীপ স্বরে একটু পরিহাস মেশাল: 'আই. সি. এসদের আর ব্রত কী! ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অবিনশ্বর করে রাখা!'

'কে হবে আই. সি. এস?' সুভাষ বৈরাগ্যের ছবি আঁকল মুখে।

'তার মানে?'

'মানে, পরীক্ষাই পাশ করতে পারব না।' ক্লিষ্টস্বরে সুভাষ বললে, 'একরাজ্যের বিষয়, এত পড়বই বা কখন! পরীক্ষা হতে আর মোটে আট মাস বাকি।'

দিলীপ সুভাষের পিঠ চাপড়ে দিল: 'তা তুমি একবার কাজ হাতে নিলে উদ্ধার করে ছাড়বেই।'

'পড়ব বলে যখন এসেছি তখন ফাঁকি দেব না।' গম্ভীর মুখে সুভাষ বললে, 'আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে এই অল্প সময়ের মধ্যে পারব কিনা।'

'কিন্তু যদি পারো?' দিলীপের চোখ গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল: "যদি আই. সি. এস চাকরিটা পাও?'

'চাকরি করব না।' পিঠ-পিঠ উত্তর দিল সুভাষ: 'চাকরি ছেড়ে দেব।'

হো-হো করে হেসে উঠল দিলীপ। বললে, 'পাবার আগে বলা সোজা। পাবার পর—'

'ঠিক বলেছ।' সুভাষ নম্রস্বরে বললে, 'যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ এ কথার কোনো দাম নেই।'

'চলো বেড়িয়ে আসি।' দিলীপ টানল সুভাষকে।

'চলো।'

দুবন্ধুতে শহরের রাস্তায় ঘুরছে। হঠাৎ থেমে একটা সু-বয়-এর কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল সুভাষ। তার ডান পা-টা বাড়িয়ে ধরল।

সু-বয় জুতো বুরুশ করতে লাগল।

'দেখতে কী রকম লাগছে,' সুভাষ বললে দিলীপকে, 'একটা সাহেব আমার জুতো বুরুশ করছে!'

দিলীপ উত্তর দিল: 'বিলেত দেশটা মাটির আর সাহেবগুলো নিতান্তই মানুষ।'

'কিন্তু ওকে তুমি আই সি এস নমিনেশান দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দাও, দেখবে ও হাতে মাথা কাটবে।

'কিংবা আরেকটা জালিয়ানওয়ালাবাগ করে তুলবে।'

'দিলীপ, মনে করিয়ে দিও না।' সুভাষের মুখে-চোখে আর্তি ফুটে উঠল, বললে, 'ভারতবাসীর জীবন ওদের কাছে ধুলোর চেয়েও তুচ্ছ। নিজেরা হয়তো একটা জুতোবুরুশের চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু কী স্পর্ধা, কী ঔদ্ধত্য! লেবর-লিডাররা ঠিক বলেছেন যে যে-দেশ অমৃতসরের হত্যালীলা সহ্য করে সে-দেশ ঐ হত্যালীলারই উপযুক্ত।' ডান পা-টা হয়ে যাবার পর বাঁ পা-টা বাড়িয়ে দিল সুভাষ: 'কিন্তু

এর প্রতিকার কী? যাই বলো, খুব করে পড়ে আই. সি. এস টা পাশ করে ফেলি—'

'কিন্তু প্রতিকার কী তা তো বললে না। বিপ্লব?'

'সে তো তুমিও জানো আমিও জানি। সুভাষ বললে দৃপ্তকণ্ঠে, 'কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব। বিপ্লব তো শুধু দেশের মুক্তির জন্যে নয়, মানুষের মুক্তির জন্যে। দারিদ্র্যের থেকে মুক্তি, ক্ষুধার থেকে, অজ্ঞানের থেকে, অস্বাস্থ্যের থেকে মুক্তি।'

দিলীপ বললে, 'কিন্তু মুক্তির আরেকটা বড় অর্থও তো আছে—মানুষের পার্থিব জন্মের নিহিতার্থকে প্রকাশ করা, অর্থাৎ কিনা, মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্ঘাটন ঘটানো—'

'নিশ্চয়ই।' মেনে নিল সুভাষ, 'কিন্তু ভাই প্রথম জিনিস প্রথম, কিংবা দুটো জিনিসই একসঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ যে বলতেন ভারতের উন্নতি চাষা ধোপা মুচি মেথরদের দ্বারা হবে, ঠিকই বলতেন। 'পাওয়ার অফ দি পিপল' কী করতে পারে দেখাল রাশিয়া। ভারতের উন্নতি যদি কোনোদিন হয় সেটা আসবে ঐ 'পাওয়ার অফ দি পিপল'-এর মধ্য দিয়ে।'

ও দিকে দেশে বিপ্লবীদের খবর কী? খবর আর যাই হোক, রংপুরের শচীন দাশগুপ্তের মৃত্যুর কথা ভোলা যায় না।

আঠারো বছরের ছেলে, কলকাতায় বি-এ পড়ছে, পুলিস তাকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করল। আছে ভারতরক্ষা আইন, সুদূর এক গ্রামে তাকে অন্তরীন করা হল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে তার বাবা পুলিসের কাছে মুচলেকা সই করে নিয়ে এল তাকে বাড়িতে। অর্থাৎ পুলিস তাকে গৃহবন্দী থাকতে অনুমতি দিল। বাড়ির চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিল, তার বাইরে পদার্পণ করতে পারবে না। কলেজে পড়া? না। লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়া? না। লাইব্রেরি থেকে বই আনা? না। বিকেলবেলা মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা? না। বাড়ির সংলগ্ন জমিটুকুতে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে

অন্ত কিছু খেলা ? না। বাইরের কারু সঙ্গে কথা বলা ? কদাচ না।

অপরাধ ? অপরাধ জানা থাকলে তো জেলেই পুরতাম, জানা নেই বলেই তো গৃহবাসী থাকবার সুবিধে করে দিয়েছি।

সুবিধে ? দিনে দিনে তিলে তিলে এ জীবনভার কি বহনদুষ্কর হয়ে উঠছে না ? এভাবে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে ? কোনো যুবক বাঁচতে পারে ?

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠত শচীন। কিন্তু সেদিন উঠল না। বাইরে থেকে মা দরজায় ধাক্কা দিলেন। কোনো সাড়া নেই। শচীন, শচীন, দরজা খোল। দরজা নিষ্ঠুর নীরব। দরজা ভেঙে ফেলা হল, দেখা গেল দুধের সঙ্গে আফিং গুলে খেয়ে শচীন সমস্ত খাঁচার বাইরে চলে গিয়েছে।

পুলিসের কাছে লিখে গিয়েছে চিঠি : 'এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে আর আমাকে কেউ খুঁজবে না, জ্বালাবে না, পিছু নেবে না।'

কী মর্মস্পর্শী সেই মৃত্যু, সেই চিঠি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চঞ্চল হলেন। লেখনী ধরলেন ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতার বিরুদ্ধে। 'ছোট ও বড়'-ই তো সেই প্রবন্ধ।

রাধানাথ প্রামানিককে মনে আছে ? গার্ডেনরিচ ডাকাতি মামলায় সাত বছব জেল হয়েছিল। জেলে দুবছর থাকবার পর তার চোখে অসুখ করল। জেল-সুপারকে বললে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন। সুপার বললে, ওরকম ডাকাত আর খুনেদের অন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত।

রাধানাথ প্রতিজ্ঞা করল জেলের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের কোনো চিকিৎসাই সে নেবে না। শুধু চোখের অসুখের নয়, যে কোনো অসুখের। তাই কদিন পরে তার যখন রক্ত-আমাশা হল সে সকল চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করলে। ফলে কদিন পরেই সে মারা গেল।

বাইশ বছরের ছেলে রাধানাথ আত্মসম্মানের বেদীতে প্রাণ উৎসর্গ করল।

ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ার এক বাড়িতে বিপ্লবী তারিণী মজুমদারকে ঘিরেছিল পুলিস। পালাবার রন্ধ্র পর্যন্ত খোলা রাখেনি, তারিণী একতলার ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। বেকায়দায় পড়ার দরুন ডান পা-টা ভেঙে গেল। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, তবু মাথা ঠিক বুদ্ধি বাতলাল। একটা খোঁড়া ভিখিরি সাজলে কেমন হয়? পরনের জামা-কাপড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ভিখিরির পোশাক বানাল তারিণী। আর পায়ের পঙ্গুতা তো অমোঘ সত্য। দিব্যি খোঁড়া ভিখিরি সেজে পুলিশের ব্যূহ পার হয়ে গেল, কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করল না।

কিন্তু ধরা পড়ল ঢাকায়, কলতাবাজারে, তার বন্ধু নলিনীকান্ত বাগচির সঙ্গে। ধরা পড়ল মানে ওদের মৃতদেহ ধরা পড়ল।

যে বাড়িতে দুবন্ধু আশ্রয় নিয়েছিল ভোররাত্রি থেকে পুলিস তাকে ঘিরল। বহির্গমনের সূচ্যগ্র পথ নেই। এভাবে আচ্ছাদিত হয়ে ধরা পড়তে রাজি নই, এস আমরা যুদ্ধ করি। দুবন্ধু পুলিসের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল, পুলিসও জবাব দিল। কতক্ষণ গুলি চালাবে তোমরা, কত তোমাদের গুলি, কত তোমাদের সৈন্য? সংখ্যায় আমরা দুজন কিন্তু আমাদের দেহের প্রতি রক্তকণিকাই অগ্নিবর্ষী গুলিগোলা, আর আমাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণই আমাদের জয়কেতন। আমাদের এই তপ্ত উৎসর্গই আমাদের মাকে জাগাবে, অসুরনাশিনী তামসী মহাকালী। দেরি নেই শুনতে পাবে সেই অট্টহাস, সেই উচ্চনাদ, তোমাদের ঘনীভূত জড়ত্ববোধ দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাবে। মহতী জনশক্তিই সেই মহাকালী।

পুলিসের দিকে কনস্টেবল পতিরাম সিং মারা গেল, আহত হল সাব-ইনস্পেক্টর আর এদিকে বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিলে অপরাভূত দুই বন্ধু, নলিনী আর তারিণী। সমগ্র অসুরশাসনকে

উৎখাত করতে পারেনি বটে কিন্তু একটা করাল অসুর, যার নাম ভয়, তাকে তারা নিধন করেছে।

বিপিন পালের গানটা মনে করো ঃ

'আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি প্রাণ চাহেনা।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার
কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার
দানবদলনী ত্রিদিবনাশিনী করাল-কৃপাণী তুমি মা।
উর মা আজিকে সেরূপে পরাণে
ডাকি মা কালিকে ডাকি মা সঘনে
শোণিততরঙ্গে মাতি রণরঙ্গে মাভৈঃ বাণী আজি শোনা মা,
বিনে তোর কৃপা, বিনে তোর কৃপাণ, ভারত-বন্ধন ঘোচে না॥'

বিপক্ষপক্ষক্ষয়ের কোনো ঘটনা নেই? আছে। বগুড়া ডিটেকটিভের হরিদাস মৈত্র বুকের উপর সরল গুলি খেয়ে মারা গেছে। একটা বাড়িতে এক বিপ্লবী যুবক লুকিয়ে আছে খবর পেয়ে হরিদাস তাকে গিয়েছিল ধরতে। কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করেই গুলি ছুঁড়ল যুবক। সত্যিকার কার সে দাস হরিদাসকে স্মরণ করতেও সময় দিল না, গুলি করে মেরে সেই অজানা বিপ্লবী অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কেউ তার ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পেল না।

এ সব কোনো দিকে চোখ ফেরাবার সময় নেই সুভাষের। সে ঘরে বসে একমনে পড়ছে—পরীক্ষা যখন দেবেই ফেল করা কোনো কাজের কথা নয়। ফেল তো চেষ্টা না করেও করা যায়। যখন চেষ্টা করছিই, পাস না করার কোনো মানে হয় না।

ঘরে বসে পড়ছে সুভাষ, টেবিলের চারদিকে বই-খাতা ছড়ানো, একটি পাঞ্জাবি ছাত্র ঘরে ঢুকল।

'আসতে পারি?'

'আরে এস এস।' সুভাষ বন্ধুতায় প্রসারিত হল।

'বাই জোভ। এখন সবে সন্ধে, এখুনি পড়তে বসেছ কী।' পাঞ্জাবি ছাত্র টেবিলের দিকে এগিয়ে এল।

সুভাষ ক্লিষ্টমুখে বললে, 'না ভাই, হাতে বেশি সময় নেই।'

'সমস্ত জীবনভোরই তো সময় নেই।' পাঞ্জাবি ছাত্র হালকা সুরে হেসে উঠল : 'তাই তো যতটুকু সময় আছে ফুর্তি করে নাও।'

সুভাষ ছোট্ট একটি শব্দে কঠিন উত্তর দিলে : 'না।'

পাঞ্জাবি ছাত্র সুভাষের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল : 'চলো চলো কত নাচ কত গান কত মেয়ে—'

সুভাষ হাত শক্ত করল। বললে, 'না, ছাড়ো, আমাকে পড়তে দাও।'

গীতায় অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, নিশ্চয়ই মন দুর্নিগ্রহ এবং স্বভাবতই চপল, কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এ মনকে নিগৃহীত করা যায়। সুভাষ তাই অচঞ্চল, অনন্যনিষ্ঠ।

একটা ঘরে সেই পাঞ্জাবি ছাত্রটি কজন বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছে। পাঞ্জাবি ছাত্র নাচছে ও হাল্কা ধরনের গান গাইছে, বাঙালি ছাত্ররা উচ্চরবে তার তারিফ করছে। হঠাৎ দূরে বারান্দায় সুভাষকে দেখা গেল।

দিলীপ এক কোণে বসেছিল, বলে উঠল : 'এই, সুভাষ আসছে।'

পাঞ্জাবি ছেলে আতঙ্কগ্রস্তের মত বললে, 'সুভাষ? ওরে বাবা।'

অন্যান্য ছাত্রের কণ্ঠস্বর ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে এল : 'সুভাষ! সুভাষ!' এবং এক সময়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

সুভাষ এ দিকে আসেনি, অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে।

দিলীপ বললে, 'কী পবিত্র গম্ভীর মূর্তি! যেখান দিয়ে যায়, আলো করে যায়।'

পাঞ্জাবি ছেলে শুকনো মুখে বললে, 'ওকে দেখলেই আমি যেন কেন নিস্তেজ হয়ে পড়ি।'

'তার মানেই তোমার মধ্যে পাপ আছে,' বললে দিলীপ, 'আর ওর মধ্যে আছে জ্বলন্ত আগুন।'

চরিত্রবলই বল। পবিত্রতাই অভেদ্য দুর্গ। আর উচিতচারিতাই রণকৌশল। আর আমি যে সুখে-দুঃখে সমচিত্ত সেইটেই আমার জয়পত্র।

কেমব্রিজে বইয়ের দোকানে দিলীপের সঙ্গে ঘুরছে সুভাষ, বই দেখছে, ঘাঁটছে, পড়ছে। কতক্ষণ পরে তার মনোনীত বইটা দেখা দিয়ে বসল।

'এই যে এই বইটা—' সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল : 'আচ্ছা এ বইটার দাম কত ?'

'আঠারো শিলিং।'

পকেট থেকে দাম বার করে সুভাষ হঠাৎ থমকে গেল, বললে, 'কিছু কম আছে, বাকিটা কাল দিয়ে গেলে হবে ?'

'বেশ তো নিয়ে যান।' দোকানী সময় আরো দীর্ঘ করে দিল : 'দাম পরে সুবিধেমত দিয়ে গেলেই হবে।' দোকানী সানন্দে বই প্যাক করে দিল।

দিলীপ একটু দূরে সরে গিয়েছিল, আবার দুজনে একত্র হয়ে পথ চলতে লাগল।

সুভাষ বললে, 'জানো এমনি অবস্থায় আমার দেশের দোকান আমাকে বিশ্বাস করে বই ছাড়েনি।'

'কেন, কী হয়েছিল ?'

'কলেজ স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানে এমনি বই কিনতে গিয়ে দাম কম পড়েছিল। বললাম, বইটা দিন, বাকি দাম কাল দিয়ে যাব। দিলে না। বললে, কাল পুরো দাম দিয়েই বইটা কিনে নেবেন। বিশ্বাস করলে না।'

'আত্মবিশ্বাস নেই বলে পরকেও আমরা বিশ্বাস করতে শিখিনি। এই বিশ্বাস আসে স্বাধীনতার শক্তি থেকে।' দিলীপ দীপ্তস্বরে বললে, 'আমরা যখন স্বাধীন হব, শক্তিমান হব, মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে শিখব তখন আমাদের চরিত্রেও এই বিশ্বাসের ভাবটা আসবে।'

'স্বাধীনতা!' কথাটা একবার মন্ত্রের মত উচ্চারণ করল সুভাষ, তারপর স্বাভাবিক স্বরে বললে, 'কিন্তু যাই বলো, ওদের ভারতীয়কে বিশ্বাস ঐ বই পর্যন্তই—'

'তার মানে?'

'ওরা আমাদের বই দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু বন্দুক দিয়ে বিশ্বাস করতে রাজি নয়।'

'কেন, কী হল?' দিলীপ যেন নতুন খবর শুনছে এমনি তাকাল সবিস্ময়ে।

'কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ট্রেনিং কোর-এ ভর্তি হতে চেয়েছিলাম, অনুমতি দিলে না।' সুভাষের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠল: 'যেহেতু সেটা ইংরেজ ছাত্রদের পছন্দ নয়। ঐ ট্রেনিং-এ যারা পাস করবে তারা ব্রিটিশ সেনাদলে অফিসরের পদের যোগ্য হবে। পাছে পাস করে আমরা সেই পদ চেয়ে বসি তাই ওদের দুশ্চিন্তা।'

'ওদের সেনাদলে কে চাকরি করছে!' দিলীপও তপ্ত হল।

'বললাম লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ব্রিটিশ আর্মিতে চাকরি নেব না, শুধু আমাদের ট্রেনিংটা দেওয়া হোক।' বললে সুভাষ, 'ওরা রাজি হল না কিছুতেই। সেক্রেটারি অফ স্টেট মণ্টেগুর সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলাম, কোনো ফল হল না। পাছে যুদ্ধ করতে শিখে ফেলি তাই ওদের ভয়।'

'রবীন্দ্রনাথ কী সুন্দর বলেছেন,' দিলীপ হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি করে উঠল: 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু—'

'ভারতবর্ষের রণগুরু কে?' সুভাষ আপন মনে বলে উঠল: 'কোথায়?'

দিলীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'এই আমার চোখের সামনে।'

সুভাষ হাসল। বললে, 'আপাতত সংগ্রাম তো দেখছি শুধু পরীক্ষার সঙ্গে। পরীক্ষা পাস করেই বা কী! স্বাধীনতা কোথায়? তুমি তো আবার ধর্মের কথা বল। পরাধীনের আবার ধর্ম কী! পরাধীনের পক্ষে স্বাধীনতা-অর্জনই একমাত্র ধর্ম।'

'ধর্ম তো তুমিও মানো। তুমি তো সন্ন্যাসী হয়েছিলে—'

'হয়েছিলাম!'

'হয়েছিলাম কী, এখনো আছ।'

'বলো, এতে আমি চটি না। সন্ন্যাসী হতে পারা তো গৌরবের কথা,' সুভাষ গম্ভীর হল: 'আমার কথা হচ্ছে আগে সৈনিক পরে সন্ন্যাসী। কী বলছেন, বিবেকানন্দ? বলছেন, আগে রজঃশক্তির উদ্দীপন কর, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কী করে মুক্ত হতে পারবে তা বলে দে।'

দিলীপ আনন্দিত হয়ে উঠল। বললে, 'বিবেকানন্দ চোখের সামনে জাজ্বল্যমান থাকলেই যথেষ্ট। তিনি বাইরেরও প্রেরণা, ভিতরেরও প্রেরণা।'

'তাই এমন দীক্ষা চাই যাতে ভারতশ্মশানের শবেরাও জেগে ওঠে।'

অশ্বিনী দত্তের গানটা মনে আছে?

'শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখ্ সে হেথা কী হয়েছে
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে-ভঙ্গে করে কেলি।
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা দেখবে জগৎ নয়ন মেলি॥'

হাতে বিলেত থেকে পাঠানো কেব্‌ল, শরৎচন্দ্র জানকীনাথের ঘরে ঢুকল। 'বাবা, সুভাষ আই. সি. এস. পাস করেছে।' আনন্দের স্রোত ঢেলে দিল শরৎ।

'পাস করেছে?' জানকীনাথ চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, বিলেত থেকে কেব্‌ল এসেছে সুভাষ ফোর্থ হয়েছে।'

'ফোর্থ হয়েছে?' জানকীনাথ আনন্দে অভিভূত হলেন: 'তোর মাকে ডাক। তোর মাকে খবর দে।'

বাড়িতে এত উৎসবের ঘটা, ওদিকে কেমব্রিজে সুভাষের ঘরে বিষাদ আর দুশ্চিন্তার মালিন্য। পাস করেছে, ভালো ভাবে পাস করা মানেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া, বাঞ্ছিতার্থ লাভ করা, তবে আবার দ্বিধা কেন, দ্বিপ্রকার কেন? চাকরি পেয়ে আবার ছেড়ে দেয় কে? এই তো চেয়েছিলে, এরই জন্যে তো এসেছিলে, এরই জন্যে তো বিদ্যার পরিচর্যা করেছিলে, করেছিলে নিষ্ঠার শুশ্রূষা, তবে এখন আবার বৈমুখ্য কেন? হাতের লক্ষ্মীকে কে আবার পায়ে ঠেলে? সম্পৎস্বরূপাকে, সুখদৃশ্যা সুস্থিরযৌবনাকে কে ফিরিয়ে দেয়?

কিন্তু, না, ইংরেজের গোলামি করব না।

গোলামি বলছ কী! শহরে-গ্রামে সদরে-মফস্বলে মহকুমা-জেলায় তুমিই তো একপতি হবে, সে কী মহিমা, কী মর্যাদা! সবাই তোমাকে উর্ধ্বনেত্রে দেখবে আর তুমি অনুভব করবে সবাই তোমার চেয়ে দরিদ্র, অভাজন। তুমিই একমাত্র স্বর্গপ্রসূত, ঈশ্বরপ্রেরিত। জীবনের এই গরিমাময় আস্বাদ কটা লোকের ভোগে আসে? এই

অমৃতফলের জন্যে লোকে কত জন্ম তপস্যা করে আর তুমি তা অর্জন করে ত্যাগ করবে? মানুষে বলবে কী।

মানুষের বলায় কী আসে যায়? আমার বিবেক কী বলছে সেইটেই শোনবার মত। আমার বিবেক বলছে যাতে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হবে, দেশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে, তা আমি গ্রহণ করতে পারি না। একটা বিদেশী শাসনের প্রতি যে অপ্রতিবাদ আনুগত্য দেখাতে হবে তাতে আমার জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকবে কী করে? আমার চাকরি বড় না আদর্শ বড়?

ছেলেমানুষি কোরো না। এ চাকরিতে শুধু প্রতাপের প্রদীপই জ্বলে না, আছে আবার আরামের শীতলতা। মোটা মাইনে মোটা পেনসন, গাড়ি বাড়ি নারী, যা মানুষের কাম্য। অবিচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য, রমণীয় নিশ্চিন্ততা।

আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই না। সংগ্রাম ছাড়া বিপদ ছাড়া জীবনের আবার স্বাদ কী। আমি বিপন্ময় হয়ে বাঁচতে চাই। নিশ্চিন্ততার স্রোতে গা ভাসিয়ে একটি স্ফীতকায় আলস্য হয়ে আমি বাঁচতে চাই না।

তুমি কী বলছ মাথামুণ্ডু কারু বোঝবার সাধ্য নেই। এ চাকরি নিয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে কত মেয়ে তোমার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে আসবে। সুহাসা সুবেশা সুশোভার বাহিনী। যৌবনের মাধবীমদিরা।

আমি বিয়ে করব না।

সংসারী হবে না?

না।

তবে কী করবে?

দেশের কাজ করব। দেশের সত্যিকার কাজ।

এমন উদ্ভট কথা কে কবে শুনেছে?

আমি তো চিরকাল এই উদ্ভটেরই উপাসনা করে এসেছি।

কেন, আই. সি. এস-এ থেকে দেশের কাজ করা যায় না?

যায়, কিন্তু সে ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেঁচার কাজ। উপর-উপর, ভাসা-ভাসা।

কেন, রমেশ দত্ত আই. সি. এস. হয়ে দেশের কাজ করেন নি?

করেছেন, কিন্তু তিনি আমলাতন্ত্রের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ আরো অর্থবহ আরো মঙ্গলপ্রদ হত। সিভিল সার্ভিসের আইন-কানুন এমন কদর্য যে তার আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না। সে চেষ্টা এক নিদারুণ ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

বেশ তো, চাকরিতে ঢুকে তার পাপের স্খালন করা যায় না?

তার মানেই তো কয়েক বছর পরে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া। তখন আমি যাব কোথায়? তখন আমার একূলও গেল ওকূলও গেল। চাকরির প্রশস্ত কোলে একবার ঠাঁই করে নিলে আমার সমস্ত তেজ উবে যাবে। এমনি কালান্তক সে চাকরি। না, তার ক্ষয়ঙ্কর প্রভাব আমার উপর পড়তে দেব না, কিছুতেই না।

কিন্তু তোমার মেজদা কী মনে করবেন?

তিনি আমাকে বুঝবেন। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ নেই। তাঁর আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে।

কিন্তু তোমার বাবা?

হ্যাঁ, বাবা যে খড়্গহস্ত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবনে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত হই।

তবে, বাবাকে কী বলবে?

সানুনয়ে তাঁর কাছে সম্মতি ভিক্ষা করব। আর মেজদা যদি আমার পক্ষে থাকেন তিনিই পারবেন বোঝাতে। আর বাবা বুঝলে মাও শান্ত হবেন।

অন্যান্য আত্মীয়?

তারা তুমুল সোরগোল তুলবে। কিন্তু তাদের নিন্দা-প্রশংসায়

আমার কিছু আসে যায় না। আমার আদর্শকে আমি অম্লান রাখব।

কী তোমার আদর্শ?

অনহংবাদী হয়ে দেশসবা। বলতে পারো অরবিন্দ ঘোষই আমার আদর্শ।

সেও আই. সি. এস পরীক্ষায় ফোর্থ হয়েছিল—তাই? সে তো ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষা পাস করতে পারেনি বলে নাকচ হয়ে গেল।

মোটেই না। সে ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় হাজির হয়নি—ইচ্ছে করেই হয়নি, কেননা আই. সি. এস. চাকরি করা তার অভিপ্রেত ছিল না। শুধু বাবার ইচ্ছাতেই সে আসল পরীক্ষায় বসেছিল। তার পথই আমার কাছে মহৎ ও নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও তা রমেশ দত্তের পথের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

তুমি সারাজীবন দারিদ্র্যের ব্রত নিয়ে দেশসেবা করতে পারবে?

কেন পারব না? চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে যদি সংসারের সব কিছু ছেড়ে জীবনের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে আমি এক তরুণ, যার কোনো সাংসারিক সমস্যা নেই, আমি কেন পারব না?

কিন্তু সে তো লাঞ্ছনার পথ, দুঃখক্লেশের পথ, তোমার ভয়-ডর নেই?

না, কিসের ভয়? লাঞ্ছনা আর দুঃখক্লেশ তো সে পথের ধুলো-মাটি।

এমনি হ্যাঁ কি না, না কি হ্যাঁ, চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হচ্ছে সুভাষ। সুবিধাবাদ না আদর্শবাদ। দাসত্বসেবা না স্বদেশ-সেবা। রমেশ দত্ত না অরবিন্দ।

বাড়িতে জানিয়েছে তার সিদ্ধান্তের কথা। মেজদাকে লিখেছে, বাবাকে লিখেছে। এখানে-ওখানে বহু লোকের সঙ্গে দেখা করছে। মতামত নিচ্ছে। যাচাই করে দেখছে তার সিদ্ধান্তটা টলিয়ে দেবার মত কোনো যুক্তি আছে নাকি পৃথিবীতে।

ঘরে সুভাষ পাইচারি করছে তার বন্ধু মিত্র এসে উপস্থিত।

'এস এস', সুভাষ নিজেই হাত বাড়াল: 'তোমাকে আর অভিনন্দন জানাতে হবে না, আমি চাকরি ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।'

'ছেড়ে দেবে?' মিত্র থ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল: 'আই. সি. এস. চাকরি তুমি ছেড়ে দেবে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

সুভাষ হাসিমুখে বললে, 'না, মাথা ঠাণ্ডা আছে। এক মাস অনেক ভেবেছি, বিবেচনা করেছি, তারপর সিদ্ধান্ত স্থির করেছি ছেড়ে দেব।'

'লোকে পায় না আর তুমি পেয়ে ছেড়ে দেবে?'

'ছেড়ে দেবার চিঠিটা লেখা পর্যন্ত হয়ে গেছে। শুধু সই করে ডাকে ফেলে দেওয়াটুকু বাকি।'

'এমনি চাকরি পেয়ে কেউ কোনোদিন ছেড়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার নজির আছে?'

'না থাক, আমিই না হয় প্রথম নজির হব।'

'চাকরির শ্রেষ্ঠ চাকরি, ভারতীয় যুবকের কাছে যা স্বর্গের সুখ-স্বপ্ন তা পেয়ে ছেড়ে দেবে, কেউ দেয় ছেড়ে? তুমি সুস্থতার ভান করলেও লোকে তোমাকে উন্মাদ বলবে।'

'উন্মাদ না হলে দেশের কাজ করব কী করে?'

'দেশের কাজ!' মিত্র তো আকাশ থেকে পড়ল: 'দেশের আবার কী কাজ?'

মঞ্জুবাক সুভাষ ঋজুকণ্ঠে বললে, 'স্বাধীনতা অর্জনই দেশের একমাত্র কাজ।'

'রাখো! তাতে তোমার কী মাথাব্যথা? দেশে তো আরো অনেক লোক আছে। তারা ও সব নিয়ে মাতামাতি করুক।'

'না, শুধু মাতামাতি নয়, স্পষ্ট শক্ত মজবুত কাজ।' হাতের মুঠ

দৃঢ় করল সুভাষ : 'দেশ আমার কাছে তাই দাবি করছে। আমি সেই দাবি অগ্রাহ্য করতে পারব না।'

এ যেন কী রকম সুভাষ। দ্রব নম্র কান্তপুরুষ নয়। এ যেন এক তেজস্বী তপস্বী সুব্রতী ব্রহ্মচারী। পবিত্র পাবক।

'তোমার বাড়িতে জানিয়েছ?' মিত্র কণ্ঠস্বর থেকে পরিহাসের রেশটুকু সরিয়ে নিল।

'জানিয়েছি।'

'তাঁরা কী বলছেন?'

'কী বলবেন! মর্মাহত হয়েছেন। বলছেন চাকরিতে থেকেও তো দেশের কাজ করা যায়। রমেশ দত্ত করেন নি? করেছেন কিন্তু চাকরিতে থাকার দরুন সামান্যই করতে পেরেছেন। যদি প্রথম বয়সেই চাকরির বাইরে চলে আসতে পারতেন, ঢের বেশি করতে পারতেন। গোলামি আর দেশসেবা একসঙ্গে সম্ভব নয়।'

'গোলামি কী বলছ!' মিত্র মুহূর্তে আবার বিপক্ষে চলে গেল : 'একচ্ছত্র প্রভুত্ব, মহকুমায় এস. ডি. ও., জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিসনে কমিশনার। শেষে কোনো প্রদেশের চীফ সেক্রেটারি—'

'জানি। সব জানা আছে।'

'উঃ, কোথায় লাগে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব! ঢালাও সুখ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, কার্পেটবিছানো জীবন, প্রতাপ ঐশ্বর্য আলস্য আরাম, সংসারে যা মানুষের কামণীয় সব তোমার হাতের মুঠোয়—'

'কিন্তু আমি তো বিয়ে করব না, আমার আবার সংসার কী।'

'কিন্তু তোমার মা-বাবা তো আছেন, তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করা তোমার কাজ নয়?'

সুভাষ ফিরে দাঁড়াল। কোথা থেকে একটা রক্তাভ জ্যোতি তার মুখে এসে পড়ল। বললে, 'একটা আই. সি. এস. পাশ ব্রিটিশের গোলাম কতটুকু তাঁদের মুখোজ্জ্বল করবে? দেশের কাজে বলি হতে পারলে কি তাঁদের মুখ সমস্ত দেশের মুখ, আরো উজ্জ্বল হবে না।'

'না, না, সুভাষ, তুমি বুঝছ না তুমি কী করতে যাচ্ছ—আরো আরো ভাবো, সকলের পরামর্শ নাও—' মিত্র উঠে পড়ল।

'হ্যাঁ, বিবেচনা-আলোচনার ত্রুটি রাখছি না।' বললে সুভাষ, 'দেখাশোনার কাজ যা বাকি আছে সেরে ফেলব শিগগির। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সিদ্ধান্ত টলবে না।'

'না, টলবে, টলা উচিত। আমি আবার আসছি। তুমি চিঠিটা এখুনি পোস্ট কোরো না—'

কদিন পরে সুভাষেব ঘরে আবার সেই মিত্রের আবির্ভাব।

খানিকক্ষণ আগে একটা ঝড় উঠেছিল, দরজা জানলা খোলা, সুভাষ বসেছিল স্থির হয়ে। ঝড়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, থেমে গেল। বোধহয় সুভাষের স্থিবতাতেই সে প্রতিহত হয়ে নিজেকে সংবৃত করলে। এখন ঝড় নেই, ক্ষণিক অন্ধকারটাও সবে গেছে।

'কী হে, সব দেখাশোনা করলে?' মিত্র সুসংবাদের আশায় সুপ্রসন্ন মুখে বললে, 'কাব কী মত?'

'তার আগে শোনো আই. সি. এস. দেব জন্যে ইণ্ডিয়া-অফিস কী সব নির্দেশ তৈরি করেছে।' সুভাষ একটা চটি বই টেনে নিয়ে পৃষ্ঠাটা বার করলে: 'এ সব আই. সি. এসদের অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিষয়—ভারতবর্ষে ঘোড়ার যত্ন। দেখ কী নির্লজ্জ, লিখছে, ভারতবর্ষে ঘোড়া আর সহিসেরা একই খাদ্য খায়।'

'তা কী বলো, চানা খায় না?'

'খায় বলে লিখতে হবে? এটা একটা শেখবার মত জানবার মত বিষয়?' সুভাষ জ্বলে উঠল: 'ইংলণ্ডে গরু আর তাব গাড়োয়ান একই ঘাস খায়, সেটা কি একটা জ্ঞাতব্য বিষয় হবে? তারপরে আরো দেখ, লিখেছে—ভারতবর্ষে ব্যবসায়ীমাত্রই অসাধু—'

মিত্র সহ্য করতে পারল না। বললে, 'এ অন্যায়।'

'আমি তখুনি ছুটলাম ইণ্ডিয়া অফিসে। সিভিল্ সার্ভিস বোর্ডের

সেক্রেটারি রবার্টসের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, এ সব ভুল নির্দেশ ছাপানো হয়েছে কেন? এসব বাতিল করে দেওয়া উচিত। রবার্টস চোখ রাঙাল, বললে, এটাই হচ্ছে সরকারি মত, তুমি যদি তা না মানো, তোমাকে চাকরি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

মিত্র উচ্চকিত হয়ে উঠল 'তুমি কী বললে?'

সুভাষ স্বচ্ছ মুখে বললে, 'বললাম, চাকরি থেকে আমি বেরিয়ে তো যাচ্ছিই, তোমাকেও এ ভুল এ অন্যায় সংশোধন করতে হবে। চোখ রাঙিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। তখন রবার্টস ধাতে এল। কথা দিল সংশোধন করবে।'

মিত্রব মুখ মেঘলা করে এল: 'তা হলে চাকরি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ঠিক করলে?'

'হ্যাঁ, অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়াই ঠিক করলাম।' সুভাষ উঠে দাঁড়াল, তার স্বরে আজ আব এতটুকুও দ্বিধা নেই। বললে, 'বড়দা লণ্ডনে ব্যাবিস্টাবি পড়ছেন, তিনি এসেছিলেন, তাঁর হাতে স্যার উইলিয়ম ডিউকের চিঠি।'

'কে উইলিয়ম ডিউক?'

'এককালে উড়িষ্যার ডিভিশানাল কমিশনার ছিলেন, সেই সূত্রে বাবাব সঙ্গে জানাশোনা। এখন এখানে আণ্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট—'

'কী লিখেছেন চিঠিতে?'

'অনুরোধ করেছেন যেন চাকবি না ছাড়ি।'

'কী উত্তর দিলে?

'সবিনয়ে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম।'

'সুভাষ!' মিত্র একটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'কলেজের প্রফেসররাও ধরল, দেশবিদেশের সমস্ত আত্মীয় হিতৈষী একজোট হল—সকলের মুখে এক কথা, চাকরি ছেড়ো না। এ চাকরি ছাড়া মানে স্বর্গ হতে নির্বাসন—শেষকালে পস্তাবে,

ছন্নছাড়া হয়ে যাবে—কিন্তু জানো, সে বিরাট ডাকের কাছে এসব কথা এ সব কান্না তুচ্ছ মনে হচ্ছে।'

'বিরাট ডাক!' মিত্র বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, দেশের ডাক, দেশসেবার ডাক।' সুভাষ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। বললে, 'আমাদের হল-এর প্রভোস্ট রেডএওয়ে কী বললে জানো? বললে, আমি দু কারণে বিচলিত বোধ করছি। এক কারণ, একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ—দেশসেবাটা ওদের কাছে সামান্য ব্যাপার—ওরা তো পরাধীন নয়—আর এক কারণ, একজন ভারতবাসী এত বড় একটা চাকরি এমন অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারে। শেষকালটায় আমার হ্যাণ্ডসেক করে কী বললে জানো? বললে, বোস, আমি আনন্দিত, তুমি দাসত্বের শৃঙ্খলে ধরা দিলে না।'

'কিন্তু এখন কী করবে?"

'জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি যে আন্দোলন সুরু করেছেন তাতে যোগ দেব। জানো,' সুভাষের দুচোখ জ্বলে উঠল: 'চিত্তরঞ্জন আমাকে ডেকেছেন।'

'কে, সি. আর. দাশ?

'হ্যাঁ, চিত্তরঞ্জন।' সুভাষের স্বর গাঢ় হয়ে উঠল: 'আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি আমাকে, আমার সিদ্ধান্তকে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছেন। তিনি যদি প্রৌঢ় বয়সে সমস্ত সুখ-সম্পদ ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন, আমি—আমি এক তরুণ যুবক, আমি পারব না? কিন্তু আমি তাঁকে কী দিতে পারব? আমি তাঁকে লিখেছি, আমার বিদ্যেবুদ্ধি কিছু নেই, শুধু আছে বহ্নিময় উৎসাহ, মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার মত শুধু মন আর তুচ্ছ দেহ—তিনি তাতেই তৃপ্ত, ডাক দিয়েছেন আমাকে। হ্যাঁ, আমি যাব।' সুভাষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল: 'চলো চিঠিটা পোস্ট করে দিই গে—'

'চিঠি ? কোন চিঠি ?'

'চূড়ান্ত চিঠি। পদত্যাগপত্র। লেটার অফ রেজিগনেশন।'

'এখনো তাহলে ছাড়নি চাকরি ?' মিত্রও উঠে পড়ল।

'না। এতদিন তো সকলের মত নিলাম, সকলের বিরুদ্ধতাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলাম। সময় নিয়ে-নিয়ে এটাই প্রমাণ করলাম যে আমি ভাবের ঘোরে ছাড়ছি না, বেশ সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে-চিন্তে ছাড়ছি।'

'যখন এখনো চিটিটা পোস্ট করনি, নাই করলে।' মিত্র শেষ অনুনয় করল।

'না, আর দেরি নয়।' সুভাষ মিত্রর হাত ধরে টানল : 'চলো।'

দুজনে রাস্তায় একটা লেটার-বক্সের কাছে দাঁড়িয়েছে।

সুভাষ চিঠি ফেলছে। লেটার-বক্সের মুখে সুভাষের হাত, হাতে চিঠি।

মিত্র বললে, 'সুভাষ, ফেলো না—জানো না তুমি কী করছ।'

সুভাষের হাত গর্তের দিকে আবো একটু এগোল, চিঠির লম্বা খামটা আরো একটু ঢুকল।

'এখনো সময় আছে, এখনো হাত গুটিয়ে নাও।' মিত্রর স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল।

চিঠিসহ সুভাষের হাত আরো একটু ঢুকল।

'এখনো, এখনো সময় আছে।' মিত্র প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'ভেবে দেখ তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—শক্তি, প্রতাপ, অর্থ, ঐশ্বর্য, আরাম, বিলাস, সফল জীবন—'

সুভাষের হাত চিঠিটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল।

গোবিন্দ রায়ের 'কত কাল পরে' গানটা মনে পড়ছে :

'শিখিলে যত জ্ঞান নিশীথে জেগে, উপযুক্ত হল পরসেবা লেগে।
হল চাকরি সার যথায় তথায়, অপমান সদায় কথায় কথায়।

নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুখ, পর-রঞ্জন অঞ্জনে কালমুখ।
পর বেশ নিলে পর দেশ গেলে, তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে।
খুইয়ে নিজদেশ মলিনমুখে, ভজনায় কি পৌরুষ স্বার্থসুখে।
যদি মানুষ, মানুষ নাহি হলে, ফললাভ কি মানুষ নাম নিলে॥'

এ সব কি আর সুভাষ সম্বন্ধে খাটে?

একুশ

জাহাজে করে সুভাষ ফিরছে ভারতে।

যেন সমস্ত জাহাজে আর কোন লোক নেই। সে একেবারে একা। অনিঃশেষ পরিপূর্ণ। ফেরবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে যে সে ঝাঁপ দিয়েছে সেই অবন্ধন আনন্দ তার আননে অবয়বে উচ্ছলিত।

একজন ভারতীয় সহযাত্রী তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কী ভাবছ?'

'জালিয়ানওয়ালাবাগ।'

'আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, আরো ভাবছি তিনটি মানুষের কথা—গান্ধি, চিত্তরঞ্জন, আর—আর রবীন্দ্রনাথ।'

কিন্তু মনে শুধু এই জ্বালাময় জিজ্ঞাসা: জেনারেল ডায়ার যে গুলি চালিয়েছিল আর মাইকেল ওডায়ার যার সঙ্কেতে গুলিচালনা, তাদের উপর কেউ প্রতিশোধ নেবে না? কই সেই মানুষ, সেই স্বদেশী?

'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এ দেশ তোদের নয়
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে
ঘুষির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়।'
সোনা, যাদু, মিষ্টি ভাষে ছেলে মেয়ে কোলে আসে
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়।
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য অসীম ধৈর্য
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম শৌর্যে বীর্যে অসুর-পরাজয়?

স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি চমকে উঠিস ভেড়াগুলি
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়।
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে কোটি-কোটি লক্ষে লক্ষে
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়?'

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রায় আট বছর পরে ১৯২৭এ জেনারেল ডায়ারকে যমে নিলে। আরো তেরো বছর বাঁচল ওডায়ার, পাঞ্জাবের ছোটলাট, যার আমলে এই হত্যাকাণ্ড, আর যে কিনা ডায়ারের প্রধান সমর্থক। তাকে ১৯৪০এর ১৩ই মার্চ উধম সিং গুলি করে বধ করলে লণ্ডনে, ক্যাক্সটন হলএ। একুশ বছর ধরে এ প্রতিহিংসার লালসা পোষণ করে এসেছে উধম। ওডায়ার বুঝি যমেরও অরুচি ছিল, তাই নিয়তি কিন্তু দেশের বুকের উপর পরাধীনতার এই যে জগদ্দল পাষাণ ভার তা কি অহিংসায় সরে যাবে? জানিনা কী হবে এবং কেমন করে হবে? ব্রিটিশের হাত থেকে কেমন করে অধিকার ছিনিয়ে নেব? ছিনিয়ে নিতে হবে না, ওরা ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে? অহিংসায় পালাবে কেন? বড় জোর একটা হাই তুলে পাশ ফিরে শোবে।

যদি পালাতে হয় ভয়ে পালাবে, উদারতায় পালাবে না। যখন বুঝবে জলে-স্থলে ভারতের সৈন্য বিদ্রোহী হয়েছে, অস্ত্র ভারতের দিকে না উঁচিয়ে ব্রিটিশের দিকে উঁচিয়েছে তখনই বেনের দল পাততাড়ি গুটোবে।

সেই জনগণের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর জন্যেই অহিংসার প্রয়োজন, আপাতত প্রয়োজন। অহিংসা একটা রাজনৈতিক উপায়, একটা কৌশলমাত্র। অহিংসা কোনো রাজনীতি নয়, রাজনৈতিকের ধর্মও নয়। দণ্ডধর ছাড়া আবার রাজা কী। হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে যুদ্ধ ছাড়া পথ কোথায়।

দেখা যাক হোমিওপ্যাথিতে ব্যাধি সারে কিনা, না সারে তো সার্জারি আছে।

শুধু জনগণকে বিপ্লবে উত্থিত করবার ভূমিকাই এই অহিংসা।

বম্বেতে নেমেই সুভাষ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে গেল। ষোলই জুলাই, উনিশ শো একুশ। নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, 'আমি আপনার আন্দোলনে নামতে চাই।'

হাস্যমণ্ডিত মুখে গান্ধি আশীর্বাদ করলেন সুভাষকে।

'আপনাকে কতগুলো প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী প্রশ্ন?'

'অহিংস আন্দোলনের প্রত্যাশিত ধাপগুলি আপনার কল্পনায় কী ভাবে আছে জানতে চাই। অর্থাৎ পরে পরে কীভাবে আন্দোলন এগোবে এবং শেষ পর্যন্ত কী ভাবে ইংরেজের হাত থেকে আমরা রাজশক্তি তুলে নেব।'

গান্ধি বললেন যা বলতে চান। কিন্তু সুভাষের মনে হল সমস্ত পরিকল্পনাটা যেন খুব স্বচ্ছ নয়। সমস্ত বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমকে যেন একটা যুক্তির সূত্র দিয়ে আগাগোড়া বাঁধা হয়নি। অহিংসা ভজনা করলেই ব্রিটিশের হৃদয় বিগলিত হবে স্বেচ্ছায় লুটের মাল ফেলে দিয়ে বাড়ি পালাবে এ যেন বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করতে আনন্দ হয় না।

শেষপর্যন্ত গান্ধি বললেন, 'তুমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে যাও।'

কলকাতায় পৌঁছেই সুভাষ চিত্তরঞ্জনের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। ভাস্বর ভাস্করের মতই সুভাষের নয়নপথে উদিত হলেন চিত্তরঞ্জন। দেশের জন্যে যিনি সর্বস্ব দান করেছেন তিনিই যেন দেশের জন্যে আবার সর্বস্ব আদায় করে নিতে পারেন তাঁর আকৃতিতে ও অবয়বে যেন সেই অপরাজেয় পৌরুষই প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া ধন নয়, বললব্ধ জয়ার্জিত বিত্ত।

'আমি এসেছি।' সুভাষ উদ্বেল কণ্ঠে বললে। মনে হল আমি পেয়েছি বললেই বুঝি ঠিক হত।

চিত্তরঞ্জনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'তুমি, সুভাষ, এসেছ? আর আমার ভয় নেই।' বাসন্তী দেবী কাছেই বসেছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার সেনাপতি, আমার ডান হাত পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, এই তেজস্বী পবিত্রমূর্তিই তো আমার কাম্য।'

সুভাষ নত হয়ে চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করল।

বাসন্তী দেবী সুভাষকে বললেন, 'তুমি সমস্ত সংগ্রামের ভার নাও।'

'মা, আপনি শক্তিস্বরূপিনী, আপনি শক্তি দিলে সমস্ত সংগ্রামে জয়ী হব। কখনো পরাভূত হব না।'

'স্বরাজ চাই কার জন্যে?' চিত্তরঞ্জন বলে উঠলেন : 'মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের জন্যে নয়, স্বরাজ চাই অগণন জনগণের জন্যে, যাতে তাদের সুখসমৃদ্ধি আসে, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য দুঃখ দারিদ্র্য দূরে যায়, তাই তাদেরকে ডাকো, তাদেরকে একত্র করো, তাদের ন্যায্য স্বত্ব অধিকার করতে বলো—তারা যদি ওঠে কার সাধ্য তাদের দাবায়, তাদের বঞ্চিত রাখে।'

'স্বরাজ উদ্দেশ্য নয় উপায় মাত্র।' সুভাষ সেই কথার প্রতিধ্বনি করল : 'আসল উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি, তাই আসল শক্তি জনশক্তি। সংহতি-শক্তি। সেই শক্তিকেই দিকে দিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।'

'তুমি তোলো জাগিয়ে।' বললেন চিত্তরঞ্জন।

'আপনি আমার গুরু, রণগুরু, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

চিত্তরঞ্জন কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিলেন। বললেন, 'প্রথমেই বিলিতি বর্জন। সুভাষ,' আনন্দে অলোকিত হয়ে উঠলেন : 'প্রথমেই আমার বাড়িতে বিলিতি কাপড়ের বনফায়ার। অগ্নিমহোৎসব।'

সুভাষ তাকিয়ে দেখল চিত্তরঞ্জনের পরনে মোটা খাটো খদ্দরের ধুতি, গায়ে মোটা খদ্দরের ফতুয়া। বাসন্তী দেবীর পরনেও মোটা বিছানার চাদরের মত খদ্দরের শাড়ি, লাল পাড় ছাপানো। সুভাষের

নিজের গায়ের বিলিতি পোশাকে লজ্জা বোধ করছিল। মহাত্মার সামনে যেতেও সে কম অপ্রতিভ হয়নি। কতক্ষণে এই বস্ত্র জঞ্জাল ফেলে দিয়ে সে ভদ্র হবে শুদ্ধ হবে তারই ফাঁক খুঁজছে।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীনদুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।'

বিলিতি বস্ত্র পোড়াবেন তো আগে নিজের বাড়িতে। 'আপনি আচরি জীব পরেরে শিখায়।' এমনি ত্যাগের আদর্শ অগ্নি-অক্ষরে সকলের সামনে না রাখলে জনগণ আকৃষ্ট হবে কেন?

দেশবন্ধুর রসারোডের বাড়ির টেনিস কোর্টে বাড়ির লোকের যার যত বিদেশী বস্ত্র ছিল স্তূপাকৃত হল। তার মধ্যে দেশবন্ধুর নিজেরই দামী স্যুট বেশি। সুভাষই নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

আজ সুভাষ খদ্দর পরেছে। আর এই পোশাকে তাকে কী অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে, অপার্থিব সুন্দর।

হ্যাঁ, আগুন সমস্ত পাপকালিমা ভস্ম করে দিক। সমস্ত বন্ধন থেকে মোচন করুক। অগ্নির পুণ্যাবগাহনে সমস্ত দেশ শুদ্ধ হোক, নিরাময় হোক, উদ্দীপিত হয়ে উঠুক।

'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই সে বড় অপমান

মোটা হোক সে সোনা মোদের—
মায়ের ক্ষেতের ধান,
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় পরব না আর
যেচে পরের কাছে
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়
পরলে কেমন সাজে
দ্যাখ তো পরলে কেমন সাজে।
ও ভাই চাষী ও ভাই তাঁতি
আজকে সুপ্রভাত
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে—
ক'সে চালাও তাঁত
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত॥'

সতেরোই নভেম্বর বোম্বেতে ইংলণ্ডের যুবরাজ এসে পৌঁছল। সেদিন কংগ্রেসের নির্দেশে সমস্ত ভারতব্যাপী হরতাল। কলকাতাকে দেখাল একটা মরুভূমির মত। পথে একটাও লোক নেই ট্র্যাম নেই ট্যাক্সি নেই গাড়ি ঘোড়া নেই। এ মরুভূমির সার্থক শিল্পী সুভাষচন্দ্র।

তারই নিয়ন্ত্রণে সমস্ত কিছু চলছে-থামছে, তারই প্রীতিস্পর্শে শত শত স্বেচ্ছাসেবক মুগ্ধের মত কাজ করে যাচ্ছে। স্টেশন থেকে গাড়ি করে যে সব স্ত্রীলোক ও শিশুকে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে তার উপর প্ল্যাকার্ড মেরে দিচ্ছে 'অন ন্যাশনাল সার্ভিস'। ঐ প্ল্যাকার্ড দেখলে কেউ আর বাধা দিচ্ছে না। এ জাতীয় প্রয়োজনের যানবাহন।

এমন সফল সুশৃঙ্খল হরতাল কেউ কোনোদিন দেখেনি। তার নির্মাতা সুভাষ। দুর্জয় গঠনশক্তির কারিগর।

গভর্ণমেণ্ট খেপে গেল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘকে বেআইনি বলে ঘোষণা করলে।

সুভাষ বললে, 'এ ঘোষণা মানব না। স্বেচ্ছাসেবকরা পাঁচজন করে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করবে। অগ্রগামী দলে আমি থাকব।'

'পাঁচজন করে। এমনি হাজার হাজার দল। আমি লক্ষ ভলান্টিয়ার চাই বলে প্রচার পত্র ছাপিয়েছি।' বললেন দেশবন্ধু, 'কী বলো পাব না ভলান্টিয়র?'

'লক্ষাধিক ছেলে ছুটে আসবে।'

'আমাদের লক্ষ্য মহান। আমাদের কর্মনীতি শান্ত, অপ্রমত্ত। আর দেশসেবা ভাগবত ব্রত।'

দেশবন্ধুর বাড়িতে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষ খেতে বসেছে।

দেশবন্ধু রাঁধুনে বামুনকে বলছেন, 'আর দুদিন পরেই তো জেলের ভাত খেতে হবে, তুমি এখন থেকেই ভাতে কাঁকর মেশাতে আরম্ভ করো। অভ্যেস করা থাকলে জেলের ভাতে কষ্ট হবেনা।'

'বা, তা কেন?' সুভাষ বাসন্তী দেবীর দিকে তাকাল: 'যে দুঃখ এখনো আসেনি তা আগে থেকেই সাধ করে ভোগ করি কেন?'

'আচ্ছা শরীরটাকে একটু কষ্টসহিষ্ণু করে নিলে মন্দ কী।' দেশবন্ধু হাসলেন: 'জেলে গিয়ে ঘানি টানতে তখন বেগ পেতে হবে না।'

খাওয়া-দাওয়াব পর সুভাষকে নিভৃতে ডেকে নিলেন চিত্তরঞ্জন। গম্ভীরমুখে বললেন, 'পুলিশ কখন এসে গ্রেপ্তার করে ঠিক নেই। তাব আগে তুমি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?'

সুভাষ বললে, 'পারব। বলুন কী কাজ?'

'আমাকে লাখ টাকা জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'পারব। বলুন কত দিনের মধ্যে চাই?'

'কত দিনের মধ্যে নয়, এক্ষুনি এই মুহূর্তে চাই।'

'এই মুহূর্তে!' সুভাষ এবার বোধহয় দ্বিধায় পড়ল।

'তুমি ইচ্ছে করলেই পারো। হ্যাঁ, এখুনি, এই মুহূর্তে।' দেশবন্ধু ধীর স্বরে বললেন, 'তুমি মুখে একবার হ্যাঁ বললেই হয়ে যায়।'

'আমি ?' সুভাষ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল: 'লাখ টাকা ?'

'পাত্রী তৈরি, তুমি বিয়ে করবে বললেই এখুনি লাখ টাকা আমার হাতে আসে।' দেশবন্ধু গাম্ভীর্যে অব্যাহত রইলেন।

সুভাষ এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল। পরে বললে, 'আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন। কিন্তু আপনি জানেন আমি সংসারের জন্যে নই, আমি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের জন্যে। আমি মাতৃভূমির চরণে প্রদত্ত বলি—টাকা কোথায় পাব—এই তুচ্ছ দেহ আর প্রাণই শুধু দিতে পারি আপনাকে। আপনি তাই নিন।'

'তাই মাতৃভূমির শাশ্বত সম্পদ। দেহ আর প্রাণ।' দাতার রাজরাজেশ্বর চিত্তরঞ্জন আশীর্বাদে বদান্য হলেন।

'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমার গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল
তোমারি কার্য সাধিবে
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবেনা—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিবাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল

কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান ॥'

কত সন্তান জেগে উঠেছে দিকে-দিকে, দুর্গম পর্বতে নির্ঝরের মত অজানিতের পথে নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, নির্মল জ্যোতির নির্মল গতির জয়ে চলেছে মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ হয়ে।

'ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।'

চলো পথে চলো, সার বেঁধে চলো, খদ্দর বেচবে চল, এই খদ্দরই সুধাপুর্ণিমার প্রথম চন্দ্রকলা। চলো আগে পথে চলো, পরে যাব ব্রিটিশ শাসনের হৃদয়পিণ্ডে, সৌধস্পর্ধিত রাজধানীতে।

'আমরা পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥
বলব, জননীকে কে দিবি দান
কে দিবি ধন, তোরা কে দিবি প্রাণ—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে ॥'

চিত্তরঞ্জন তাঁর বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে বিকেলে চা খাচ্ছেন, ছোট মেয়ে এসে বললে, 'বাবা, সার্জেণ্ট এসেছে।'

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'নিয়ে এস।'

পুলিসকমিশনার কীড নিজে এসেছে গ্রেপ্তার করতে। বললে, 'আপনাকে য়্যারেস্ট করতে এসেছি।'

চায়ের কাপ সরিয়ে রাখলেন চিত্তরঞ্জন। বললেন, 'আমি প্রস্তুত। কিন্তু সুভাষ—সুভাষ কোথায়?'

'তাকেও পুলিস য়্যারেস্ট করতে গেছে।'

সুভাষ তার বাড়ির নিচের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে, কে যেন বলে উঠল: পুলিস এসেছে।

চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে সুভাষ উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আসুন, কি, য়্যারেস্ট করতে তো?'

'হ্যাঁ, ওয়ারেণ্টে তাই অর্ডার।' সার্জেণ্ট বললে।

'কিন্তু দেশবন্ধুর খবর কী?'

'তাঁকেও গেছে য়্যারেস্ট করতে।'

সুভাষ উল্লসিত হল: 'একসঙ্গেই তাহলে জেলে থাকতে পারব আমরা। দুঃখের মধ্যে এইটুকুই শান্তি, প্রাণ ভরে দেশগুরু দেশবন্ধুর সেবা করতে পারব। চলুন, নিয়ে চলুন—কোথায় নিয়ে যাবেন? যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই জেলখানা। সমস্ত দেশটাই একটা বিরাট জেলখানা। এই জেলখানার বাইরে, দেশের বাইরে চলে যেতে হবে। বাইরে থেকেই আঘাত হানতে হবে—সশস্ত্র আঘাত। হ্যাঁ, বাইরে থেকেই আনতে হবে সমরসম্ভার। দিল্লির লাল কেল্লা দখল করব। তখন আপনারা কী করবেন? আবার আমাদের হুকুম তামিল করবেন।'

পুলিস অফিসর বললে, 'আগে এ জেলখানা থেকে বেরিয়ে যান তো! পরে অন্য কথা।'

'হ্যাঁ, যাব, নিশ্চয়ই যাব, যাব অনেকদূর। তারপর সেখান থেকে আওয়াজ তুলব: দিল্লি চলো। আওয়াজ তুলব: জয় হিন্দ।'

ছ মাসের জেল হয়ে গেল সুভাষের। চিত্তরঞ্জনেরও ছ মাস।

এই প্রথম কারাবরণ!

তারপর—শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম।

তারপরে ১৯৩৯এর মে-তে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন এসে পৌঁছল: 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাঙলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।...বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি, তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য

রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিই বাঙলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।···

তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত।···আমি আজ তোমাকে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।'

'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে॥'

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত